মুভি ফোটোগ্রাফি

সম্পাদনা

ধীমান দাশগুপ্ত



প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০০

মুদ্রাকর
রাজলক্ষ্মী প্রিন্টার্স
৯৬ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
প্রণবেশ মাইতি

সহ সম্পাদনা
পিনাকী চট্টোপাধ্যায়

ঋণঃ
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়
গোবিন্দ নিহালনী
দীনেশ লখনপাল
অশোক জসওয়াল

ব্রিটিশ ফিল্ম্ ইনস্টিটিউট
আমেরিকান সিনেমাটোগ্রাফার
ব্রিটিশ কাউন্সিল
ম্যাক্সমুলার ভবন

সুব্রত মিত্রের স্মৃতিতে

প্রাসঙ্গিক

এই সংকলন-গ্রন্থ মুভি ফোটোগ্রাফি বা সিনেমাটোগ্রাফি বিষয়ে। গ্রন্থে আলোচনা আছে ক্যামেরা ও সিনেমাটোগ্রাফির কলাকৌশলগত দিক, ক্যামেরাভাষা ও বিভিন্ন ধরনের ক্যামেরাশৈলী, এবং সিনেমাটোগ্রাফির নান্দনিক প্রেক্ষাপট নিয়ে। সূচীপত্রে চোখ রাখলেই গ্রন্থের বিষয়-বৈচিত্র্য ও বিষয়গুলির মধ্যকার আন্তর্সম্পর্ক স্পষ্ট বোঝা যাবে। পাঠকের বিচারবুদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধার দরুন প্রবন্ধগুলি এখানে প্রথামান্য রীতিতে আলাদাভাবে বিন্যস্ত হয়নি। একটি সযত্ন অনুসন্ধান ও প্রাণবন্ত মিথস্ক্রিয়া পাঠকের কাছ থেকে প্রত্যাশিত।

গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত রচনার অর্ধেক বাংলায় লেখা, অর্ধেক ইংরেজি থেকে অনুবাদ। ছ'জন বাঙালি লেখক, ছ'জন অবাঙালি বা অভারতীয়।

লেখকদের মধ্যে ড্রেয়ার ও আইজেনস্টাইন কালজয়ী চলচ্চিত্রশিল্পী, তাঁদের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

গ্রেগ টোলাণ্ড, সুব্রত মিত্র ও গোবিন্দ নিহালনী বিশ্ববিখ্যাত সিনেমাটোগ্রাফার, তাঁদের পরিচয় দেওয়া বাহুল্য। গ্রন্থে এঁরা শুধু রচনাকার হিশেবে উপস্থিত নন, বিভিন্ন রচনায় এঁদের কাজের কথাও আলোচিত।

অন্য লেখকদের মধ্যে টানা ওলেন ছিলেন ব্রিটিশ ফিল্ম্ ইন্স্টিটিউটের টেলিভিশন অ্যাণ্ড প্রোজেক্টস্ ইউনিটের বিভাগীয় প্রধান, চলচ্চিত্রের প্রযুক্তি বিষয়ে তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে।

আইর কনিগস্‌বার্গ স্বনামধন্য চলচ্চিত্র-বিশেষজ্ঞ, চলচ্চিত্র বিষয়ে বহু বিখ্যাত গ্রন্থ ও কোষগ্রন্থের রচয়িতা।

বাঙালি লেখকদের মধ্যে পূর্ণেন্দু বসু অভিজ্ঞ চিত্রগ্রাহক, তিনি কাজ করেছেন সত্যজিৎ রায় ও বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর মতো পরিচালকের সঙ্গে। সত্যজিৎ রায় ফিল্ম্ অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইন্স্টিটিউটের সঙ্গেও তিনি বেশ কিছুদিন যুক্ত ছিলেন।

তপন গুহঠাকুরতা সিনেমাটোগ্রাফি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন জার্মানি ও ইংলণ্ডে। পরবর্তীকালে তিনি বিবিসি ট্রেনিং-এও অংশ নেন। সুদীর্ঘ ২৩ বছর (১৯৭৫-৯৮) তিনি দূরদর্শনের সঙ্গে সিনিয়র ক্যামেরাম্যান হিশেবে যুক্ত ছিলেন, পেয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের একাধিক পুরস্কার। ভিডিওগ্রাফি বিষয়ে তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশিত হতে চলেছে।

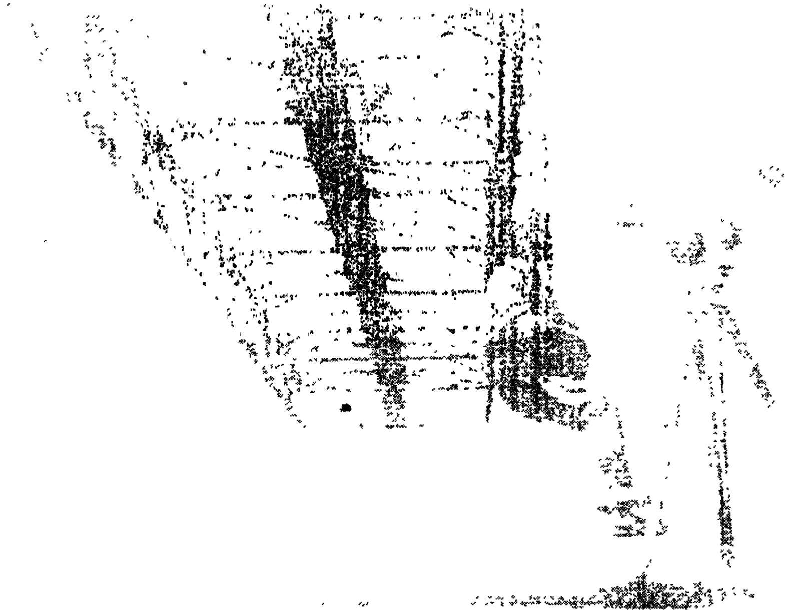
ড. সোমেন ঘোষ অভিজ্ঞ চিত্রসমালোচক, চলচ্চিত্র বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ ও বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

শিক্ষক, সম্পাদক ও সমালোচক হিশেবে বীরেন দাশশর্মা সুপরিচিত। চিত্রবাণী, সীগাল প্রভৃতি বিখ্যাত সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, বর্তমানে সত্যজিৎ রায় ফিল্‌ম্ অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইন্‌স্টিটিউটের অধ্যাপক।

গ্রন্থে সম্পাদকের দুটি লেখাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

রচনা ও লেখকসূচির এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচার করলে আলোচ্য গ্রন্থটি চলচ্চিত্র শিক্ষার্থীদের কাজে আসবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থে একটি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার প্রয়াস থাকলেও, শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে, প্রতিপাদ্য বিষয়কে আমরা ঘরের কাছে ধরে রাখতে চেয়েছি। বাণীশিল্প থেকে কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হচ্ছে গৌতম ঘোষের সিনেমাটোগ্রাফি বিষয়ে একটি একক গ্রন্থ। সেই বইটি ও আমাদের এ-বই পরস্পরের অনুপূরক, পরিপূরক ও সম্পূরক হিশেবে পরিকল্পিত।

৪.১০.২০০১ — **ধীমান দাশগুপ্ত**



জিগা ভের্তভ : দ্য ম্যান উইথ্ দ্য মুভি ক্যামেরা

সূচীপত্র

ভূমিকা

ক্যামেরা, মুভি ফোটোগ্রাফি ও ক্যামেরাশৈলী

ধীমান দাশগুপ্ত

চলচ্চিত্র বিশেষভাবে প্রযুক্তি ও যন্ত্র নির্ভর এক মাধ্যম। চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রগুলির মধ্যে প্রধান যন্ত্র হল ক্যামেরা। ক্যামেরা হচ্ছে চলচ্চিত্রের বাহন। সিনেমার প্রধান অবলম্বন। চলচ্চিত্রের পর্দায় আমরা যা দেখি তার সবই ক্যামেরা আমাদের দেখায়। চিত্রনাট্যে যা লেখা থাকে তাকে চলচ্চিত্রায়িত করার ভৌত দায়িত্ব ক্যামেরার। চলচ্চিত্রে ক্যামেরার দুটি দিক আছে, একটা তার টেকনিক ও টেকনোলজির দিক, আর একটা তার শৈল্পিক ও নান্দনিক দিক। ক্যামেরার কলাকৌশল ও প্রযুক্তির দিকটি মুভি ক্যামেরা ও ভিডিও ক্যামেরা বিষয়ক পরিচ্ছেদ-দুটিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে কলাকৌশল বিষয়ে অতিরিক্ত আলোচনাও আছে। আর শৈল্পিক ও নান্দনিক দিকটি বিস্তৃত আলোচনা পেয়েছে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। ক্যামেরার ভাষা প্রসঙ্গে ক্যামেরাশৈলী নিয়ে পৃথক প্রবন্ধও রয়েছে।

ক্যামেরার টেকনিক্যাল দিককে ক্যামেরাভাষার শৈল্পিক ও নান্দনিক দিকের সঙ্গে মিলিয়েই গ্রহণ করতে হয়। চিত্রনাট্য ক্যামেরাভাষায় অনূদিত ও রূপান্তরিত হয়েই চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে। প্রস্থ ও উচ্চতার একটি নির্দিষ্ট অনুপাত বিশিষ্ট পর্দায় ধারাবাহিক ভাবে দৃশ্য প্রক্ষেপণের মধ্য দিয়ে ক্যামেরা প্রদর্শিত চিত্রের কাহিনী, ঘটনাধারা ও বক্তব্যকে প্রকাশ করে। ক্যামেরায় ইমেজ গঠনের ব্যাপারটি অর্থাৎ দৃশ্যবস্তু কী আকারে, কোন্ দৃশ্যকোণে, কেমন কম্পোজিশনে ধরা পড়বে এটা বিশেষভাবে লেন্সের ওপর নির্ভরশীল। ক্যামেরা যেহেতু ত্রিমাত্রিক জগৎকে দ্বিমাত্রিক চিত্ররূপ দেয়, সেহেতু দৃশ্যবস্তুকে কীভাবে চিত্রায়িত করা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে চিত্ররূপের দৃশ্যগুণ, রসানুভূতি ও অভিঘাত। এর জন্য দৃশ্যবস্তু থেকে ক্যামেরার দূরত্ব বা উচ্চতা, তার প্রতি ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ অর্থাৎ ব্যবহৃত লেন্সের ধরন, ক্যামেরা মুভমেন্ট, আলোকসম্পাতের পদ্ধতি বা লাইটিং, কম্পোজিশন গঠন ও তাতে বিভিন্ন রঙের বা আলোছায়ার বিভাজন, সমস্তই জরুরি। আর দরকার চিত্রপরিচালকের সঙ্গে চিত্রগ্রাহকের সঠিক যোগাযোগ ও নিখুঁত সমন্বয়। চলচ্চিত্রে দৃশ্যজগৎ শুধুই বাস্তব নয়, শৈলীকৃতও বটে। তাই পরিচালক কোন্ কলাকৌশলের প্রয়োগে দৃশ্যকে চিত্রায়িত করছেন তা ক্যামেরাশৈলীর অপরিহার্য অঙ্গ। ক্যামেরাম্যানকে তা যথাযথ ভাবে বুঝতে হবে। ক্যামেরার সাহায্যে ভালো ছবি তোলা একদিকে ক্যামেরাম্যানের এই ফিল্ম সেন্সের ওপর নির্ভরশীল, অন্যদিকে একই সঙ্গে তা নির্ভর করে ব্যবহৃত কাঁচা মাল (raw film stock)-এর মান, ক্যামেরাম্যানের দক্ষতা (সঠিক ফোকস করা ও সঠিক এক্সপোজার দেওয়া), ক্যামেরা চালনার সময় হাত না কাঁপা, লেন্স ও আলোর সঠিক নির্বাচন এবং এক্সপোজড্

ফিল্মের নিখুঁত পরিস্ফুটনের ওপর।

অস্তিত্বপূর্ণ বস্তুসমূহের অর্থাৎ ক্যামেরার সামনে যা আছে তার, চিত্রগ্রহণ ছাড়াও পর্দায় একটা ইফেক্ট কল্পনা এবং সৃষ্টি করারও প্রয়োজন হয় ক্যামেরাম্যানের—এমন একটা ইফেক্ট যার ভিত্তি চারটি : চিত্রনাট্যের দাবি, পরিচালকের ধ্যানধারণা, শিল্প-নির্দেশককৃত সেট-সেটিং এবং চিত্রগ্রাহকের নিজস্ব কল্পনা। ক্যামেরাম্যান এই ইফেক্টগুলি কীভাবে সৃষ্টি করেন? ক্যামেরা বিশেষজ্ঞ ডগলাস স্লকোম্বের ভাষায়, 'ক্যামেরাম্যান একটি বিশাল যন্ত্রের ভারপ্রাপ্ত। যেটির একমাত্র উদ্দেশ্য আলোকরশ্মিকে নিয়ন্ত্রণ করা। সুতরাং আলোই হচ্ছে সেই মাধ্যম যার দ্বারা তিনি চিত্রগুলি তৈরি করেন, আলোই তাঁর বর্ণাধারের একমাত্র রঙ। সেটের বিভিন্ন অংশ আলো এবং ছায়া দিয়ে ব্যঞ্জনাময় করেই তিনি তাঁর উদ্দিষ্ট ইফেক্ট সৃষ্টি করেন, রচনা করেন দিনরাত্রির স্থূল এবং আলোছায়ার সূক্ষ্ম ছন্দ যা আভাসিত করে পরিবেশ ও মুড। সুতরাং কাহিনীভিত্তিক ছবির চিত্রগ্রাহকের (তথ্য ও সংবাদ চিত্রের ক্যামেরাম্যানের বিপরীতে) ভূমিকা কেবল কোনো কিছুর পুনর্নির্মাণই নয়, দৃশ্যবস্তুটি সম্পর্কে তাঁর ধারণা এবং কাহিনীর উপযুক্ত মুডে সেটাকে পর্দায় প্রকাশ করাও তাঁর অন্যতম কর্তব্য। সেই কারণেই পরিচালক এবং চিত্রগ্রাহকের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। কেননা পরিচালকের নান্দনিক চাহিদাগুলিকে প্রকৃতপক্ষে শ্যুটিং-এর টেক্‌নিক্যাল সম্ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্যে আনতেই হয়। দক্ষ ক্যামেরাম্যানের সংগ্রহে থাকে সেই সমস্ত প্রকৃত টেক্‌নিক্যাল উপায় ও সম্ভাবনা যার সাহায্যে তিনি পরিচালকের বিমূর্ত ধারণাগুলিকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেন। আর বড় ক্যামেরাম্যানদের এই দক্ষতা ছাড়াও থাকে টেক্‌নিক্যাল উদ্ভাবনী শক্তি ও নিজস্ব শিল্পদৃষ্টি। যার সাহায্যে তাঁরা ছবিতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করে এবং বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য ট্রিটমেণ্ট বদল করে বাস্তববাদ বা স্বাভাবিকবাদের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু সৃজনপারগ।'

ক্যামেরাভাষার ক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক উপাদান হল দৃশ্যবস্তু থেকে ক্যামেরার দূরত্ব বা উচ্চতা। লং শট, মিড শট, ক্লোজ আপ, বিগ ক্লোজ আপ প্রভৃতি হল দূরত্বের ভিত্তিতে নামাঙ্কিত শট, যেগুলি আসলে অনুভূমিক অক্ষে বিভিন্ন ক্যামেরাদূরত্বের নির্দেশক। টপ লং, হাই অ্যাঙ্গেল ও লো অ্যাঙ্গেল শটের প্রতিটিই যেমন উল্লম্ব অক্ষে বিভিন্ন ক্যামেরাদূরত্বের নির্দেশক। বলা বাহুল্য, এই শটগুলির প্রতিটিই দূরত্ব ও কৌণিকতার যৌথ ভিত্তিতে নামাঙ্কিত। ক্যামেরাভাষায় ক্যামেরাদূরত্ব কোনো নিরপেক্ষ উপাদান নয়, তা ক্যামেরাকোণের সঙ্গে যুক্ত ও সম্পৃক্ত। একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বিবিধ দৃশ্যকোণের যে-কোনোটিকে প্রয়োজনমতো বেছে নিতে পারে এবং দৃশ্যের কম্পোজিশন, দূরত্ব ও কোণ যে-কোনোটি পরিবর্তিত হলেই, কম বেশি পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ দূরত্ব ও অবস্থান-কোণ, দুটো উপাদানই ক্যামেরাভাষার পক্ষে সমান গুরুত্বের। প্যান করা, টিল্ট আপ বা ডাউন করা ও ট্র্যাক করা—সমস্তই কোণ ও দূরত্বের যৌথ প্রয়োগ। ক্যামেরাকোণ তাই শুধু ক্যামেরালেন্সের দৃষ্টিকোণ বা অ্যাঙ্গেল অব ভিশন এবং পরিপ্রেক্ষিত বা পারস্পেক্‌টিভ নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু।

ক্যামেরাশৈলীতে ক্যামেরাকোণের ভূমিকা বহুমুখী ও দূরপ্রসারী। বিশেষ ক্যামেরাকোণ যেমন বিশেষ দৃশ্যরস সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি বিশেষ ভাব বা বক্তব্য বা মন্তব্যও তুলে ধরতে পারে। মাত্রিকভাবে ক্যামেরাকোণের অন্ততঃ তিনটে তল আছে—আই লেভেল, হাই অ্যাঙ্গেল, লো অ্যাঙ্গেল; যেমন গুণগতভাবেও অন্ততঃ তিনটে পর্যায় আছে—অবজেকটিভ (to portray reality as it is), সাবজেকটিভ (involving the spectator in the development of the film), পয়েন্ট অব ভিউ (প্রথম দুটির মধ্যবর্তী এক পর্যায়)। ক্যামেরাকোণ এই কারণেই

পারস্পেক্‌টিভের চেয়ে অনেক বেশি কিছু। দূরত্ব ও কোণের পারস্পরিক সম্পর্ককে, অর্থাৎ দৃশ্যের কম্পোজিশনকেও, বিশেষ ধরনের লেন্স ব্যবহার করে কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব।

ক্যামেরাদূরত্ব ও ক্যামেরাকোণ ক্যামেরা মুভমেণ্টের সঙ্গে মিলে একত্রে যত কম সময়ের মধ্যে সম্ভব তার ভিতর বিশেষ কোনো দৃশ্য বা দৃশ্যাংশের রূপ সৃষ্টি করে এবং তার প্রয়োজন, তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা পূরণ করে। আমরা জানি, চলচ্চিত্রে দর্শক স্থির, দৃশ্যের ধারাবাহিক প্রবাহের জন্য হয় দৃশ্যবস্তুকে গতিশীল হতে হয়, অথবা ক্যামেরাকে গতিশীল হতে হয়, অথবা সম্পাদনার মাধ্যমে গতিময়তা অর্জন করতে হয়। অর্থাৎ চলচ্চিত্রের দৃশ্যে পর্যাপ্ত গতিশীলতা আনার এক অন্যতম উপায় হল ক্যামেরাকে গতিশীল করা। একেই বলে ক্যামেরা মুভমেণ্ট। ক্যামেরা মুভমেণ্ট নানাভাবে হতে পারে—প্যান (নিজের অক্ষের ওপর ক্যামেরার অনুভূমিক ঘূর্ণন) বা টিল্ট (নিজের অক্ষের ওপর ক্যামেরার উল্লম্ব ঘূর্ণন) করিয়ে, চাকা লাগানো একটা প্ল্যাটফর্মের ওপর ক্যামেরা বসিয়ে ওই প্ল্যাটফর্মকে সচল করে (যার নাম ডলি শট), ওই প্ল্যাটফর্মকে রেললাইনের মতো ট্র্যাকের ওপর দিয়ে ক্যামেরা সহ ছুটিয়ে (যার নাম ট্র্যাকিং শট) ও ক্যামেরাকে ক্রেনের ওপর স্থাপিত অবস্থায় চালনা করে (যার নাম ক্রেন শট)। ডলি বা ক্রেন শটের মধ্যেই ক্যামেরাকে প্যান বা টিল্ট করিয়ে জটিলতর মুভমেণ্ট আনাও সম্ভব। কোনো চলন্ত গাড়ি বা উড়ন্ত হেলিকপ্টারে ক্যামেরা রেখেও বিচিত্র মুভমেণ্ট তৈরি করা যায়। জুম লেন্স ব্যবহার করে যখন কাছের জিনিশকে দূরে বা দূরের জিনিশকে কাছে আনা হয় তখনও গতি আসে। একটি পূর্ণ দৈর্ঘের ছবিতে সাধারণত ক্যামেরার কয়েকশো মুভমেণ্ট থাকে। এই সব মুভমেণ্ট হল expressive of subjectivity। সমস্ত ক্ষেত্রেই ক্যামেরা মুভমেণ্ট যাতে প্রয়োজনে আসে এবং তা পরিপূর্ণ, অর্থযুক্ত ও ব্যঞ্জনাদায়ক হয় তা লক্ষ করা দরকার, মুভমেণ্টের সর্ব অবস্থাতেই কম্পোজিশন যাতে ফোকসে থাকে তাও জরুরি। এ হল মোটের ওপর প্রযুক্তিক প্রসঙ্গ। নান্দনিক বিচারে প্যান 'সেন্স অব স্পেস', টিল্ট 'সেনজেশন অব হাইট' ও বিশেষ কিছুর প্রতি মনোযোগ, ট্র্যাকিং 'ট্র্যান্সফার অব ডাইমেনশনস' (দূরত্ব ও গভীরতার পরিবর্তনকে দৈর্ঘ ও প্রস্থের পরিবর্তন-বিভ্রমে রূপান্তরিত করা), এবং জুমিং আকস্মিকতা, অভিঘাত ও নাটকীয়তা এনে দেয়। ক্যামেরা মুভমেণ্ট স্থানকে সম্বদ্ধ ও সময়কে সংক্ষিপ্ত করে। ক্যামেরাদূরত্বের থাকে একটা মাত্রাগত দিক— যেমন লং শটে স্থানচেতনা, ক্লোজ আপে স্থান কাল মাত্রা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্নতা, ইত্যাদি। তেমনি, আগেই বলেছি, ক্যামেরাকোণের থাকে একটা গুণগত দিক। ক্যামেরাদূরত্বের মাত্রাগত দিক ক্যামেরাকোণের গুণগত দিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন শটকে quantitative-qualitative character দিয়ে যায়। যার সঙ্গে ক্যামেরা মুভমেণ্টের সাবজেকটিভ ব্যঞ্জনা যুক্ত হয়ে (ক্যামেরা উড়ন্ত পাখির মতো, গড়িয়ে পড়া পাথরের মতো, চালিত কুঠারের মতো, নিক্ষিপ্ত ব্যুমেরাং-এর মতো, ছুটন্ত ঘোড়ার মতো, নানা ধরনের গতিভঙ্গির স্রষ্টা) শটের চূড়ান্ত quantitative-qualitative momentum গড়ে তোলে। এই ভরবেগই চলচ্চিত্রকে মাধ্যম হিশেবে ও বিশেষ কোনো চলচ্চিত্রকে শিল্পকর্ম হিশেবে, স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট হয়ে উঠতে সাহায্য করে। চলচ্চিত্রের ভাষায় ক্যামেরা মুভমেণ্ট উপাদান ও পদ্ধতি উভয় রূপেই ক্রিয়াশীল।

এর সঙ্গে আসে ও এর পরে-পরেই আসে দৃশ্যবস্তু ও দৃশ্যকে কৃত্রিমভাবে আলোকিত করার পদ্ধতি, যার নাম লাইটিং। দৃশ্যরূপকে চিত্রায়িত করতে যে উপকরণগুলির ব্যবহার ঘটে, লাইটিং তাদের অন্যতম। এই পদ্ধতি দৃশ্যকে শিল্পগত ভাবেও সমৃদ্ধ করে তোলে। বিশেষত কম্পোজিশন ও ইমেজের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি উপাদান। বলা হয়, অন্যান্যভাবে নিখুঁত কম্পোজিশনে অতিরিক্ত মাত্রা বা অর্থ নিয়ে আসার জন্যই লাইটিং। চলচ্চিত্রে লাইটিং-এর

প্রয়োজন ও কম্পোজিশনে তার বিশিষ্ট ভূমিকার কথা যথাক্রমে এখানে ও অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। দৃশ্যকে কৃত্রিমভাবে আলোকিত করার এই পদ্ধতি শুধু এক্সপোজার যাতে যথাযথ হয় তার জন্য নয়, দৃশ্যের নাটকীয় ও নান্দনিক প্রয়োজন মেটাতে, দৃশ্যতল দৃশ্যগঠন ও দৃশ্যগভীরতা যথাযথ করতে আর ডিটেল ও মোটিফের প্রশ্নেও লাইটিং বা কৃত্রিম আলোকসম্পাত মূল্যবান। খারাপ লাইটিং একটি ভালো কম্পোজিশনকে নষ্ট করে দিতে পারে, সুতরাং ফিল্ম কম্পোজিশনে এর গুরুত্ব আরও বাড়ছে।

ফিল্মে লাইটিং-এর মূল শৈল্পিক কাজটি কী? কাজটা হল ব্যবহৃত আলোকের মাত্রা টোন গভীরতা ও মেজাজকে কাজে লাগিয়ে দৃশ্যকে সঠিক দৃশ্যরস ও প্রয়োজনীয় আবেগ ও নাটকীয়তা দেওয়া। লাইটিং কম্পোজিশনের গঠন অর্থ ও ব্যঞ্জনাকে পরিস্ফুট করে সঠিক দৃশ্যরস সৃষ্টি করে। কম্পোজিশনের মধ্যকার অপ্রয়োজনীয় ডিটেলকে বাদ দেওয়া ও বিশেষ কোনো অংশকে স্পষ্ট ও ইঙ্গিতবহ করে তোলা ওই কাজের অন্তর্ভুক্ত। আলোকসম্পাতের পরিমাণ অতিরিক্ত বাড়িয়ে দৃশ্যে অবাস্তবতার ইফেক্ট নিয়ে আসা, চিত্রগ্রাহ্যতা ও দৃশ্যগভীরতা কমিয়ে বাড়িয়ে ছবিতে বাস্তবতার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করা, বিশেষ কোনো রঙ বা রঙের কম্পোজিশন যেমন ব্যবহারের মাধ্যমে মোটিফ পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে, তেমনি লাইটিংয়ে আলো ছায়ার বিশেষ কোনো কম্পোজিশন বা টোন সচেতন ভাবে একাধিক বার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ও কারণে প্রযুক্ত হয়ে টেকনিক্যাল মোটিফ হয়ে ওঠা এ সমস্তই লাইটিংয়ের বিশিষ্ট গুণ। প্রয়োগ ও প্রভাবের দিক থেকে লাইটিংকে ন্যূনতম যে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় তা হল : ১. ফ্রন্ট লাইটিং (ক্যামেরার কাছে আলোর হালকা উৎস ব্যবহার করে সম্মুখ থেকে আলোকসম্পাত) ২. সফ্‌ট লাইটিং (দৃশ্যে মিডিয়াম শ্যাডোর উপস্থিতি) ৩. হাই কী লাইটিং (দৃশ্যে উজ্জ্বল লাইট টোনের পরিমাণ বেশি) ৪. হার্ড লাইটিং (একটা কেন্দ্রীয় উৎস থেকে আলোকসম্পাত করে দৃশ্যে স্ট্রং শ্যাডো নিয়ে আসা) ৫. লো কী লাইটিং (দৃশ্যে ডার্ক টোনের পরিমাণ বেশি)। এই বিভাজন শাদা ও কালোর টোনালিটির ওপর নির্ভরশীল।

এই শ্রেণী বিভাজন আলোর তীব্রতা, আলোর পরিমাণ ও কোন্ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আলোকে এনে দৃশ্যবস্তুর ওপর ফেলা হচ্ছে—এই তিনের ওপরই নির্ভর করে। হার্ড লাইটিং ও সফ্‌ট লাইটিং নির্দেশ করে আলোর গুণ (আলোকসম্পাতের আপেক্ষিক তীব্রতা), ফ্রন্ট লাইটিং সাইডলাইট, ব্যাক লাইটিং আণ্ডার-লাইটিং ও টপ লাইটিং আলোর অভিমুখের নির্দেশক। দৃশ্যে আলোর অন্তত দুটি উৎস থাকে : কী লাইট ও ফিল লাইট। লেন্সের মতো লাইটিংয়ের ক্ষেত্রেও ফিলটারের ভূমিকা রয়েছে। সেক্ষেত্রে সেটে আলোকসম্পাতের উৎসসমূহের ওপর ফিলটার শীট লাগিয়ে দৃশ্যবস্তুর রঙ ও টোনের বিন্যাস পরিবর্তিত করা হয়। এর ফলে আলো-ছায়া বিভাজনের প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। দৃশ্যবস্তুর ওপর এসে পড়া আলোকে নরম ও নমনীয় করার জন্য (যাতে দৃশ্যবস্তুতে আলো ও ছায়ার টোনাল পার্থক্যের তীব্রতা হ্রাস পায় ও দৃশ্যবস্তুর কিছু কিছু ডিটেল তত প্রকট না থাকে) ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের transluscent পদার্থের এই ফিলটারকে ডিফিউশন ফিলটার বলা হয়। ডিফিউশন ফিলটার ক্যামেরা লেন্সের সঙ্গে ব্যবহার করেও ইমেজকে এই নমনীয়তা দেওয়া যায়। আলোকসম্পাতের কথায় আলোকসম্পাতের ধারাবাহিকতার কথাও আসে। যা অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।

এই সমস্ত বিভিন্ন উপাদানের সাহায্য নিয়ে চলচ্চিত্রে কম্পোজিশন ও ইমেজ গঠিত হয়ে থাকে। গ্রেগ টোলাণ্ড-এর প্রবন্ধে চলচ্চিত্রে কম্পোজিশন গঠন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। চলচ্চিত্রে ইমেজ গঠন ও ইমেজের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করেছি এই প্রবন্ধেরই ফ্রেমিং ও

মিজ-অঁ-সেন অংশে। এখন চিত্রপরিচালকের সঙ্গে চিত্রগ্রাহকের সম্পর্ক ও যোগাযোগের কথায় আসছি।

ভি আই পুদভকিন-এর ভাষায়, 'অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বাছাই করা ও দৃশ্যাবলীকে যথাযথভাবে ও সম্পাদনার উপযুক্ত করে পরিকল্পিত করা হয়ে যাওয়ার পর শ্যুটিং শুরু হয়। তখন সেই ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একজন নূতন সদস্য দলে প্রবেশ করেন—ক্যামেরা হাতে একজন মানুষ—যিনি স্বয়ং শ্যুটিংটি করে থাকেন—তিনি হলেন ক্যামেরাম্যান। আর তখন পরিচালককে একটি নূতন সমস্যার সমাধান করতে হয় : যে-সমস্ত উপাদান পরিকল্পিত, সংগৃহীত ও প্রস্তুত হয়ে গেছে এবং যেগুলি ভবিষ্যতে চূড়ান্ত রূপ পাবে তার মধ্যে এসে দাঁড়ায় ক্যামেরা এবং যে-ব্যক্তি সেই ক্যামেরা নিয়ে কাজ করেন তিনি। ছবিতে গতিশীল কম্পোজিশন, উপযুক্ত আলোকসম্পাত, ব্যঞ্জনাদায়ক আলো এসব সম্বন্ধে যা বলা হয় সেগুলিকে প্রকৃতপক্ষে শ্যুটিং-এর টেক্‌নিক্যাল সম্ভাবনাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যে আনতেই হয়।...ছবির ইমেজকে প্রকাশময় করার জন্য পরিচালকের ধারণাগুলি তখনই বাস্তবে রূপায়িত হয় যখন ক্যামেরাম্যানের কারিগরি সংক্রান্ত জ্ঞান ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা তার সাথে হাত মিলিয়ে চলে অথবা অন্য কথায় বলতে গেলে যখন ক্যামেরাম্যান ইউনিটের একজন সাংগঠনিক সদস্য হন এবং ছবিটির সৃষ্টিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমভাবে অংশগ্রহণ করেন।'

আর ফেদেরিকো ফেলিনি বলছেন, 'ছবিতে সেট/সিন ডিজাইনারের সঙ্গে সহযোগিতা আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। চিত্রনাট্যের আগে থেকেই তাঁর সঙ্গে প্রত্যহ যোগাযোগ রাখি কারণ ছবিটাকে আমি প্রত্যক্ষভাবে দেখে নিতে চাই একবার। সেই মুহূর্ত থেকে ছবিটাকে একটা পূর্ণ রূপ দিতে থাকে আমাদের দৃষ্ট মানুষ ও স্থান। পরিবেশ আর পটভূমি এইভাবে তৈরি হয়ে যায়। তখন থেকেই তৈরি হতে থাকে।...প্রারম্ভিক স্তরে সেট ডিজাইনারের সঙ্গে যেমন, তেমনি চিত্রগ্রহণকালে ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে সম্পর্কটাও আবশ্যিক। ভুল আলোকক্ষেপণ একটা বাক্যের মতো যার বিশেষণগুলোর স্থান-বিপর্যয় ঘটে গেছে। ক্যামেরাম্যান পরিচালকেরই একটা হাত যা কিছু নির্দিষ্ট ফল পেতে সাহায্য করে। যে আমাকে অনুসরণ করে ও কথামতো কাজ করে সেই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ ক্যামেরাম্যান। সে যদি বুদ্ধিমান হয় তবে ভালোই, কেননা বুদ্ধি তো আর ক্ষতি করে না। এমন একজনকে আমার দরকার যে আমার ইচ্ছেটা ধরতে পারবে এবং সেই ইচ্ছাকে রূপায়িত করার জন্য নিখুঁত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করবে। আমার ছবিতে ক্যামেরার গতি আমার উদ্দেশ্য নির্ভর। আমার বিশ্বাস সিকোয়েন্সের ভিতরের ছন্দটি শ্যুটিং-এর আগেই আমার মনে আসে। স্টাইল নিয়ে আমি ভাবি না, দৃঢ় ভঙ্গিতে একটি ধারণার অভিব্যক্তিই হচ্ছে আমার প্রদর্শিতব্য ইমেজ। ক্যামেরার গতির ফলে যদি কোনো দৃশ্যের তাৎপর্য বাড়ে এবং অন্য কিছু আবিষ্কৃত হয়, তাহলে সেই ভাবেই আমি ক্যামেরাকে অ্যাডজাস্ট করি। যদিও এ-ব্যাপারে আমি প্রাথমিক ধারণাগুলোর প্রতিই বেশি বিশ্বস্ত, অর্থাৎ যখন কোনো দৃশ্য বিশেষ দৃষ্টিতে দেখি তখন তা আর হঠাৎ করে পালটাই না। ক্যামেরা আমার চিরন্তন ব্যক্তিগত কৌতূহলেরই স্টাইলগত প্রতিফলন।'

বেশ বোঝা যাচ্ছে ক্যামেরাম্যান ও পরিচালকের কাজের মধ্যে সম্পূর্ণ সমন্বয় অপরিহার্য এবং এর মধ্য থেকেই কোনো ছবির নির্দিষ্ট ক্যামেরাশৈলী বেরিয়ে আসে এবং এর উপরেই সেই ক্যামেরাশৈলীর সাফল্য নির্ভর করে। সের্গেই আইজেনস্টাইন দেখিয়েছেন, সর্বোৎকৃষ্ট চিত্রকর্মে এই ক্যামেরাশৈলী নির্দিষ্ট বর্ণবিন্যাসকে অনুসরণ করে, রঙকে একটা মোটিফ হিশেবে ব্যবহার করে। 'আমাদের ক্যামেরাম্যানদের সর্বোৎকৃষ্ট সমস্ত কাজে রঙের ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট। এটা

সত্যি যে রঙের বিন্যাস শুধু শাদা, ধূসর ও কালোতে সীমাবদ্ধ, কিন্তু রঙের কোনো অভাব উৎকৃষ্ট ছবিগুলিতে কখনও অনুভূত হয়নি এবং সেগুলিকে কখনও নিছক 'ত্রিবর্ণ' বলে ধরা হয়নি। তাঁদের কম্পোজিশন এত বর্ণ-সচেতন ছিল যে টিশে, মস্কভিন ও কস্‌মাটোভের মতো বড় শিল্পীরা মনে হয় যেন নিজেদের স্বেচ্ছাকৃতভাবে শাদা, ধূসর ও কালো এই তিনটি রঙেই আবদ্ধ রেখেছিলেন যদিও তাঁরা বর্ণালীর যে-কোনো রঙই যেন ব্যবহার করতে পারতেন। তাঁদের ছবিগুলিতে কালো, ধূসর এবং শাদা রঙগুলি কখনই বর্ণহীন বলে মনে করা হয়নি, বরং তারা রঙের এমন একটি বিন্যাসকে ধরে রেখেছে যা (বা যার বিভিন্নতা) শুধু ছবির রঙের দৃশ্যগত ঐক্যের ক্ষেত্রে নয়, সামগ্রিকভাবে ছবির বিষয়গত ঐক্য ও গতিময়তার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান।

'পটেমকিন'-এ প্রধান রঙ ছিল ধূসর, যে ধূসর রঙকে ছবিতে চরম সীমায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—এটাকে কখনও কালোতে ও কখনও শাদাতে পরিবর্তিত করা হয়েছিল।

'অক্টোবর'কে মখমলের মতো নরম কালো রঙে তোলা হয়েছিল—তার সঙ্গে ছিল কালোর এক বিশেষ দীপ্তি।

'ওল্ড ও নিউ'-তে প্রধান রঙ ছিল শাদা। শাদা রাষ্ট্রীয় খামার, শাদা দুধ, ফুল। প্রারম্ভে দারিদ্র্যের ধূসর রঙের বিরুদ্ধে শাদাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। শাদাকে কালো অসততা ও অপরাধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে।

রঙের মোটিফ হয়ে ওঠা এই। বিশিষ্ট পরিচালক ও ক্যামেরাম্যানের সার্থক যোগাযোগের ফলে সৃষ্ট বিশিষ্ট কয়েকটি ক্যামেরাশৈলীর কথায় এবার আসা যাক। একটি টেক্‌নিক্যাল পদ্ধতিকে শিল্পসম্মতভাবেও কার্যকারী করে তোলা হল ক্যামেরাশৈলীর কাজ। এই উদ্দেশ্যে একাধিক ক্যামেরা নিয়ে কাজ করা যায়, ক্যামেরাকে নানাভাবে ব্যবহার করা হয়, অপ্রচলিত কোণ/বিশেষ ধরনের ফ্রেমিং ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে নির্দিষ্ট জগৎ তৈরি করা যায়, ক্যামেরার কোনো-কোনো প্রয়োগকে বা রঙের ব্যবহারকে মোটিফের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। চিত্রনাট্য ক্যামেরা ভাষায় অনুবাদিত ও ক্যামেরাশৈলীর মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়ে চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে।

চিত্রায়িত দৃশ্য বা দৃশ্যাংশের থাকে তিনটি দিক : প্রস্তুতি, প্রকৃতি, ব্যঞ্জনা; দুটি করে অক্ষ: পুরোভূমি-পশ্চাদ্‌ভূমি ও অনুভূমি-উল্লম্ব ভূমি; দুটি ঘনত্ব : একত্রে ও স্থানে-স্থানে; দুটি ক্রম : একই সঙ্গে ও পর পর। সাহিত্যরীতি ও দৃশ্যশিল্পের ভাষা থেকে এই সমস্ত নান্দনিক বৈশিষ্ট্য আহৃত হয়েছে। দৃশ্যগ্রহণ ও দৃশ্যবিন্যাসের ক্ষেত্রে এইসব বৈশিষ্ট্য এবং মাত্রাগুলির প্রতিটিই পৃথকভাবে ও তারা একত্রে সম্মিলিতভাবে ক্রিয়াশীল। আর ইফেক্‌টিভ দৃশ্যগঠন ও দৃশ্যবিন্যাস মানেই অনেক সমস্যার সমাধান, অনেকখানি প্রাপ্তি।

আমাদের স্বাভাবিক অঙ্গ যেমন প্রায় যে-কোনো কাজ করতে পারে, ক্যামেরাও এখন তেমনি হাত মুখ পায়ের মতো স্বাভাবিক অঙ্গ, যথার্থই বলা হয়েছে, camera can repeat, prolong, abbreviate, reverse, distort, abstract, split off or join up. হ্যাঁ, ক্যামেরা পুনরাবৃত্ত, প্রসারিত, সংকুচিত, সম্বদ্ধ, সংক্ষিপ্ত, বিপরীতগামী, পশ্চাদ্‌গামী, বিকৃত, বিমূর্ত, সংযোজিত, বিভাজিত, স্থির, গতিময়, উল্লম্ফনকর—সমস্ত করতে পারে ও করে থাকে। ক্যামেরার এই ব্যবহারে, ক্যামেরাভাষার প্রয়োগে ও ক্যামেরাশৈলীতে ছবি থেকে ছবিতে, এক যুগ থেকে অন্য যুগে ও পরিচালক থেকে পরিচালকে ব্যাপক পরিবর্তনও হয়ে থাকে।

ক্যামেরাশৈলী

আইজেনস্টাইন-এডওয়ার্ড টিশে-জুটি : টিশে চিত্রকলা নিয়ে পড়াশুনো করে রুশ বিপ্লবের

সময় নিউজরীল ক্যামেরাম্যান বা সংবাদ চিত্রগ্রাহক হিশেবে কাজ করেন। এরপর তিনি ভের্তভের কিনোগ্লাজ গোষ্ঠীতে যোগ দেন ও তারপর আইজেনস্টাইনের নিয়মিত চিত্রগ্রাহক রূপে বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেন। আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রের অসাধারণ দৃশ্যগুণের পেছনে টিশের অবদান অপরিসীম। স্ট্রাইক, পটেমকিন, অক্টোবর, ওল্ড অ্যাণ্ড নিউ, ক্য ভিভা মেক্সিকো, আলেকজাণ্ডার নেভ্স্কি ও আইভান দ্য টেরিব্ল্—একটির পর একটি ছবিতে টিশের ক্যামেরাশৈলী আইজেনস্টাইনকে ঈপ্সিত ফল অর্জনে সাহায্য করেছে। তিনি ছিলেন লাইটিংয়ে, কম্পোজিশনে ও লেন্সের ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। তাঁর কাজ সম্পর্কে আইজেনস্টাইনের মন্তব্য আগেই উদ্ধৃত করেছি, যেখানে আইজেনস্টাইন আরও বলেছেন, 'আর আলেকজাণ্ডার নেভ্স্কিতে, ভগবান জানেন কেমন করে এবং কোন্ প্রাযুক্তিক উপায়ে, কিন্তু সুনিশ্চিতভাবেই, টিশে শাদা-কালো ছবিতে রঙের একটি অভ্রান্ত বিভ্রম সৃষ্টি করতে সমর্থ হন।' আইভান দ্য টেরিব্ল্ ছবির দ্বিতীয় পর্বের ছোট একটি অংশ আক্ষরিক অর্থেই রঙিন, আগফা কালারে তোলা, রঙে আইজেনস্টাইনের একমাত্র কাজ। সেখানে লাল-কালো বর্ণবিন্যাসের উজ্জ্বল লাল রঙকে ধীরে ধীরে নীল ছোপযুক্ত লালে রূপান্তরিত করে নির্দিষ্ট চরিত্রের আতঙ্ক চমৎকার ফোটানো হয়েছে। এইভাবে বর্ণবিন্যাস প্রতীকী চরিত্র পায়, রঙ মোটিফ হয়ে ওঠে।



অরসন ওয়েলস-গ্রেগ টোলাণ্ড-জুটি : পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ছবিগুলির একটি, ওয়েলসের সিটিজেন কেন-এর কালোত্তীর্ণ দৃশ্যশৈলী আলোকচিত্রী টোলাণ্ডের অসাধারণ ফলপ্রদ ক্যামেরাশৈলী ছাড়া সম্ভব ছিল না। দুই থেকে দু'শ ফিট দূরে অবস্থিত বস্তু বা ব্যক্তি থেকে স্পষ্ট

ফোকাস উৎপাদনক্ষম যে চূড়ান্ত পদ্ধতি টোলাণ্ড ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স দ্বারা সম্ভব করেছিলেন তার ফল বিস্ময়কর। ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ও ডিপ ফোকাস লেন্সের ব্যবহার নাটকীয় সংঘাত তৈরির জন্য এক ফ্রেম থেকে কেটে অন্য ফ্রেমের উপাদানে যাবার প্রচলিত পদ্ধতির বদলে ফ্রেমের দৃশ্য-পরিধি বাড়িয়ে একই ফ্রেমের মধ্যে বিভিন্ন উপাদানকে সংহত করেছিল। আর তার সঙ্গে ছিল আলোকসম্পাতে শাদা/কালো ও আলো/ছায়ার তীব্র বৈপরীত্য যা অভিনয়কে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছিল। সিটিজেন কেন ছবিতে টোলাণ্ডের অবদানের গুরুত্ব বস্তুত অনস্বীকার্য। সামগ্রিকভাবে ছবি থেকে তার ফোটোগ্রাফিকে আলাদা করা সত্যই কষ্টকর। কেন-এর ত্রুটিগুলি অর্থাৎ গ্রেডিংয়ের অসঙ্গতি, সর্বাত্মক সমান তল ও নিয়ন্ত্রিত বৈপরীত্যের কিছু অভাব এবং অতি পরিমাণ আলো ব্যবহারের অসুবিধা এগুলি শুধরে নিয়ে টোলাণ্ড তাঁর স্টাইলটিকে নিখুঁত ও প্রসারিত করেছিলেন পরবর্তী ছবিগুলিতে।



ইঙ্গমার বার্গম্যান-স্বেন্ নিকভিস্ট-জুটি : বার্গম্যানের প্রায় কুড়িটি ছবির সফল ক্যামেরাম্যান হিশেবে নিকভিস্ট স্বনামধন্য। যার মধ্যে দ্য ভার্জিন স্প্রিং, থ্রু এ গ্লাস ডার্কলি, দ্য সাইলেন্স, পারসোনা, শেম, প্যাশন অব অ্যানা, টাচ, ক্রাইজ অ্যাণ্ড হুইস্পারস, সীন্স ফ্রম এ ম্যারেজ, ফেস টু ফেস, দ্য সারপেন্ট'স এগ, অটাম সোনাটা, ফ্যানি অ্যাণ্ড আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি খুবই উল্লেখযোগ্য। আলোছায়ার অনবদ্য বণ্টন, ভীষণ প্যাশনেট পরিবেশ চিত্রণ, ব্যাকগ্রাউণ্ড ও ফোরগ্রাউণ্ডের সার্থক স্থান বিনিময়, অত্যন্ত অভিঘাতী করে ক্লোজ-আপ গ্রহণের ও কম্পোজিশন

গঠনের ক্ষমতা এবং রঙিন ছবিতে রঙের চিন্তাশীল প্রয়োগ ও সংবেদনশীলতা তাঁকে ধ্রুপদী চিত্রগ্রাহক করে তুলেছে। বার্গম্যানের ছবি অভিনয়ের জন্য যেমন তেমনি নিকভিস্টের চিত্রগ্রহণের (নিখুঁত কম্পোজিশন ও ক্যামেরা মুভমেণ্ট, গভীর চিত্রগ্রাহ্যতা, শৈল্পিক সারল্য ও রহস্য) জন্যও অমোঘতা পেয়েছে। বার্গম্যানের ছবির পূর্ববর্তী ক্যামেরাম্যান গুণার ফিশার-এর কাজের সঙ্গে



তাঁর কাজের মেজাজ ও স্বাদের পার্থক্য লক্ষণীয়। স্মাইলস অব এ সামার নাইট, দ্য সেভেন্থ সীল, ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীজ, দ্য ম্যাজিশিয়ান প্রভৃতি ছবিতে ফিশারের ইনডোর কম্পোজিশনের টোনালিটি এবং আউটডোর কম্পোজিশনের টেক্সচার অসাধারণ শৈল্পিক ও নান্দনিক সুষমা পেয়েছে। তাঁর শাদা-কালো আলোকচিত্রে টোন ও টেক্সচারের বিন্যাস, ভারসাম্য ও সুষমা এবং কম্পোজিশনের গভীরতা, আয়তন ও অন্তর্মুখীনতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিশোর-গ্রন্থ অলংকরণে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল কিন্তু চিত্রগ্রহণে ওই অলংকরণ-প্রবণতার কোনো ছাপ পড়েনি। তাঁর আলোকচিত্রশৈলী সর্ব অর্থেই গভীর, গম্ভীর, ধ্রুপদী, তবু উইটি।

জঁ লুক গদার-রাউল কুতার-জুটি : অন্য আলোকচিত্রীরা যদি মূলত হন আলোকচিত্র পরিচালক বা ডিরেক্টর অব ফোটোগ্রাফি, রাউল কুতার তাহলে বিশেষভাবেই চিত্রগ্রাহক বা ক্যামেরাম্যান। গদারের ছবির প্রায়োগিক ও নান্দনিক বিশিষ্টতার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বস্তুত অপরিসীম। সামরিক বিভাগের আলোকচিত্রী ও তারপর 'লাইফ' পত্রিকার চিত্রসাংবাদিক হিশেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর সংবাদচিত্র ও তথ্যচিত্রে ক্যামেরাম্যানের কাজ করে তিনি কাহিনীচিত্রে—বিশেষত গদারের ছবিতে ও নুভেল ভাগের অন্যান্য ছবিতেও ক্যামেরা চালিয়ে জনপ্রিয় হন। কুতারের এই সাংবাদিক/তাথ্যিক অভিজ্ঞতা, গদারের ছবিতে তথ্যমূলকতার যে বিরাট ভূমিকা তার সঠিক বাস্তবায়নে, যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এই জুটির ক্যামেরাশৈলীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি—তথ্যমূলক প্রতিন্যাস, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী শক্তি, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, হাতে-ধরা ক্যামেরার কলাকৌশলের প্রয়োগ ইত্যাদি সমস্তই

সাংবাদিক সুলভ বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতা। কুতারের আলোকচিত্রশৈলী ফ্ল্যাট লাইটিং, ক্যামেরার অবিশ্রাম গতিময়তা, দ্রুতগামী প্যান, ম্যাট ইমেজ বা প্রতিমা ইত্যাদির উপর জোর দিয়ে গদারের অনুসন্ধান-প্রবৃত্তিকে বাস্তবায়িত করে। কেননা চিহ্ন ও প্রতিমা, উদ্ধৃতি ও পরোক্ষোক্তি, রূপক ও মোটিফ, প্রতীক ও আর্কিটাইপের মধ্য দিয়ে গদার তাঁর ছবিতে, ছবির পর ছবিতে, নিজেরই অবস্থান ও পরিচয় অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করে যেতে থাকেন। গদারের এই সত্যান্বেষণে কুতার তাঁর যোগ্য সহযাত্রী।



সত্যজিৎ রায়-সুব্রত মিত্র-জুটি : এই জুটির ক্যামেরাশৈলীর কথা আলোচিত হয়েছে গোবিন্দ নিহালনীর প্রবন্ধে।

আরও কয়েকজন বড় ক্যামেরাম্যানের নামোল্লেখ করে এই অংশের আলোচনা শেষ করছি—যেমন—বিটজার, জোসেফ আগস্ট, ডানিয়েল্‌স, চার্লস ল্যাং, হেনরি মিলার, কে. স্রুস, এ. স্কাভার্দা, জি. ডি. ভেনানজো, পি. দ্য. সান্‌তিস, আর. মেট, ফিগুয়েরোয়া, প্রমুখ। এঁদের কারও-কারও খ্যাতি পরিচালক-নির্ভর, কারও-কারও পরিচালক-নিরপেক্ষ।

পরিচালক-চিত্রগ্রাহক সম্পর্ক কেমন সূক্ষ্ম-জটিল এবং দ্বন্দ্বমধুর হতে পারে সেই বিষয়ে বার্গম্যানের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাক—ক্যামেরাম্যানের পক্ষে দুটো জিনিশ খুব প্রয়োজন। প্রথম হচ্ছে টেকনিকালি তাকে হতে হবে একেবারে নিখুঁত, এবং একই সঙ্গে আলোর ব্যাপারে তাকে প্রথম শ্রেণীর হ'তে হবে। দ্বিতীয়, নিজের ক্যামেরা চালানোতেও তার প্রথম শ্রেণীর যোগ্যতা থাকা চাই। ক্যামেরাম্যান আর আমি, দুজনের মধ্যে একটা চুক্তি হয়, সেটা হচ্ছে ইমেজে কি যোগ করতে হবে। আলো এবং পরিবেশের সমগ্র পরিকল্পনাটা আগে থেকেই আমরা ছকে রাখি। তারপর যাতে আমরা দুজনে রাজী হয়েছি, সে অনুযায়ী ক্যামেরাম্যান তার কাজে এগিয়ে যান। ছবির ব্যঞ্জনা নির্ভর করে ছন্দ এবং মুখমণ্ডলের মিলনে, tensions and relaxations of

tensions। ইমেজের আলোটাই সব ঠিক করে। ধীরে ধীরে আমার আর গুণার ফিশারের ভাবনা চিন্তার যোগটা ছিঁড়ে গেল। আমাদের দুজনের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেল। মানে আমাদের দুজনের একত্ব, আমাদের দুজনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক, ব্যক্তিগত আন্তরিক আদান প্রদান, যা আমাদের কাছে ছিল অত্যন্ত দরকারী, সেটা আল্‌গা হয়ে গেল, পুরোনো বাঁধনটা খসে গেল, এর কারণ কি জানেন, দিন দিন আমি ওর ওপর বড্ড বেশি কর্তৃত্ব করছিলাম, প্রায় একটা পীড়নকারী হয়ে উঠেছিলাম, নিষ্ঠুর ও খামখেয়ালী হয়ে উঠেছিলাম, এবং এ ব্যাপারটায়ও সচেতন হয়ে উঠেছিলাম যে আমি ওকে অপমান করতে পারছি। নিক্‌ভিস্ট অনেক বেশি দৃঢ় ব্যক্তিত্বের মানুষ। ওর বিরুদ্ধে যাবার কোনো সুযোগ ও দেয়নি।

ইমেজের প্রয়োজনে যে আলো তার আবেগ অনুভূতি আমার তরফে, আর বাকি কাজটা সব দারুণ রকম যত্নশীল সহজ স্বচ্ছন্দ, যান্ত্রিক দিক থেকে রীতিমতো দক্ষ ও বুদ্ধিমান তীক্ষ্ণধী নিক্‌ভিস্টের। অথচ গুণার ফিশার কিন্তু একজন অসাধারণ শিল্পী, নিঃশব্দ, অন্তর্মুখী একজন মিউজিশিয়ানের মতো। আমি ওঁর প্রতি যত আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছি, তিনি তত নিজেকে নিজের ভেতর গুটিয়ে নিচ্ছেন। অদ্ভুত মানুষ। 'Devil's Eye'তে ব্যাপারটা আমাদের প্রায় ভাঙনের মুখে নিয়ে এল। কাজ যদি কিছু হয়ে থাকে, সেটা হয়েছে, যেহেতু তিনি একজন শিল্পী। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার কাজের ব্যাপারে আমি কখনো প্রস্তুত থাকতে পারিনি। নিক্‌ভিস্ট-এর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে অবশ্য এ অসুবিধেটা হয়নি।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, মুভি ফোটোগ্রাফির কথায় ক্যামেরাশৈলী থেকে ছবির সামগ্রিক শৈলী হয়ে গোটা ছবিটার সার্বিক শিল্পরূপের কথাতেই আসতে হয়। এই অখণ্ড প্রক্রিয়ার কথাই আইজেনস্টাইন বলেছিলেন। অখণ্ড রূপকল্পনা ধীরে-ধীরে প্রতীত ও বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে। আলোকচিত্রায়ণ হয়ে ওঠে সামগ্রিক চলচ্চিত্রকরণের এক সাংগঠনিক-ভাবে-সংশ্লিষ্ট উপাদান।

চলচ্চিত্রে, একদিক থেকে দেখলে, প্রধান মৌল পদ্ধতিগুলি হল যথাক্রমে কম্পোজিশন যা রেখা আকার আয়তন ও গতির ওপর নির্ভরশীল, ইমেজ—যা কম্পোজিশনের পদ্ধতির মাধ্যমে এবং স্থান কাল ও ঘটনা এই তিনের সংমিশ্রণে ও সংশ্লেষণে রূপ পায়, এবং চূড়ান্ত সৃজনপ্রক্রিয়া মনতাজ। কোনো কম্পোজিশন থিমনিরপেক্ষ বা থিম থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, কম্পোজিশন হল যে ইমেজ বা কল্পমূর্তির মধ্য দিয়ে থিমের প্রকাশ ঘটে সেই কল্পমূর্তির সাধারণ বহির্রূপটি। এইভাবে কম্পোজিশন ইমেজের মাধ্যমে থিমের সঙ্গে যুক্ত। যেহেতু সামগ্রিকভাবে থিমই হল কম্পোজিশন ও ইমেজের প্রধান চালকশক্তি তাই থিমের ক্রমপরিণতির সৃজনশীল প্রক্রিয়া মনতাজের কথাও ইমেজ ও কম্পোজিশনের কথায় সমভাবে জরুরি।

ইমেজ ও কম্পোজিশন প্রসঙ্গে ফ্রেমিং-এর কথাও আসে। ইমেজের দৃশ্য গুণাবলীর মতো ইমেজের ফ্রেমিং-এর ব্যাপারটাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সিনেমায় এই ফ্রেমিং জরুরি কেননা তা দর্শকের কাছে ইমেজের নির্দিষ্ট পরিসরটুকু তুলে ধরে। ইমেজের অভ্যন্তরস্থ উপকরণের অর্থাৎ কম্পোজিশনের শাদাশিধে প্রান্তরেখার চাইতে অধিক কিছু হল এই ফ্রেম। ফ্রেমিং অন্তত চার প্রকারে ইমেজকে অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রভাবিত করতে পারে : (১) ফ্রেমের আকার ও ক্ষেত্রফলের মাধ্যমে (২) ফ্রেমে যেভাবে পর্দার ভিতরকার স্থান বিভাজন ও পর্দার বাইরের স্থাননির্দেশ ঘটেছে (৩) ফ্রেমিং যেভাবে ইমেজের অন্তর্গত কেন্দ্রীয় বস্তু বা অবস্থানের দূরত্ব, উচ্চতা ও কোণকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে ও (৪) দৃশ্যের মিজ-অঁ-সেন বন্ধনের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রেমিং যেভাবে নিজেই ধীর ও ধারাবাহিক গতিময়তা পায়।

মিজ-অঁ-সেন একটি ফরাসি শব্দ, এর অর্থ 'দৃশ্যে অন্তর্ভুক্তি'। এর মূল উপাদানগুলি হল

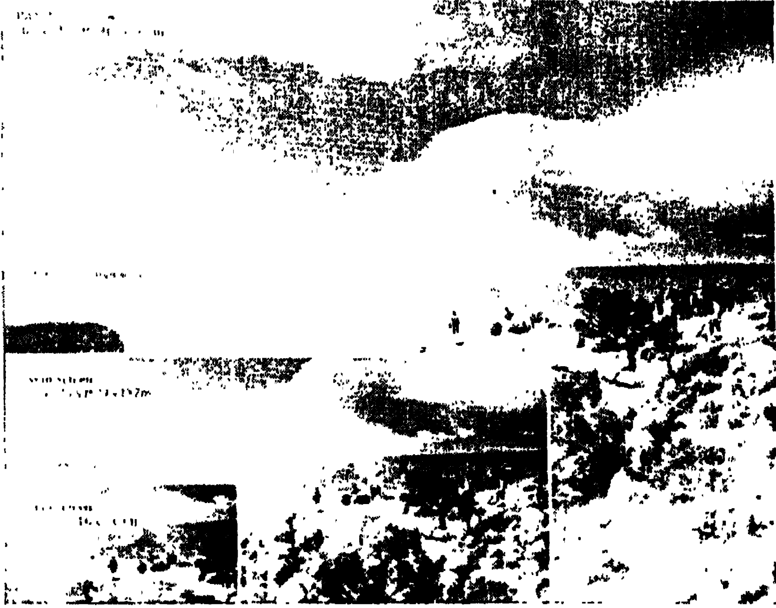
সেটিং, লাইটিং, কস্টিউম বা পোশাক-পরিচ্ছদ ও প্রধান চরিত্রগুলির আচার-আচরণের ধারা। ফিল্ম ফ্রেমে যা দেখানো হচ্ছে তার ওপর পরিচালকের কতটা অধিকার রয়েছে তা এর দ্বারা বোঝা যায়। ক্যামেরার সামনে দৃশ্য বা ঘটনাকে নির্দিষ্টভাবে সংঘটিত করার মধ্য দিয়ে পরিচালক একে নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন। বলা বাহুল্য, মিজঁসেনের প্রধান উপকরণগুলি একক ভাবে ক্রিয়াশীল না হয়ে একত্রে ক্রিয়াশীল ও কার্যকর হয়। এবং তাদের একত্রিত ও সমন্বিত কর্মপদ্ধতি শেষ-পর্যন্ত ছবির অখণ্ড স্থানকালভাবচেতনা পর্যন্তই বিস্তৃত হয়ে যায়। ইমেজ বা প্রতিমার ও দৃশ্যরূপের স্থানিক গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় অবস্থানানুপাত, পরিপ্রেক্ষিত, পুরোভূমি/পশ্চাদ্‌ভূমি সম্পর্ক এবং কম্পোজিশনের রৈখিক উপাদানসমূহের (যার মধ্যে রঙ ও আলোও অন্তর্ভুক্ত) মধ্য দিয়ে। আর কালিক গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে মূলত মুভমেণ্টের দ্বারা, যার মধ্যে পড়ছে দ্রুতি, অভিমুখ, ছন্দ, বর্ণবিন্যাস জনিত গতিময়তা, বিবিধ গতির মধ্যবর্তী সম্পর্ক ও সংঘাত, ফ্রেমের ওপর দিয়ে দর্শকের দৃষ্টিপাত জনিত গতিময়তা, ইত্যাদি।

চলচ্চিত্রের যে-কোনো কৌশল বা পদ্ধতির মতো মিজঁসেনেরও অন্তত তিনটি ভূমিকা বা ফাংশন আছে। এর একটি হল চিত্রগত, দ্বিতীয়টি বর্ণনাত্মক, তৃতীয়টি মনস্তাত্ত্বিক বা আবেগগত। সুতরাং সব মিলিয়ে, মিজঁসেন, বলা যায়, চলচ্চিত্রকারের আত্মপ্রকাশের নিজস্ব উপায়-ই। তা ছবির সবকিছুকে চিত্রনির্মাতার প্রয়োজন অনুযায়ী উদ্দেশ্যমূলক ভাবে নিরূপিত করে দিতে পারে। ফলে মিজঁসেনের অর্থ এক কথায় 'চলচ্চিত্রকরণ'-ই হয়ে ওঠে শেষ-পর্যন্ত। সিনেমাটোগ্রাফি বা আলোকচিত্রায়ণ এইভাবে মিজঁসেনের মাধ্যমে সার্বিক চলচ্চিত্রায়ণ বা ফিল্মাইজেশনেরই অপরিহার্য অঙ্গ।



সিনেমাটোগ্রাফির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ : সিনেমাস্কোপ থেকে আইম্যাক্স

টানা ওলেন



৩৫ মিমি, ৭০ মিমি ও আইম্যাক্স ফিল্‌ম্‌ স্ক্রিন

১৯৫৩ সনে হলিউডের প্রথম 3-D ফিল্ম, ত্রিমাত্রিক কাহিনীচিত্র, 'Bwana Devil'-এর বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল এ-ছবির টিকিট কাটা মানে ঘাড়ের ওপর সিংহ ও কোলের ভেতর প্রেমিকাকে পাওয়া। ১৯৯০ সন নাগাদ, আইম্যাক্স কর্পোরেশনের প্রচার আরও বেশি নাটকীয়—পাহাড়ী গরিলাদের নিয়ে তোলা আমাদের ছবি দেখা মানে গরিলার ছবি দেখা নয়, আপনি-ই গরিলা। এই দুটি বক্তব্যই সিনেমার আঙ্গিকের অব্যবহিত ভবিষ্যৎ বিষয়ে পথনির্দেশক এবং তার চেয়েও বড় কথা, আমাদের দৃশ্যাভিজ্ঞতার ভবিষ্যৎ বিষয়ে পথনির্দেশক। কেননা সর্বাধুনিক প্রযুক্তির স্বপ্নভাণ্ডার হিশেবে সিনেমা, ভবিষ্যতে সংস্কৃতি কী-রূপ নিতে পারে, বারবার তার আভাস দিয়েছে।

লুমিয়ের ভাইদের ও মেলিয়েসের ছবির গভীরে শিকড়-ঢুকে-থাকা সিনেমার, দৃশ্যাভিজ্ঞতার

ক্ষেত্রে অবদান হল এক যুগ্ম অভিঘাতের, এক মিশ্র বিনোদনের। দর্শক জানে, জগতের নানান দৃশ্যরূপকে বাস্তবের মতো করে চোখের সামনে তুলে ধরার ক্ষমতার পাশাপাশি-ই সিনেমার আছে বস্তুত অসম্ভব ও প্রকৃতপক্ষে অকল্পনীয়কেও বাস্তবসম্মত করে পরিবেশন করার ক্ষমতা। এই অভিজ্ঞতাটা দর্শকের কাছে বিস্ময় বা আঘাত হিশেবে আসে। একই সঙ্গে বাস্তবকে ও অবাস্তবকে প্রকাশ করার বা রূপ দেবার ক্ষমতা শুধু সিনেমার একার বৈশিষ্ট্য নয়, সাহিত্য, চিত্রকলা ও বেতারও তা করে থাকে, একই সঙ্গে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের বোধ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু দৃশ্যগত প্রত্যক্ষতা, ব্যাপকতা এবং দৃশ্যাড়ম্বরের জন্য এই দ্বৈততা সিনেমার ক্ষেত্রেই সবচেয়ে শক্তিশালী।

সিনেমা এবং তারপর টেলিভিশন—সংস্কৃতির এই দুটি মাধ্যমই প্রযুক্তি এবং পুঁজির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে শৈল্পিক বিকাশ পেয়েছে বাস্তবতাকে ক্রমাগত আরও আরও বিশ্বাস্য করে অর্জনের জন্য নিরন্তর প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। যদিও প্রাযুক্তিক বিকাশ বাস্তবের রূপায়ণকে শুধু আরও স্পষ্ট, আরও উজ্জ্বল ও আরও বিচিত্র-ই করেনি, বাস্তবের ওই রূপায়ণে যে বিপুল অর্থব্যয় হয়েছে সেই অর্থ উদ্ধারের জন্য অর্থাৎ ছবির বাণিজ্যিক সাফল্যের জন্য বাস্তবকে আরও বাস্তব করে, 'বাস্তববাদী' করে, নানান চমকপ্রদ ও নাটকীয় ছদ্মবেশের মধ্য দিয়ে পেশ করেছে। আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র প্রতিমার মূল উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে বাস্তবকে ধারণ ও সংরক্ষণ করা, তাহলে বাস্তবকে বাস্তবাতীত করে তোলাও সেই প্রকল্পের অংশবিশেষ। যেমন কেভিন রবিন্স বলেছেন, 'আলোকচিত্র দেখাতে চায় চোখের বাহিরে।'

বর্তমান শতককে বিগত শতকগুলি থেকে পৃথক করেছে যে ব্যাপারটা তা হল প্রযুক্তি কীভাবে আমাদের দৃষ্টির ধরনকে সম্প্রসারিত, প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে শেষ-পর্যন্ত, বলা যায়, দৃষ্টিশক্তির স্থান নিজেই দখল করেছে। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে চলচ্চিত্র মাধ্যমের প্রাযুক্তিক ক্ষমতা আমাদের দর্শনের পরিধি নানাভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে, দর্শক কত না বিচিত্র উপায়ে চরিত্রগুলোর সঙ্গে, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে, গল্পকথনের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে থাকেন! পর্দার মাপ ও অনুপাতকে এডিসনের ১ : ১.৩৮ থেকে বর্ধিত করা দর্শকের দৃশ্যাভিজ্ঞতা বৃদ্ধির একটা জোরদার উপায় হিশেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে আমরা দেখাব প্রসারিত পর্দা বা ওয়াইড স্ক্রীন অডিও-ভিসুয়াল সম্ভাবনাকে কীভাবে বাড়িয়েছে, কীভাবে প্রসারিত পর্দার বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলির মধ্য থেকে সিনেমার ভবিষ্যৎ চিহ্নিত হচ্ছে, এবং তার নান্দনিক ফলাফলগুলো-ই বা কী হতে পারে!

পঞ্চাশের দশকে হলিউড নানান নতুনত্বের মধ্য দিয়ে তার বাজার সম্প্রসারণের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল, আর সেই কাজে কিছুদিনের জন্য 3-D হয়ে উঠল তার প্রধান ভরসা। যদিও ১৯৫৩ সনের দুখানি ছবি 'Bwana Devil' ও 'House of Wax' বাণিজ্যিক সাফল্য পেয়েছিল, এই দুই 3-D ছবির প্রদর্শনের সময় কখনো-কখনো ঝামেলা হয়েছে। 3-D ছবি দেখাতে হয় একাধিক প্রজেক্টর ব্যবহার করে, সেগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা নিয়ে প্রায়ই সমস্যা হত, কম খরচের ত্রিমাত্রিক ছবিতে দৃশ্যগুলিও যথাযথ ভাবে তোলা হত না। দর্শককে ছবি দেখতে হত বিশেষ এক ধরনের চশমা পরে, যার ব্যবহারের ফলে কারও কারও চোখ ব্যথা বা মাথাধরার উপসর্গ হত, ফলে সিনেমাহলের ম্যানেজারদের সমস্যা বাড়ত। তাই ত্রিমাত্রিকতার বদলে প্রসারিত পর্দাকেই হলিউড অচিরে বেছে নিল। টেলিভিশনের মোকাবিলায় হলিউড প্রসারিত পর্দার নানান ফর্ম্যাটের আশ্রয় নিয়েছিল, যেমন টড-এ.ও., ৭০ মিমি, সিনেমাস্কোপ, সিনেরামা, ইত্যাদি ইত্যাদি। বৃহৎ আকার ছাড়াও, পর্দার ঈষৎ বক্রতার দরুন, এই সমস্ত ফর্ম্যাট গভীরতার একটা বিভ্রম সৃষ্টি

করতে পারত। প্রসার ও গভীরতা দুয়ে মিলিয়ে মনে হয়েছিল 'প্রসারিত পর্দায় প্রক্ষিপ্ত দ্বিমাত্রিক চিত্রের তুলনায় সিনেমাস্কোপ ভালো এবং সিনেমাস্কোপের চেয়ে সিনেরামা ভালো, কিন্তু সবচেয়ে ভালো হবে প্রসারিত পর্দায় ত্রিমাত্রিক চিত্রের প্রক্ষেপ।' যদিও, কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, 3-D নয়, প্রসারিত পর্দাই হচ্ছে হলিউডের প্রধান ভরসাস্থল। টুয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরি-ফক্স সিনেমাস্কোপকে দর্শকের দরবারে হাজির করল এই দাবি নিয়ে যে 'সিনেমাস্কোপ হচ্ছে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট বিনোদন।' 'The Robe' ছবির প্রিভিউ করতে গিয়ে জনৈক সাংবাদিক লিখেছিলেন 'ভবিষ্যতে বিনোদনের রূপ কী হবে তা আজ আমি স্বচক্ষে দেখলাম।' টেলিভিশনের আক্রমণ, অল্পকালের জন্যে হলেও, ঠেকিয়ে রাখা গেল।

প্রসারিত পর্দার সূচনাকালের কলাকৌশল, একাধিক প্রজেক্টরনির্ভর ছিল বলে, শ্যুটিংয়ের সময় নানা সূক্ষ্ম-জটিল গণনা ও সমন্বয়ের প্রয়োজন হত। প্রসারিত পর্দার ফর্ম্যাট হিশেবে সিনেরামা প্রথম বাণিজ্যসফল পদ্ধতি। পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষাকারী তিনটি ক্যামেরায় শ্যুটিং করে তিনটি প্রজেক্টরের সাহায্যে সিনেরামা ফিল্ম পর্দায় প্রক্ষেপ করা হত। পর্দাটা হত একটা অবতল পর্দা, কেন্দ্রীয় জ্যা বরাবর যার অতল বিন্দু থাকত ৭.৫ মিটার গভীরে। চতুর্থ একটা প্রজেক্টরের সাহায্যে শব্দের ফিতে চালানো হত। পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষাকারী তিনটি প্রজেক্টরের তিনটি রীল, ঠিকমতো সমন্বিত অবস্থায় চালানো হলে, একটা প্যানোরামিক দৃশ্যরূপের সৃষ্টি হত। স্তরভেদগুলি পুরোপুরি বিলীন না হলেও, প্রতিটি ফ্রেম যে-কোনো একটি প্রজেক্টরের দ্বারাই প্রক্ষিপ্ত হত বলে পর্দায় পাওয়া যেত সর্বোচ্চ বর্ণবহুলতা ও ঔজ্জ্বল্য। সিনেরামা দৃশ্যরূপের বেশকিছু পূর্বসূরি ছিল। উনিশ শতকের আশির দশকে দামি ম্যাজিক লণ্ঠন শো-য়ে একাধিক প্রজেক্টর ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল। ১৯০০ সনের প্যারীর বিশ্বমেলায় লুমিয়ের ভাইরা ৯১ মিটারেরও অধিক পরিধি বিশিষ্ট এক বৃত্তাকার পর্দায় দশটি প্রজেক্টরের সাহায্যে ব্রাসেল্স্ ও প্যারী শহরের এরিয়াল শট প্রক্ষেপ এবং ২১ মিটার দৈর্ঘ ও ১৬ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট পর্দার উভয় দিকে ফিল্ম ইমেজ প্রদর্শন করে দেখিয়েছিলেন। ১৯০৫ সন নাগাদ ৭০মিমি ফিল্ম ফর্ম্যাট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। ১৯২৭ সনে আবেল গাঁসের 'Napoleon' ছবিতে কয়েকটা দৃশ্য ছিল যা একসঙ্গে তিনটি পর্দায় দেখানো হয়েছে। ছবিটি তৈরি করতে দু-বছর সময় লেগেছিল এবং বিভিন্ন তলে বা স্তরে সুষমভাবে ইমেজ প্রক্ষেপের জন্য বিশেষ ধরনের ক্যামেরা লেন্সের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। এই ঘটনার অনেক পরে, রোমান ক্রয়টোর (যিনি হলেন আইম্যাক্স কোম্পানির অন্যতর প্রতিষ্ঠাতা) সিনেরামা পদ্ধতির অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 'Labyrinth' ছবিটি নির্মাণ করেন। মনট্রিলের ৬৭-বিশ্বমেলায় পাঁচটি প্রজেক্টরের সাহায্যে এই ছবির প্রদর্শন যে যুগান্তকারী বলে গৃহীত হয়েছিল তার একটা কারণ এই যে, মাল্টিপল্ প্রজেক্শনের পূর্ববর্তী উদাহরণগুলি লোকে ভুলে গিয়েছিল।

সিনেরামা ফর্ম্যাটের প্রক্ষেপণ ব্যবস্থা ছিল জটিল। পর্দার গভীর বক্রতার দরুন পর্দার একেবারে মুখোমুখি-বসা দর্শকেরা ছাড়া অন্যেরা সম্পূর্ণ দৃশ্যরূপ উপভোগ করতে পারতেন না। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে বেশকিছু সিনেরামা কাহিনীচিত্র নির্মিত হয়, কিন্তু সিনেরামার প্রযুক্তিকৌশল ছিল এত কঠোরভাবে অনমনীয় যে প্রাযুক্তিক ভাবে আরও সহজ ফর্ম্যাট সিনেমাস্কোপ এসে তাকে হটিয়ে দেয়।

একটা প্রাযুক্তিক পদ্ধতিকে কীভাবে বাণিজ্যসফল করে তুলতে হয় তার অন্যতম উদাহরণ সিনেমাস্কোপ। প্রযুক্তি ও পুঁজিকে একত্র করে টুয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরি-ফক্স সিনেমাস্কোপের ওপর বাজি ধরে ও বাজি জেতে। সিনেমাস্কোপ হলিউডকে যে অক্সিজেন যোগাল তা নিয়ে একটু

আলোচনা করা দরকার, বিশেষত আইম্যাক্স পদ্ধতির বিকাশ ও বিপণন বিষয়ে আলোচনার সময় তা প্রতিতুলনার কাজে আসবে। এই পদ্ধতিতে ছবি তোলার জন্য একটি ক্যামেরারই প্রয়োজন হত। ক্যামেরায় লাগাতে হত অ্যানামরফিক লেন্স, যা সাধারণ ৩৫ মিমি ফিল্ম নেগেটিভের উপর ইমেজকে সংহত ও সম্বদ্ধ করে ধারণ করাত। প্রজেক্টরের সামনে লাগানো বিপ্রতীপ একটি লেন্স তারপর ইমেজকে মুক্ত ও প্রসারিত করে বৃহদাকার পর্দা জুড়ে ছড়িয়ে দিত। একক ক্যামেরা- ও প্রজেক্টর-নির্ভর ব্যবস্থা ছিল বলে এই পদ্ধতির বৈচিত্র্য ছিল অনেক বেশি, ফলে, সিনেরামার তুলনায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশও ছিল বেশি। সিনেমাস্কোপের আর একটা বড় সুবিধা ছিল। এর পর্দার বক্রতা হত অনেক কম (অতলবিন্দু ১.৫ মিটার গভীরে), ফলে হলের যে-কোনো সিট থেকেই দর্শক সম্পূর্ণ দৃশ্যরূপ উপভোগ করতে পারতেন। বস্তুত hypergonaar lens নামে সুপ্রসারিত দর্শনক্ষেত্রের এক লেন্স আবিষ্কৃত হয়ে যাওয়ায় হলের সমস্ত অবস্থান থেকেই দর্শন সমানভাবে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এই লেন্স উৎপাদনের স্বত্ব কিনে নিয়ে ফক্স ১৯৫৩ সনে দম্ভভরে ঘোষণা করেন যে এখন থেকে সমস্ত ছবি তাঁরা সিনেমাস্কোপেই বানাবেন : 'টুয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরি-ফক্স কোম্পানি সিনেমাস্কোপের প্রতি নিবেদিত এই ধারণা থেকে যে আমরা বিশ্বাস করি এই পদ্ধতি দর্শককে এমন এক স্তরের বিনোদন উপহার দেবে যা আর-কোনো মাধ্যমে লভ্য নয়, এবং এমন চমকপ্রদ তার প্রভাব যে চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা হচ্ছে, আর-সমস্ত-ধরনের ফিল্মই এবার অপ্রচলিত হয়ে যাবে।'

হলে সিনেরামা ব্যবস্থা চালু করতে গেলে যে ব্যাপক পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে হত, সিনেমাস্কোপ চালু করতে গেলে তার চেয়ে অনেক কম করার প্রয়োজন হত। তবু তাতেও যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন ছিল, কেননা প্রথম দিকে অন্তত টুয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরি-ফক্স কোম্পানি হলে স্টিরিও-সাউণ্ড ব্যবস্থা থাকা আবশ্যিক বলে ধার্য করত। কোম্পানি যদিও পরিবেশকদের অযথা উদ্বিগ্ন হতে বারণ করেছিল, কিন্তু হলিউড, প্যারী ও লন্ডনে সিনেমাস্কোপের নমুনা প্রদর্শন যে হৈচৈ ফেলে দেয় তার ফলে পরিবেশক/প্রদর্শকদের কাছে অন্য কোনো পথ খোলাও ছিল না। 'হলের আর্থিক সামর্থ্য থাক না-থাক, সিনেমাস্কোপ দেখার পর, তাকেই বরণ করতে হবে। কেননা মাধ্যমটি বিনোদনের চাইতে অনেক বেশি কিছু, তা সর্বগ্রাসী।'—এই ছিল সকলের অভিমত। উদ্ভাবনের তিন বছরের মধ্যেই, ১৯৫৬ নাগাদ, সিনেমাস্কোপ প্রধান ফিল্ম ফর্ম্যাট হয়ে গেল। আমেরিকা ও কানাডায় ২২,০০০ সিনেমা হলের মধ্যে ১৭,৪০৮টি এবং ৪,৫০০ ড্রাইভ-ইনের মধ্যে ৩,৬৫৬টি সিনেমাস্কোপ ব্যবস্থা চালু করে দিল। শুধু যে বাণিজ্যিক সাফল্য বাড়ল তাই নয়, দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি পাবাব ফলে অনেক নতুন হলও খুলতে হল। টুয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরি-ফক্স কোম্পানির সভাপতি সানন্দ ঘোষণা করলেন, 'শুধু যে সিনেমাস্কোপ থিয়েটারের সংখ্যা আশাতীত ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা-ই নয়, সিনেমাস্কোপ ফিল্মের সংখ্যা ও বৈচিত্র্যও অভাবনীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। হলিউডের প্রধান স্টুডিওগুলির মধ্যে একটি ছাড়া আর প্রত্যেকে তার প্রধান প্রযোজনাটি এখন সিনেমাস্কোপে তুলছেন।'

ব্যতিক্রমী স্টুডিওটি ছিল প্যারামাউন্ট। তারাও প্রসারিত পর্দার জন্য তাদের নিজস্ব ফর্ম্যাট ভিস্তা ভিশন নিয়ে তখন গবেষণা করছিল। এই পদ্ধতিতে ইমেজকে বৃহদাকার করা হত অ্যানামরফিক লেন্সের সাহায্যে নয়, ক্যামেরার ভিতর ফিল্ম নেগেটিভ ফ্রেমের আকারকে বর্ধিত করে। ফিল্ম নেগেটিভকে চালনা করা হত উল্লম্বভাবে নয়, অনুভূমিকভাবে। প্রতিটি ফ্রেমে থাকত আটটি পারফোরেশন। ভিস্তা ভিশনের অনুভূমিক শ্যুটিং ও প্রজেক্শন ব্যবস্থা আইম্যাক্স পদ্ধতির পূর্বসূরি।

আমেরিকায় সিনেমাস্কোপের সাফল্য শুধু টেলিভিশনের আগ্রাসনকে প্রতিহতই করল না, চলচ্চিত্রশিল্পের জন্য একটা নতুন বাজারও খুলে দিল। হলিউডে সিনেমাস্কোপের আবির্ভাবের তিন মাসের মধ্যে টুয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরি-ফক্স তার সমস্ত পুরনো ছবির স্বত্ব (যার অর্থমূল্য ৩ কোটি ডলার) টেলিভিশনকে বিক্রি করে দেবার কথা ভাবছিল। যার অর্থ, চলচ্চিত্র নিজে ভাবিকালের বিনোদন মাধ্যম হিশেবে নতুন রূপ পাচ্ছিল ও অপেক্ষাকৃত নতুন মাধ্যম টেলিভিশনকে অতীতের মুখাপেক্ষী করছিল : 'শেষ-পর্যন্ত সমস্ত ছবি যা ত্রিমাত্রিক নয় বা প্রসারিত পর্দার জন্য নির্মিত নয়, তাদের টেলিভিশনে বিক্রি করে দেয়া হবে, সারা পৃথিবী জুড়েই এটা হবে।' ১৯৫৩-র গোড়ার দিকে পরিবেশক-প্রদর্শকরা ফিল্ম স্টুডিওগুলির কাছে আবেদন করেছিল ত্রিমাত্রিক ও প্রসারিত পর্দার নতুন ফর্ম্যাটগুলির মধ্যে একটা ন্যূনতম সমতা রক্ষা করতে, কিন্তু দু-বছরের মধ্যেই সিনেমাস্কোপ হয়ে উঠল স্ট্যাণ্ডার্ড ফর্ম্যাট, কেননা তা অন্য সব ফর্ম্যাটকে কার্যত অপ্রচলিত করে দিল। সিনেমাস্কোপের সাফল্যের পেছনে প্রধান কারণ হল সিনেরামা, ন্যাচারাল ভিশন'স 3-D এবং স্টিরিওটেক্‌নিক্স লিমিটেডের তুলনায় তার যে অধিক প্রাযুক্তিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ছিল তা, কিন্তু বিভিন্ন বাণিজ্যিক পত্রিকায় আই-উইটনেস রিপোর্টও এ-কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

সাধারণত 'The Robe' ছবিকে হলিউডের প্রথম সিনেমাস্কোপ ফিল্ম হিশেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে সিনেমাস্কোপে তোলা প্রথম ছবি হল 'How to Marry a Millionaire' যা 'The Robe'-এর পরে মুক্তি পায়। এই দুটি ছবি থেকেই কিছু-কিছু অংশ, 'Gentlemen Prefer Blondes' ছবির অংশবিশেষ, এবং মোটর রেসিং ও নিউ ইয়র্ক বন্দরের সিনেমাস্কোপ শট মিলে টুয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরি-ফক্স-এর প্রচারচিত্র তৈরি হয়। যা দেখে ডেইলি ফিল্ম রেণ্টার-এর প্রতিবেদক বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়েন : 'শটগুলি দর্শককে সরাসরি দৃশ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। বিশেষত বেটি গ্রেবল, লরেন ব্যাকল ও মেরিলিন মনরোকে নিয়ে তোলা ইনডোর দৃশ্যগুলি। এই সমস্ত দৃশ্যে প্রসারিত পর্দা জুড়ে দক্ষভাবে স্থাপিত তিন তারকা যখন নিজেদের মধ্যে চমকপ্রদ কথোপকথন চালিয়ে যান তখন মনে হয় আমি নিজেই যেন তাতে অংশগ্রহণ করছি।' সন্দেহ নেই, প্রতিবেদকের এই প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবেই ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া কিন্তু পরবর্তীকালে আইম্যাক্স ফিল্ম দর্শন করে সমালোচকদের যে বিস্ময়াবেশ তার সঙ্গে এর তুলনা প্রাসঙ্গিক। ওই প্রচারচিত্র সিনেমাস্কোপের বেশ কিছু মূল বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছিল, যেমন : গতি, দৃশ্যরূপের প্রসার, তীক্ষ্ণ আলোকময়তা ও উজ্জ্বল বর্ণবিন্যাস। এদের সঙ্গে ছিল ছবির ধ্রুপদী মিজ-অঁ-সেন বন্ধন। এটা লক্ষণীয় যে পূর্বোক্ত প্রতিবেদক প্রশংসার জন্য যে তিনটে উপাদানকে বেছে নিয়েছিলেন—ইনডোর সেটিং, তারকা আর চমকপ্রদ সংলাপ—সেগুলি সমস্তই চলচ্চিত্রের অপেক্ষাকৃত প্রথাগত উপাদান। যে তিনটি উপাদান দর্শককে গল্পকথনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে। ১৯৫৬ সন নাগাদ বোঝা যায়, পর্দার আকারই সব নয় : 'শুধু সিনেমাস্কোপ হলেই চলবে না। প্রথম এবং সর্বপ্রধান হল গল্পাংশ, তারপর সেই গল্পকে যে-সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী পর্দায় পরম উপভোগ্য বিনোদনে রূপান্তরিত করবেন, তা গল্পের চাহিদা যাই হোক না কেন, তাঁরা' (টুয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরি-ফক্সের সভাপতির বিবৃতি)।

প্রসারিত পর্দার যে প্রযুক্তি তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, ছবির বিষয়বস্তু ও নন্দনতত্ত্বও পরিবর্তিত হয়েছে। চিত্তাকর্ষক ও মনোরঞ্জক বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন সময়ে চিহ্নিত হয়েছে, যার মধ্য থেকে সময়ের বিশেষ-বিশেষ প্রত্যাশা ও প্রতিক্রিয়া বেরিয়ে আসে। যে-সমস্ত উপাদান আবেগবহুল গল্প তৈরি করে, দর্শকের দুঃখ-বিষাদ উসকে দেয়, সেগুলির চাহিদা পাল্টেছে। কেন

পাল্টেছে তা একটা আলোচনার বিষয় হতে পারে এবং কেন প্রসারিত পর্দার ছবির ক্ষেত্রে অডিয়েন্স ইন্‌ভল্‌ভ্‌মেণ্টের (ছবির সঙ্গে দর্শকের সংশ্লিষ্ট হয়ে যাওয়ার) বিশেষ কয়েকটি ধরন অন্যান্য ধরনের চেয়ে বেশি দেখা গেছে সেটাও আলোচ্য। এই আলোচনায় আইম্যাক্স পদ্ধতি বিশেষভাবে বিবেচ্য হবে, সিনেমাস্কোপের পর প্রসারিত পর্দার সবচেয়ে কার্যকর যে-ফর্ম্যাট আবিষ্কৃত হয়েছে তা হচ্ছে এই আইম্যাক্স, যা একটা সামগ্রিক ও সমন্বিত পদ্ধতি হিশেবে বিকাশ লাভ করেছে, ক্যামেরা থেকে ফিল্ম স্টক, প্রজেক্টর থেকে পর্দা, এবং নির্মিত চলচ্চিত্র—সব মিলিয়ে এক অখণ্ড প্রক্রিয়া।

এই প্রবন্ধ রচনার সময় পৃথিবীতে আইম্যাক্স থিয়েটারের সংখ্যা প্রায় নব্বই। আইম্যাক্স সিস্টেমস কর্পোরেশন (আই.এস.সি) পৃথিবীর প্রধান প্রধান শহরগুলিতে আরও চল্লিশটি থিয়েটার এখন নির্মাণ করছে এবং বিশ শতকের মধ্যে কাহিনীচিত্র প্রদর্শনের জন্য থিয়েটারের এই সংখ্যা একশটি হয়ে যাবে বলে আশা করছে। তাদের আরও দাবি, জর্জ লুকাস ও স্টিভেন স্পীলবার্গের মতো পরিচালক এই ফর্ম্যাটে কাজ করার ইচ্ছে জানিয়েছেন। পৃথিবীতে সিনেমাহলের মোট সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে, এমনকি প্রসারিত পর্দার বিভিন্ন ফর্ম্যাটের (ভিস্তা ভিশন, টড এ.ও., ৭০ মিমি, শোস্ক্যান, ইত্যাদি) সুযোগ-সমন্বিত হলের সংখ্যার অনুপাতেও, আই.এস.সি.-র ওই সংখ্যা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। যদিও এরকম একটি তুলনা করতে পারলে বোঝা যেত, কোনো একটা নতুন অডিও-ভিসুয়াল ফর্ম্যাটকে এখন কীরকম তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। বিনোদন ও প্রমোদ শিল্পে টেলিভিশনের প্রাধান্যকে ওয়াইড-স্ক্রীন প্রতিহত করতে পারেনি, এবং সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে সিনেমাকে ভিডিও ও কেব্‌ল্‌ টিভির প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতেও হয়েছে। দর্শক কী দেখছেন ও কোথায় দেখছেন তার ওপর নির্ভর ক'রে দর্শকসমাজের বিশেষ-বিশেষ কথনভঙ্গি ও ঘরানাগত বৈশিষ্ট্য বিষয়ে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে এবং সেই প্রত্যাশার পূরণে দর্শক সুনির্দিষ্ট ভাবে অভ্যস্তও হয়েছেন। বাণিজ্যিক ছবির একটা বড় অংশ বর্তমানে ৭০ মিমি ফর্ম্যাটে মুক্তি পায়, ফলে প্রসারিত পর্দার আঙ্গিকগত নতুনত্ব আর তেমন নেই। অতএব এই অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে কোনো নতুন ফর্ম্যাটকে প্রতিষ্ঠা দিতে হলে প্রয়োজন প্রচুর পুঁজির, নিয়মিত ও সুদক্ষ বিপণন ব্যবস্থার এবং তার চেয়েও বড় কথা, দর্শকের জন্য ওই ফর্ম্যাটে থাকা দরকার সত্যিকার নতুন ও স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য। 'একটা সুন্দর রঙিন টিভি-ইমেজ সাধারণত সিনেমার পর্দায় যা দেখা যায় তার থেকে মূলগতভাবে কিছু আলাদা নয়। অচিরেই সিনেমা কার্টিজের আকারে বাজারে পাওয়া যাবে। ফলে দর্শক যখন বাড়ির বাইরে গিয়ে ছবি দেখতে চাইবেন তখন তাঁকে যত ভালো জিনিশ উপহার দেওয়া যাবে ততই ভালো। প্রযুক্তির দিক দিয়ে দেখলে তাকে হতে হবে eyeball-filling high-fidelity, আর শিল্পগত ভাবে নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী, একই থোড়-বড়ি-খাড়ার চর্বিত চর্বণ নয়।' ১৯৭০ সনে আমেরিকান সিনেমাটোগ্রাফার পত্রিকা এই মন্তব্য করেছিল।

আই.এস.সি. বর্তমানে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে যে-সমস্ত সংস্থার সেগুলি হল। werks Entertainment, World Odyssey এবং Omni Films International Inc., যারা মনে করে প্রসারিত পর্দার সম্ভাবনা এখনও অফুরন্ত। যদিও আইম্যাক্সের মৌল পেটেণ্টগুলির মেয়াদ ১৯৮৮ থেকে ১৯৯০-এর মধ্যে শেষ হয়ে গেছে, অনেকগুলি পেটেণ্টের উন্নত সংস্করণের মেয়াদ ১৯৯৬-এর পরেও বজায় থাকবে। তাছাড়া ISC সংস্থা এই দাবিও করতে পারবে যে তারা এককভাবে এমন একটা বাজার বানিয়েছে যা প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে টিকে থাকতে সক্ষম। যদি এই দাবি সত্য হয় তবে আইম্যাক্স কীভাবে দর্শকের চাহিদা তৈরি করেছে যা অন্যান্য সংস্থাও

এখন পূরণ করতে ইচ্ছুক ও সক্ষম? কোন্‌খান থেকে এর সূচনা হয়েছে বা হয়েছিল? আইম্যাক্স ফিল্ম বিষয়ক প্রায় সমস্ত আলোচনাতেই এই পদ্ধতির উদ্ভব ও বিকাশের কথা বিস্তারিত ভাবে আছে। জন্মের পঁচিশ বছর পরেও আইম্যাক্সের অভিজ্ঞত' এখনও যদি অসাধারণ বলে গণ্য হয়, তাহলে আমাদের এই পার্থিব জগতের মতো এর সম্পর্কেও, উত্থাপিত মূল প্রশ্নটি হবে : শুরুটা হয়েছিল কীভাবে? এই পুনরাবৃত্তি এ-কথাই প্রমাণ করে যে, যে-কোনো সৃষ্টিগাথার মতো, আইম্যাক্স সৃষ্টির যে ইতিহাস তার পেছনেও আছে, নিজের প্রতি নিজের একটা অমোঘ টান।

মন্ট্রিলের ৬৭ বিশ্বমেলায় 'Labyrinth' ছবির মাল্টিপ্‌ল্‌ প্রজেকশন পদ্ধতির কথা আগেই বলেছি। তা দুই পর্দার ৭০ মিমি পদ্ধতির ব্যবহার ঘটিয়েছিল। কিন্তু এটাকে সিনেরামা পদ্ধতির একটা পরিবর্ধিত সংস্করণ হিশেবেও নেয়া যায়। পাঁচটি পর্দাকে মেলাপ্রাঙ্গণে অনুভূমিক ও উল্লম্ব ভাবে সাজানো হয়েছিল একটা ক্রশের আকারে এবং পরস্পরের-সঙ্গে-সমন্বিত পাঁচটি ক্যামেরায় তোলা ছবি ক্রশাকার পর্দায় প্রক্ষেপ করা হয়েছিল বিভিন্ন বিন্যাসে। মেলার দর্শকেরা কেউ-কেউ প্রদর্শনীর চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার তুলনা টেনেছিলেন এই শতকের শুরুতে সংঘটিত প্রথমদিককার অনুরূপ প্রক্ষেপণের সঙ্গে। কিন্তু জাপানী দর্শনার্থীরা, বিশ্বমেলা '৭০ নিয়ে যাঁরা তখন থেকেই আয়োজনাদি শুরু করে দিয়েছেন, আরও বেশি কিছু করলেন। তাঁরা রোমান ক্রয়টোর ও কলিন লো-কে জাপানে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন, ফুজি কোম্পানির কেইচি ইচিকাওয়ার সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য, উদ্দেশ্য ওসাকা বিশ্বমেলায় ফুজি কোম্পানির প্যাভিলিয়নে দেখানো হবে বলে একটা চলচ্চিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। গ্রেইমি ফার্গুসন ও রবার্ট কার যাঁরা ১৯৬৭ সনে মাল্টিস্ক্রীন কর্পোরেশন গঠন করেছিলেন, তাঁরা ইচিকাওয়া, ক্রয়টোর ও লো-র সঙ্গে মিলে ওসাকা বিশ্বমেলা '৭০-এর জন্য 'টাইগার চাইল্ড' নামে একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। তিন বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ও প্রায় কুটিরশিল্পের মতো পরিবেশে একটা সম্পূর্ণ মৌলিক চলচ্চিত্র-পদ্ধতির আবিষ্কার সম্ভব হল।

'Labyrinth'-এর শ্যুটিং ও প্রজেক্‌শনের যে বিরাট হ্যাপা ও যান্ত্রিক সমস্যাদি ক্রয়টোরকে সামলাতে হয়েছিল (তাঁর মতে এ ছিল এক 'প্রাযুক্তিক অক্টোপাসের বাঁধন') তার থেকে মুক্তি পাবার উপায় ছিল একটাই, তা হল একটা একক ও অখণ্ড পদ্ধতি হিশেবে কোনো ফিল্ম-ফর্ম্যাটের উদ্ভাবন। এটা সম্ভব হল ক্যামেরা ও প্রজেক্টরের মধ্য দিয়ে অনুভূমিক ভাবে চলমান, উল্লম্ব ভাবে নয়, ৭০ মিমি ফিল্ম ফ্রেম উদ্ভাবনের মাধ্যমে। ক্যামেরার নকশা ও নির্মাণ হয় ডেনমার্কে, Jan Jacobsen-এর দ্বারা, পরে এর উন্নয়ন-সাধন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন Pierre Abelos। ফক্সের সিনেমাস্কোপের প্রতিযোগী রূপে পরিকল্পিত প্যারামাউন্টের ভিস্তা ভিশন পদ্ধতিতেও ফ্রেম অনুভূমিক ভাবে চলমান ছিল, কিন্তু এর বিবিধ পার্থক্যগুলির ফলে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্রজেক্টরের প্রয়োজন হল, যে জন্য প্রযোজনার পদ্ধতি হিশেবে তা কখনোই জনপ্রিয় হয়নি। আইম্যাক্স ছবি ৬৫ মিমি ফিল্ম স্টকে তোলা হয় এবং প্রক্ষেপণের জন্য ৭০ মিমি পজিটিভের উপর প্রিন্ট করা হয়। প্রতিটি ফ্রেমের মাপ হয় ৪৯ মিমি × ৭০ মিমি, ফ্রেমপিছু পারফোরেশনের সংখ্যা ১৫। প্রথাগত ৭০ মিমি ফ্রেমের তুলনায় আইম্যাক্স ফিল্ম ফ্রেমের ক্ষেত্রফল হল তার তিনগুণ। যার অর্থ, আইম্যাক্স ফিল্ম ফ্রেমের অনুপাত হচ্ছে ১.৪৩৫ : ১ (সিনেমাস্কোপের ২.৩৫ : ১ ও আদি ফিল্মের ১.৩৩ : ১ অনুপাতের স্থানে)। এই ফিল্মকে সমতল বা ঈষৎ অবতল যে-কোনো পর্দায় প্রক্ষেপ করা যায়, ৩৩.৫ মিটার প্রশস্ত ও ২৪.৩ মিটার উচ্চ—এমন বৃহদাকার পর্দায় প্রক্ষেপ করলেও কোনো দৃষ্টিকটু কণাময়তার সৃষ্টি হয় না। আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্রের পার্শ্ব অক্ষের ৬০ থেকে ১২০ ডিগ্রি এবং উল্লম্ব অক্ষের ৪০ থেকে ৮০ ডিগ্রি বরাবর আইম্যাক্স

ইমেজের অবস্থান।

বিশাল আকারের দরুন আলোকময়তার যে অতিরিক্ত সুযোগ তার সুবিধা পুরোপুরি নেবার জন্য একটা বিশেষ Xenon projection lamp-এর প্রয়োজন হয়েছিল। প্রথমদিকে ২০ হাজার ও ২৫ হাজার ওয়াট ল্যাম্প ব্যবহার করতে হত; পরে ১২ হাজার ও ১৫ হাজার ওয়াট ল্যাম্প নির্মাণ করা হল। ফিল্মের বিরাট আকার, অনুভূমিক চলমানতা এবং প্রজেক্শন ল্যাম্প থেকে নির্গত জোরালো তাপ—সব মিলিয়ে, আইম্যাক্স ক্যামেরা পদ্ধতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে, সম্পূর্ণ নতুন একটা প্রক্ষেপণ পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে হল, আগেকার পদ্ধতির সঙ্গে যার একটুও মিল নেই। উইলিয়ম শ নামে একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারকে এই কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়। ল্যাম্পের তাপ কমিয়ে আনার জন্য তিনি ল্যাম্প-হাউসে জলের সাহায্যে ঠাণ্ডা করা একগুচ্ছ ধাতব আয়না এবং একটি কোয়ার্টজ্ প্রতিফলক দর্পণ ব্যবহার করেন। ল্যাম্প থেকে নির্গত তাপের সমস্যা ছাড়া মূল সমস্যা ছিল পনেরোটি পার্ফোরেশন বিশিষ্ট বৃহদাকার ফিল্ম ফ্রেমকে প্রজেক্টরের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট দ্রুতিতে, না ছিঁড়ে না কুঁচকে, একটানা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া।

অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন থেকে সমস্যার একটা সমাধান মিলল রোন জোন্সের সুবিখ্যাত 'Rolling Loop' পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। এই কর্মকৌশলের দখলি স্বত্ব কিনে নিল মাল্টিস্ক্রীন কোম্পানী এবং তার সাহায্যে আইম্যাক্স প্রজেক্টর তৈরি করলেন উইলিয়ম শ। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভুল-ত্রুটি সংশোধনের পর স্প্রকেট দুমড়ে যাওয়ার যে সমস্যা তার সমাধান করা গেল বাতাসের চাপের সাহায্যে একখানা রোলার বরাবর ফিল্মের ফিতেকে মসৃণভাবে চালনা করে যাতে প্রতিটি ফ্রেম প্রজেক্টরের অ্যাপার্চারের ওপর একক ও স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে স্থাপিত ও প্রতিস্থাপিত হয়। যার অর্থ, ফিল্মের ফিতে খুবই কম ঘষা খাবে এবং ফ্রেমের ফোকসিং অত্যন্ত নিখুঁত হবে, ফলে পাওয়া যাবে নিথর নিটোল ইমেজ। পরবর্তীকালে এই পদ্ধতিতে এয়ারজেট ও ভ্যাকুয়াম সাক্শন প্রণালীর প্রয়োগ ঘটেছে, যার ফলে ফিল্ম হ্যাণ্ডলিং-এর মান আরও বেড়ে গেছে। কুঞ্চন কমাতে ও ফিল্মের ফিতের ছোট ছোট টুকরোকে যথাযথ স্থায়িত্ব দিতে ফিল্ম স্টকের ভূমি অ্যাসিটেটে তৈরি না করে পলিয়েস্টার দিয়ে বানানো হল। সম্পাদনার সময় বিভিন্ন টুকরোকে জোড়া হল সনিক্যালি অর্থাৎ সাউণ্ড টেপ যেভাবে জোড়া হয় সেইভাবে, কেননা ফিল্ম-সিমেন্ট দিয়ে জোড়া হলে প্রজেক্টরের মধ্য দিয়ে চলার সময় খুলে যাবে। মসৃণ, প্রায় ঘর্ষণহীন প্রক্ষেপণ ব্যবস্থার ফলে আইম্যাক্স ফিল্ম প্রিন্টের স্থায়িত্ব হয়ে থাকে দীর্ঘকালীন। আইম্যাক্স ফিল্মের বিস্তৃত সাউণ্ডট্র্যাকিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে যার মূল্য মোটেই কম নয়। কেননা কোনো ফ্রেম ছিঁড়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে শব্দ ও দৃশ্যের সঠিক সমন্বয় ফিরিয়ে আনার জন্য অত্যন্ত জটিল পুনর্সম্পাদনার প্রয়োজন হবে।

আইম্যাক্স ছবিতে শব্দ ও ধ্বনি ম্যারেড ফিল্ম প্রিন্টের উপর শব্দের ফালি বরাবর ধরা থাকে না, তা ধরা থাকে একটা পৃথক ৩৫ মিমি ম্যাগ্নেটিক ফিল্মের উপর যাতে থাকে শব্দ ও ধ্বনির ছ'খানি চ্যানেল। খুব সম্প্রতি শব্দের জন্য কম্প্যাক্ট ডিস্কের সেট ব্যবহার করাও হচ্ছে। শব্দের এই ফিতে দৃশ্যের ফিতের সঙ্গে সমন্বিত করে চালানো হয় এবং ধ্বনি, সংগীত ও ইফেক্টের ছ'টি চ্যানেল ছবি-চলাকালীন স্বয়ংক্রিয় ভাবে মিক্সড হয়ে গিয়ে পর্দার পেছনে ও থিয়েটারের পিছনদিকে রাখা স্পিকারসমূহের মধ্য দিয়ে শোনা যেতে থাকে। কোনো কোনো হলে এই স্পিকারের সংখ্যা হয় ৫০-এরও অধিক এবং সিজার প্যালেসের অমনিম্যাক্স পদ্ধতিতে শব্দপরিবর্ধনের যে বিশেষ ব্যবস্থা আছে তাতে অর্ধবৃত্তাকার পর্দার পেছনে ১৬টি এবং সমস্ত থিয়েটার জুড়ে আরও ৮২টি স্পিকার ব্যবহার করা হয়। ফলে আইম্যাক্স ফিল্মের শুধু দৃশ্যগুণ

নয়, শব্দগুণও, অসাধারণ। এখানে দৃশ্যপ্রতিমার মতো ধ্বনিকেও নির্দিষ্ট উৎস বা অবস্থানে চিহ্নিত করতে পারা যায় এবং যেহেতু আইম্যাক্স ইমেজ দর্শকের সক্রিয় দৃষ্টিক্ষেত্রের বাইরেও অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত থাকে, তাই শব্দ বা ধ্বনির ইঙ্গিত দিয়ে পর্দার বিভিন্ন স্থানে দর্শকের মনোযোগ বা দৃষ্টিকে সংহত করতে পারা যায়।

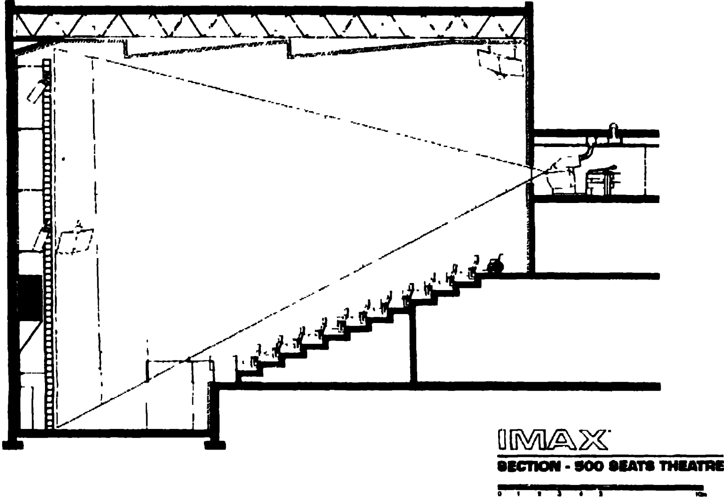
আইম্যাক্স ফিল্মস্টকের দাম খুবই বেশি। সাধারণত ক্যামেরা ম্যাগাজিনে ১০০০ ফুট ফিল্ম ভরা হয়, যদিও বিশেষ কোনো দৃশ্য চিত্রায়ণের জন্য ২৭০০ ফুটেরও ম্যাগাজিন থাকে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই আইম্যাক্স ক্যামেরার নির্দিষ্ট গতিপ্রাপ্ত হতে সময় লাগে ও এই ক্যামেরার মধ্য দিয়ে ফিল্ম যায়ও সাধারণ ক্যামেরার চেয়ে দ্রুততর গতিতে। ১০০০ ফুট আইম্যাক্স ফিল্মে সাড়ে তিন মিনিটের মতো চিত্রায়ণ সম্ভব এবং ২৭০০ ফুটে ৮ মিনিট। শ্যুটিংয়ের ক্ষেত্রে আইম্যাক্স ৬৫ মিমি ফিল্ম স্টক ৩৫ মিমি ফিল্ম স্টকের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয়সাপেক্ষ। আইম্যাক্স ৬৫ মিমি নেগেটিভের দাম ০.৮০ ডলার প্রতি ফুট বা আনুমানিক ২৬৯.০০ ডলার প্রতি মিনিটে। প্রথাগত ৩৫ মিমি ক্যামেরা নেগেটিভের দাম ০.৪৫ ডলার প্রতি ফুট বা আনুমানিক ৪০.০০ ডলার প্রতি মিনিটে। অর্থাৎ পর্দায় স্থায়িত্বকালের বিচারে ৩৫ মিমি ফিল্ম স্টকের চেয়ে আইম্যাক্স ফিল্ম স্টক ৬.৭ গুণ বেশি দামি।

কিন্তু রিলিজ প্রিন্টের কথা ভাবলে খরচাপাতির ব্যাপারটা অন্যরকম। একটা আইম্যাক্স প্রিন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করার খরচ একটা ৫-পার্‌ফোরেশন বিশিষ্ট ৭০ মিমি প্রিন্টের অনুরূপ খরচের চেয়ে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ কম। বস্তুত একটা আইম্যাক্স প্রিন্ট যতবার চালানো যাবে সেই সংখ্যক প্রদর্শনীর জন্য, বেশ কয়েকটি ৩৫ মিমি প্রিন্টের দরকার হবে, এবং সেইদিক দিয়ে দেখলে আইম্যাক্স রোলিং লুপ প্রজেক্টরে চালানো যে-কোনো একখানা ৭০ মিমি আইম্যাক্স প্রিন্ট (ফোটোগার্ড প্রোটেকশন কোটিং সহ) রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বেশ কয়েকটি ৩৫ মিমি প্রিন্টের অনুরূপ খরচের প্রায় সমান।

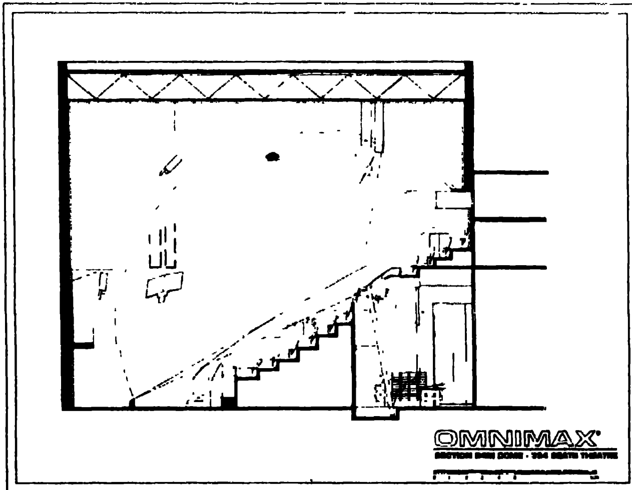
আইম্যাক্স চিত্রাভিজ্ঞতা যে দর্শককে চারদিক থেকে ঘিরে ধরার বা বলা ভালো, গ্রাস করে ফেলার অনুভূতি জোগায় তার কারণ শুধু পর্দার বিরাট আকার এবং শব্দের তীব্রতা ও গতিময়তা নয়, পর্দার পরিপ্রেক্ষিতে দর্শকের বিশেষ অবস্থানের জন্যও। আইম্যাক্স অডিটোরিয়াম বিশেষভাবে নির্মাণ করা প্রয়োজন (আই.এস.সি. সংস্থার মতে যাতে থাকবে একটা 'enter-low, exit-high' দর্শক প্রবাহ) যাতে দর্শকরা খাড়াই ঢাল বিশিষ্ট কয়েকটি সারিতে পর্দার বেশ কাছাকাছি বসতে পারেন। খুব অল্প সংখ্যক প্রথাগত হলই রূপান্তরিত করে আইম্যাক্স-এর উপযোগী করা যায় (ইংলন্ডের ব্র্যাডফোর্ড এর এক বিরল ব্যতিক্রম)। আইম্যাক্স সিনেমাহলের স্থাপত্য কেমন হবে তা আই.এস.সি.-র প্রচার ও নির্দেশনার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। মাল্টিস্ক্রীন সংস্থা বিশ্বমেলা '৭০-এর জন্য 'Tiger Child' নামে যে-ছবিটি তৈরি করেছিল তা দেখানো হয় ওসাকায় ফুজির অদ্ভুত-দর্শন এক প্যাভিলিয়নে, বিরাট-বিরাট ফোলানো টিউব দিয়ে যার কাঠামোটি গড়েন যুকাতা মুরাতা। Poitiers-এর বাইরে ফিউচারোস্কোপ প্রাঙ্গণে আইম্যাক্স সিনেমাহলটি হল একটি বিশাল কাঁচের স্থাপত্য, যার আকার আকাশছোঁয়া দৈত্যাকৃতি পাথুরে স্ফটিকের মতো (চিত্র দ্রষ্টব্য)।

ওমনিম্যাক্স ফিল্ম, যা মূলত প্ল্যানেটোরিয়ামে প্রদর্শনের জন্য নির্মিত, যথাযথ প্রভাব সৃষ্টির জন্য তারও চাই পর্দার ও প্রজেক্টরের পরিপ্রেক্ষিতে দর্শককে বিশেষ অবস্থানে বসাবার ব্যবস্থা করা। ওমনিম্যাক্স ছবি ফিশ-আই লেন্সের সাহায্যে তোলা হয় এবং তাকে প্রক্ষেপ করা হয় দর্শকের সম্মুখস্থ পর্দার ওপর নয়, বরং হেমিস্ফেরিক পর্দার ওপর, যার কৌণিক অবস্থাপন দর্শকের অবস্থানের অধঃ থেকে ঊর্ধ্ব ভাগ পর্যন্ত, দর্শকের দৃষ্টিক্ষেত্রের সীমানা ছাড়িয়ে যার প্রসার (পার্শ্ব

অক্ষে ১৮০ ডিগ্রি, উল্লম্ব অক্ষে ১২৫ ডিগ্রি), সব মিলিয়ে যা দর্শককে ইমেজের মধ্যে ডুবে যাবার অনুভূতি জোগায়। আইম্যাক্স থিয়েটারের চেয়ে এখানে সিটের ঢাল আরও বেশি, কিন্তু দর্শকেরা একটু কোনাকুনি ভাবে হেলান দিয়ে বসে বলে তারা মুখ তুলে ও চারপাশে ঘুরিয়ে পর্দা দ্যাখে, পর্দা তো নয় যেন এক স্বর্গ! এই পদ্ধতিতে প্রক্ষেপণ ঘটানো হয় অডিটোরিয়ামের কেন্দ্রস্থলের পশ্চাদ্ভাগের কোনো স্থান থেকে। এই অবস্থানে প্রজেক্টর বসাতে গেলে হলের ভিতর স্থানের যে অপচয় হবে তা বাঁচাবার জন্য, প্রজেক্টরকে হলের ভিতর এই অবস্থানে একটা দোতলা বাক্সে স্থাপন করে তলার প্রজেক্শন রুম থেকে ফিল্মকে এই প্রজেক্টরে চালনা করা হয় (চিত্র দ্রষ্টব্য)।



আইম্যাক্স/অংশবিশেষ/৫০০ সিটের থিয়েটার



ওমনিম্যাক্স/অংশবিশেষ ২৪ মিটার গম্বুজ/৩৩৪ সিটের থিয়েটার

আইম্যাক্স ফিল্ম প্রযোজনার, পরিস্ফুটনের ও প্রদর্শনের খরচ এত বেশি যে আই.এস.সি.-র ফিল্ম ক্যাটালগে যে-সমস্ত ছবির নাম আছে তার প্রায় সবই বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার দ্বারা প্রযোজিত বা তাদের সৌজন্যে নির্মিত। যেমন : Lockheed, NASA, Chubu Electric, National Film Board of Canada, Johnson Wax, Smithsonian Institution, NTT, Conoco Inc., Fujitsu Ltd., Sanwa Midori, ইত্যাদি। বড় কোনো মেলা বা প্রদর্শনীর অঙ্গ হিশেবেই আইম্যাক্স সিনেমাহলকে স্থাপন করা হয় ওই প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ হিশেবে; যেমন মিউজিয়ামের, স্থায়ী বাণিজ্যমেলার বা বিজ্ঞানকেন্দ্রের অংশ রূপে। অর্থ-বরাদ্দের, পৃষ্ঠপোষকতার ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এই প্রকার শর্তাদির দরুন আইম্যাক্স ফিল্মের বিষয়বস্তু এখন পর্যন্ত যথেষ্ট সীমাবদ্ধ, ঘুরেফিরে কয়েকটি জঁর বা জাতির ছবিই মূলত দেখা যায়, যে ধরনটির সঙ্গে সিনেমার ইতিহাসের প্রথম পর্বের ঘরানাগত ধরনের যথেষ্ট মিল আছে :

প্রাকৃতিক ইতিহাস (natural history) বিষয়ক ছবি : যেমন, Ring of Fire (১৯৯১), Blue Planet (১৯৯০), The Deepest Garden (১৯৮৯), Only The Earth (১৯৮৯), Beavers (১৯৮৮), Water and Man (১৯৮৫), Energy, Energy (১৯৮২);

প্রাযুক্তিক (technological) সাফল্য বিষয়ক ছবি : যেমন, I Write in Space (১৯৮৯), A Freedom to Move (১৯৮৫), The Dream is Alive (১৯৮৫), Hail Columbia! (১৯৮২);

ভ্রমণ বা অভিযান (tourism or destination) বিষয়ক চিত্র : যেমন, Switzerland (১৯৯১), Polynesian Odyssey (১৯৯০), Niagara : Miracles, Myths and Magic (১৯৮৭), Picture Holland (১৯৮৬), Faces of Japan (১৯৮৪), Grand Canyon : the Hidden Secrets (১৯৮৪), El Pueblo del Sol (১৯৮৩), Behold Hawaii (১৯৮৩), The Great Barrier Reef (১৯৮১), Ontario/Summertide (১৯৭৬);

রহস্য-রোমাঞ্চকর (adventure) চিত্র [যদিও আই.এস.সি.-র মতে অবশ্য যে-কোনো আইম্যাক্স ফিল্ম দেখার অভিজ্ঞতাই রহস্য রোমাঞ্চকর] : যেমন, Race the Wind (১৯৮৯), Flyers (১৯৮২), An American Adventure (১৯৮১), Circus World (১৯৭৪);

মানবসভ্যতা (civilisation) বিষয়ক চিত্র [মানুষের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিকে যেসব ছবি তুলে ধরে] : The First Emperor of China (১৯৮৯), Alamo...The Price of Freedom (১৯৮৮), Chronos (১৯৮৫), Journey of Discovery (১৯৮৪), Darwin on the Galapagos (১৯৮৩)।

নাট্যাত্মক কাহিনীমূলক চিত্র (অর্থাৎ চরিত্রের কার্যকলাপ, সংলাপ বা মানবিক সম্পর্কের দ্বারা যেসব ছবি চালিত) প্রায় নেই বললেই চলে আর পরীক্ষামূলক ছবির সংখ্যা মাত্র এক, তিন মিনিটের একটি শ্রুতি-কাব্য-চিত্র, 'Primiti Too Taa' (১৯৮৮)।

আইম্যাক্স ফিল্ম হল সিনেমাস্কোপের সূচনাপর্বের ছবির মতো, যার বেশির ভাগই ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দুর্গম প্রান্তে গিয়ে তোলা চমকপ্রদ অ্যাডভেঞ্চার। 'গল্প বলতে গিয়ে আমরা আমেরিকার দৃশ্যসৌন্দর্যের প্রায় সবটাই ব্যবহার করেছি, ভেরমণ্ট থেকে ফ্লোরিডা পর্যন্ত, ক্যালিফোর্নিয়ার সৈকত থেকে হাওয়াইয়ের সমুদ্রবেলা পর্যন্ত, খাদ ও মরুভূমির তলদেশ থেকে উঠে আসা ঝলসানো তাপ থেকে সিয়েরা-অঞ্চলের তুষারাবৃত পাহাড়ের শৈত্য পর্যন্ত।' ১৯৭৬ সনে আমেরিকান সিনেমাটোগ্রাফার পত্রিকা এই মন্তব্য করেছিল। 'Chronos' ছবিতে পরিচালক

Ron Fricke-এর অ্যাপ্রোচ সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই পত্রিকা বলেছিল, 'ইউরোপের ইতিহাস রন খুব সামান্যই জানতেন এবং যে-যে দৃশ্য তাঁকে নান্দনিকভাবে আকৃষ্ট করেছে তিনি তার সামনে ক্যামেরা বসিয়েছেন। হাজার হাজার বছরের ব্যবধানে প্রাচীন স্থপতি ও আধুনিক চিত্রপরিচালক উভয়ই সৃজনশীলতার একই উৎস থেকে তাঁদের অনুপ্রেরণা ও প্রযুক্তিকৌশল সংগ্রহ করেছেন। পৃথিবী নামের এই গ্রহটিতে সর্বদাই এমন এক পার্থিব শক্তি ক্রিয়াশীল যা একই সঙ্গে সৃষ্টিকারী ও রক্ষাকারী। যার ফলে আমরা বিনাশের হাত থেকে রক্ষা পাই।' আইম্যাক্স ফিল্ম বিশ্বজগৎকে যেন এক মুক্তার আকারে পর্দায় ধারণ করে।

স্থান, কাল বা দূরত্ব কোনোকিছুই বাধা হয়ে ওঠে না। আইসল্যান্ডের উষ্ণ প্রস্রবণ, তাজমহল, গ্রেট ব্যারিয়ার রীফ, চীনের প্রাচীর, দ্রুতধাবমান বন্যপশুর দল, সমুদ্রের অতলগর্ভ, এই মহাপৃথিবীর সবটাই উন্মুক্ত হয়ে পড়ে এক বিশাল-সংখ্যক দর্শকের চোখের সামনে। বিভিন্ন আইম্যাক্স চিত্রের প্রযোজনা-বৃত্তান্ত হল আপাত-অসম্ভব শট সম্ভব করার কলাকৌশলগত দক্ষতার এবং পারিবেশিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শুটিং ইউনিটের বিজয়ের প্রশস্তিগাথা। অভিজ্ঞ আইম্যাক্স চিত্রনির্মাতা Greg MacGillivray তাঁর 'Flyers' ছবিতে অ্যাপ্রোচের এই বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ দিয়েছেন চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এরিয়াল স্টান্টের সবচেয়ে বিপজ্জনক শটকে সফলভাবে চিত্রায়িত করে।

'Behold Hawaii' ছবিতে ম্যাক্‌গিলিভ্‌রে-ফ্রীম্যান ফিল্মস সংস্থা বিশেষ কেব্‌ল্ ডলি রিগ, মিনিক্রেন, ওয়াটারবক্স, গাইরো স্টেবিলাইজার ইত্যাদি ব্যবহার করে ক্যাটামারান থেকে শুটিং করেছেন। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে শুটিং করার সময়ে কীথ মেরিলকে ব্যবহার করতে হয়েছিল ওয়াটারবক্স ও স্পেশাল ফিলটার। আইম্যাক্স ফিল্ম শুটিং যেন অধিযন্ত্রবাদী শুটিং। এর জন্য লাগে দৈহিক ও মানসিক শক্তি, প্রখর জেদ ও গভীর কলাকৌশলগত জ্ঞান। যেমন 'Skyward' (১৯৮৫) ছবির পরিচালক স্টিফেন লো-র মতে, 'বিম স্প্লিটার ও লেন্সের সমস্যার সমাধান করতে পারেন না, শুধু লাইট মিটার নিয়ে ঘুরে বেড়ান এমন 'শিল্পীমানুষ' নিয়ে আমাদের কোনো কাজ হবে না।'

আইম্যাক্স ফর্ম্যাট তার কিছু সুনির্দিষ্ট সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতাকে নিয়ে কাজ করে। প্রথাগত থিয়েটারের তুলনায় আইম্যাক্স থিয়েটারে পর্দার পরিপ্রেক্ষিতে দর্শকের অবস্থান অপেক্ষাকৃত নিচুতে। ফ্রেমের কেন্দ্রবিন্দু অবস্থিত পর্দার নিম্নভাগ থেকে মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ উচ্চতায়। ক্লোজ-আপের ক্ষেত্রে তাই মাথা ও মুখভাগের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকে। আর লং শটকে সাধারণ লং শটের চেয়ে প্রশস্ততর করে কম্পোজ করতে পারা যায়, এক্সট্রিম লং শট থেকে মিডিয়াম ক্লোজ-আপে ক্যামেরার গতিময়তা খুবই সম্বদ্ধ হতে পারে এবং পর্দার বিরাট আকারের জন্য অস্পষ্ট বা কণাময় ইমেজ কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না। এটা লক্ষণীয় যে আইম্যাক্স ফর্ম্যাট যে-সমস্ত অসুবিধা বা চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেছে তার দরুন সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সিনেমাস্কোপের আদিপর্বের পরিচালকদের অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার যথেষ্ট মিল আছে। 'আইম্যাক্স ফর্ম্যাট মোটেই ক্ষমাশীল নয়। যে আলোকসম্পাত টেলিফিল্মের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সন্তোষজনক এবং হলে মুক্তিপ্রাপ্ত কাহিনীমূলক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে চলনসই, আইম্যাক্সের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ বর্জনযোগ্য হতে পারে। যে-কোনো ত্রুটি বা খামতিই আইম্যাক্সে দশগুণ হয়ে দেখা দেয়।' প্রতিক্রিয়াটা এই রকম।

পর্দার বিরাট আকারের দরুন দর্শকের মনোযোগকে পর্দার বিভিন্ন স্থানে আকৃষ্ট করতে পারা যায় বলে আইম্যাক্স ছবিতে শট-পরিবর্তন ঘটে অপেক্ষাকৃত দেরিতে, যাতে পর্দার বামদিক, ডানদিক, তলার দিক ও পিছন দিক চারপাশ থেকে আসা যাবতীয় ধ্বনি ও দৃশ্যপ্রতিমা অনুভব

ও সমন্বিত করার সময় পান দর্শক, যে-কাজের জন্য দর্শককে তার এতদিনকার দেখার ধরনটাই পাল্টে দিতে হয় ('a whole mental house-clearing of all previously engrained ideas concerning visual psychology'.)। আইম্যাক্স যে-ধরনের ছবি করে সেই wide-world ফিল্মের ক্ষেত্রে বিরাটাকার ফ্রেম ও লম্বা লম্বা শট আদর্শস্থানীয়, কিন্তু অভিনয়, সংলাপ ও দৃশ্যের আবেগানুভূতির ক্ষেত্রে তা ক্ষতিকর। দৃশ্যবস্তুর অন্তত কুড়ি ফুট দূরে ক্যামেরা বসাতে হয়। 'এই অবস্থায় কোনো অভিনেতার সঙ্গে সক্রিয় মিথস্ক্রিয়া স্থাপন করা অনেক বেশি কঠিন। অভিনেতারা কী কথা বলছেন তা শোনার জন্যই অনেক সময়ে আপনাকে হেডফোন ব্যবহার করতে হবে। যে অন্তরঙ্গ যোগাযোগটা দরকার তার অনেকটাই এর ফলে হারিয়ে যায়। তাছাড়া অতিরিক্ত আলো ও তজ্জনিত তাপের দরুন অভিনেতারাও তাড়াতাড়ি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন।'— আমেরিকান সিনেমাটোগ্রাফার, ৬৪ বর্ষ সংখ্যা ১২, ডিসেম্বর ১৯৮৩। এর সঙ্গে ২৬ মিটার x ৩৬.৫ মিটার মাপের বিরাট পর্দায় মানুষের মুখের কোনো ক্লোজ-আপ বিশ্বাসযোগ্য করাবার জন্য কী রকম মেক-আপ লাগে তার কথা ভাবুন। আইম্যাক্স ফিল্মে কুইক কাট প্রায় থাকেই না, কেননা তা দর্শককে তীব্র মানসিক আঘাত দেবে ও সম্ভবত প্রচণ্ড বিবমিষার উদ্রেক ঘটাবে। চিত্তাকর্ষক ফিল্ম ন্যারেটিভের বহুল-ব্যবহৃত উপাদানগুলি, তীক্ষ্ণ ও আকস্মিক সংলাপ, প্রতিক্রিয়া ও স্টান্ট সমস্তই, লম্বা কোনো শটের ভিতর প্রয়োগ করতে হবে এবং কুড়ি ফুটেরও অধিক দূরত্বে ঘটলে এইসব উপাদানের প্রভাব কতটুকু হবে তা সহজেই অনুমেয়। প্রথম কাহিনীমূলক আইম্যাক্স ফিল্ম হল 'My Strange Uncle' (১৯৮১), যাকে ধরা হয়েছিল 'অ্যাডভেঞ্চার, অ্যাকশন ও হাস্যরসের এক বিনোদনকর মিশ্রণ' বলে, তার এই সমস্ত উপাদানই নিষ্ফল প্রমাণিত হল এবং শেষে যেখানে এই ছবির শ্যুটিং হয়েছিল সেই নিউজিল্যান্ডের দৃশ্যসৌন্দর্য দিয়ে ছবির আকর্ষণ বজায় রাখতে হল।

ফিল্ম ফর্ম্যাট যা সর্বদাই প্রযুক্তির জয়ের কথা সগর্বে ঘোষণা করে, তার পক্ষে ফের ত্রিমাত্রিকতার সন্ধানে প্রযুক্তির শরণাপন্ন হওয়া খুব স্বাভাবিক। ৯০-বিশ্বমেলায় (ফের ওসাকায়) ফুজিৎসু প্যাভিলিয়নের জন্য নির্মিত 'Echoes of the Sun' হল প্রথম আইম্যাক্স সলিডো-ফিল্ম। ছবিটি 'সালোকসংশ্লেষণের ত্রিমাত্রিক জগৎ'-কে তুলে ধরে। ছবির পরিচালক ফুমিও সুমি, যিনি ত্রিমাত্রিক কম্পিউটার গ্রাফিক্স দ্বারা গঠিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ ওমনিম্যাক্স ফিল্মটি নির্মাণ করেছিলেন। ছবির নাম ছিল 'We are Born of Stars', ছবিটি নির্মিত হয়েছিল জাপানের ৎস্কাবায় অনুষ্ঠিত ৮৫-বিশ্বমেলায় ফুজিৎসু প্যাভিলিয়নের জন্য। 'Echoes of the Sun' ছবিতে উদ্ভিদের আণবিক সংগঠনগুলি বিচিত্র সব নকশার আকারে দর্শকের দিকে ধেয়ে আসে, পাশ দিয়ে উড়ে যায় বা দর্শকের বুক ফুটো করে বেরিয়ে পড়ে। গাছের পাতার শিরা-উপশিরা এবং জালক শিকড়-বাকড় যেন দর্শককে একেবারে শোষণ করে গ্রাস করে ফেলে। এই ইফেক্ট বা প্রভাবটা সৃষ্টি হয় হাই-টেক গগল্স্ এবং ছবি তোলা ও ছবি প্রক্ষেপণের এক দ্বৈত পদ্ধতির ফলে। ওমনিম্যাক্সের মতো সলিডোর পর্দাও অর্ধবৃত্তাকার। ছবি তোলা হয় দুটি ক্যামেরায়, একটা ক্যামেরা ডানচোখের দৃষ্টি অনুসারে ছবি তোলে, অন্যটা বামচোখের দৃষ্টি অনুসারে, ছবি প্রক্ষেপ করা হয় দুটি লেন্সের মাধ্যমে, যারা একবার বামচোখের দৃষ্টি ও আরেকবার ডানচোখের দৃষ্টি অনুসারে প্রতিমাকে পর্দায় প্রক্ষেপ করে, প্রতি সেকেন্ডে মোট ৯৬ বার। দর্শককে পরতে দেয়া হয় এল.সি.ডি. চশমা (লিকুইড ক্রিস্টাল ডিস্প্লে গ্লাসেস), যা পর্দা থেকে আগত অবলোহিত সংকেত অনুসারে, প্রজেক্টরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে, একবার স্বচ্ছ ও আরেকবার অস্বচ্ছ হয়। এইভাবে ডানচোখের লেন্স সেকেন্ডে ৪৮ বার স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ হয়, বামচোখের লেন্সের সঙ্গে নিখুঁত পর্যায়ক্রম বজায় রেখে।

সালোকসংশ্লেষের যে পদ্ধতি খালি চোখে ধরাই পড়ে না, তা কম্পিউটার দ্বারা সৃষ্ট বিরাটাকার ত্রিমাত্রিক দৃশ্যরূপ পায় এই ছবিতে।

নব্বইয়ের দশকে ওয়াইড-স্ক্রীন ফর্ম্যাটের প্রসার ক্রমেই বাড়বে বলে মনে হয়, কেননা আজ আধুনিক নাগরিক জীবনযাত্রার অন্যতম প্রধান কর্ম শপিং বা কেনাকাটার সঙ্গে,তার অঙ্গ হিশেবে, সিনেমাদেখা এসে গেছে। পাইকারি ও খুচরো বিক্রির পরিমাণ ও আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য এখন, বিশেষত উত্তর আমেরিকায়, বড় বড় সব ম্যাল স্থাপিত হয়েছে, যেখানে দোকানপাটের সঙ্গে আছে মিউজিয়ম, লাইব্রেরি ও সিনেমা—যাতে সারাদিনের কেনাকাটাকে একটা বিশেষ চেহারা দেয়া যায়। অবসর সময় ও টিকিটের দামের দিক দিয়ে দেখলে, প্রসারিত পর্দায় ঘণ্টাখানেকের একটা সিনেমা এইসব ক্রেতার চাহিদার পক্ষে যথাযথ। আই.এস.সি. সংস্থা বর্তমানে প্রোমোটারদের সঙ্গে পরামর্শ করে কানাডা ও আমেরিকার বিভিন্ন শপিং সেন্টারে সিনেমাহল স্থাপন করছে। ১৯৯০ সনে আইম্যাক্সের তৎকালীন সভাপতি ঘোষণা করেছিলেন যে নব্বইয়ের দশকে আই.এস.সি.-র প্রধান লক্ষ্য হবে 'অত্যন্ত উন্নত মানের এক সারি বাণিজ্যিক থিয়েটার স্থাপন করা যেখানে সলিডো ফিল্ম দেখানো হবে'। এই সংস্থা ২০০-র মতো চিড়িয়াখানা, অ্যাকোয়ারিয়াম ও প্রাকৃতিক ইতিহাস বিষয়ক মিউজিয়মকেও চিহ্নিত করেছে যেখানে নতুন থিয়েটার স্থাপন করা ও নির্মিত আইম্যাক্স ফিল্মগুলিকে প্রদর্শন করা যেতে পারে, কিন্তু একাধিক কারণে সংস্থা নতুন কাহিনীচিত্র নির্মাণ করতে চায় তার আগে। ওমনিফিল্মসের দাবি, ১৯৯০ সনে তার ব্যবসা আগের বছরের তুলনায় তিনগুণ হয়েছে। বিভিন্ন বিগ স্ক্রীন কোম্পানির প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে আই.এস.সি. তার উৎপাদনকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করতে চাইছে। যেহেতু এই সংস্থাই অতি প্রশস্ত পর্দার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক, তাই সেই সুনাম; ইউরোপ ও আমেরিকা জুড়ে একসারি আইম্যাক্স থিয়েটারের উপস্থিতি, এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সহপ্রযোজনায় অংশগ্রহণ—সব মিলিয়ে আইম্যাক্স কাহিনীচিত্রের প্রদর্শন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এবং নিশ্চিত হওয়ারই সম্ভাবনা।

'আইম্যাক্স অভিজ্ঞতা' বর্তমানে বিপণনের দিক থেকে দ্বিমুখী সুযোগসুবিধার ভাগীদার। এখনও অধিকাংশ মানুষের কাছে এটা একটা নতুনত্ব, যদিও ক্রমে এর অভিজ্ঞতা ততটা নতুন থাকবে না। যে-সব দর্শকের কাছে আইম্যাক্সের অর্থ হল প্রাকৃতিক জগতের চিত্তাকর্ষক, দ্রুতগতিসম্পন্ন, আকাশ-থেকে-নেওয়া শটের দৃশ্যরূপ, তাদের আকর্ষণ ধরে রাখতে গেলে নতুন ধরনের নতুন-নতুন ছবির প্রয়োজন হবে। আধুনিক দর্শকের দৃশ্য-শ্রাব্য অভিজ্ঞতা ও রসাস্বাদনের পরিধি ও মাত্রা খুবই ব্যাপক ও পরিশীলিত এবং 'Water and Man' (১৯৮৫)-এর মতো ছবিকে কাইয়ে দ্যু সিনেমা পত্রিকা যে-ভাষায় অবজ্ঞা করে ('পিণ্ডিটাকে বিনাকষ্টেই গিলে ফেলা যায়') তাতে আই.এস.সি. সংস্থাকে সচেতন হতেই হবে। দৃশ্যরূপকে আরও দার্ঢ্য দিতে হবে আবেগ ও মননের ক্ষেত্রে অধিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যে-সমস্ত উপাদান-উপকরণ— তাদের অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে। এইচ.ডি.টিভি (হাই ডেফিনিশন টেলিভিশন) কী ধরনের বিনোদন উপহার দিতে পারে তা অনুমান করেও প্রসারিত পর্দার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে অগ্রসর হতে হচ্ছে। এইচ.ডি.টিভি প্রকল্প একবার সাফল্য অর্জন করলে সিনেমার উপর তার প্রভাব ভয়ঙ্কর হতে পারে। এইচ.ডি.টিভি থেকে সরাসরি সিনেমা হলে চলচ্চিত্রের সম্প্রচার ঘটলে পরিবেশকদের জন্য প্রিন্টের শত শত কপির এবং সেগুলি বিভিন্ন স্থানে পাঠাবার খরচের আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। ১৯৮৪ সনের হিশাব অনুযায়ী এর ফলে প্রধান কোনো ফিল্মের মুক্তির সময় ২০ লক্ষ ডলারেরও অধিক অর্থ বেঁচে যাবে। অবশ্য, এইচ.ডি.টিভি-র প্রধান প্রভাব পড়বে গৃহ-বিনোদন-বাজারের ওপর, ইনডোর বিনোদনের ওপর, এবং দর্শককে বাড়ির বাইরে টেনে আনতে হলে সিনেমাকে আরও

বিরাট ও আরও বিচিত্র দৃশ্যরূপ উপহার দিতে হবে।

অদূর ভবিষ্যতে আইম্যাক্সকে সফলভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে যে-ফর্ম্যাট সেটা হল মোবাইল ভিশন টেকনোলজি ইঙ্ক্ (নিউ ইয়র্ক) কর্তৃক উদ্ভাবিত ডায়নাভিশন। এই পদ্ধতিও মোটের ওপর ভিস্তা ভিশন থেকে তার কলাকৌশলগত অনুপ্রেরণা পেয়েছে, ৩৫ মিমি ফিল্মে ৩৫ মিমি ক্যামেরায় শ্যুটিং করে তাকে ৮টি স্প্রকেট বিশিষ্ট অনুভূমিক ৭০ মিমি ফ্রেমে রূপান্তরিত করার বিশেষ সুবিধা এই পদ্ধতিতে রয়েছে। এর ফলে শ্যুটিংয়ে বৈচিত্র্য আনা যায় এবং অপেক্ষাকৃত কম ঝামেলাদায়ক প্রক্ষেপণ-ব্যবস্থা ও সিনেমাহলের স্থাপত্যের স্বল্প পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই প্রসারিত পর্দার ফলাফল অর্জন করা যায়। ডায়নাভিশন ফিল্ম ৩৫ মিমি মূল ফর্ম্যাটেও দেখানো সম্ভব। ব্যবসায়িক প্রদর্শনের জন্য প্রথম ডায়নাভিশন ফিল্ম মুক্তি পায় ১৯৮৫ সনে, রক ব্যান্ড কন্সার্ট নিয়ে তোলা সেই ছবিটি হল 'We Will Rock You'। এই ছবিটিই সম্ভবত আই.এস.সি.-কে বাধ্য করে ১৯৯১ সনে তাদের প্রথম আইম্যাক্স রক কন্সার্ট ফিল্ম নির্মাণ করতে —'Rolling Stones AT THE MAX'।

আইম্যাক্স ফর্ম্যাটের পক্ষে রক কন্সার্ট এত উপযোগী বিষয় যে এই বিষয়ে ১৯৯১ সনের আগে আইম্যাক্স ফিল্ম তৈরি হয়নি কেন তা নিয়ে অবাক হতে হয়! ১৯৮৮ সনের আগে আইম্যাক্স ফর্ম্যাট তেমন প্রতিযোগিতার মুখে পড়েনি। ফলে বিষয়ে বৈচিত্র্য আনার তেমন প্রয়োজনও বোধ করেনি। তাছাড়া রক কন্সার্টকে চলচ্চিত্রায়িত করার খরচ ঠিকভাবে তুলে আনতে গেলে এমন এক ব্যান্ড খুঁজে বার করতে হবে যার আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও বিভিন্ন প্রজন্মের দর্শক/শ্রোতাদের মধ্যে জনপ্রিয়তা রয়েছে এবং যার ধ্বনিশৈলী বৃহদাকার আইম্যাক্স প্রয়োগকৌশলের উপযোগী। সমস্ত বিচার করে দ্য রোলিং স্টোনস্ ব্যান্ডকে নির্বাচন করা হয়। AT THE MAX-এর জন্য অর্থের যোগান দেয় আইম্যাক্স এবং বি.সি.এল. সংস্থাবৃন্দ। তাদের আশা ছিল ছবিটি দ্রুত বাণিজ্যিক সাফল্য পাবে এবং আইম্যাক্স ছবি দেখতে দেখতে যাদের একঘেয়েমি এসে গেছে বিষয়ের নতুনত্বের ফলে তারা আবার আকৃষ্ট হবে।

ফর্ম্যাটের বিকাশের এই নতুন পর্বটির দরুন ফর্ম্যাটের আয়ুষ্কাল সুদীর্ঘ ও নিশ্চিত হয়ে গেল এমন নয়, কিন্তু দর্শকসম্প্রদায় ও প্রসারিত পর্দার মধ্যে গুণগতভাবে বিভিন্ন যে-তিন-ধরনের মিথস্ক্রিয়া এতদিন ঘটেছে, এখন ঘটছে ও ভবিষ্যতে ঘটতে পারে তা নিয়ে সুষ্ঠু আলোচনা করার প্রয়োজন আছে, যাতে ভিন্ন-ভিন্ন পর্বে আইম্যাক্স-অভিজ্ঞতার ধরন কীরকম ভিন্ন-ভিন্ন হয়েছে তার তুলনামূলক মূল্যায়ন করা যায়। প্রসারিত পর্দার পূর্ববর্তী ফর্ম্যাটগুলি যে-সমস্ত বিতর্ক-বিসম্বাদের জন্ম দিয়েছিল তার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা এই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে জরুরি।

সিনেমাস্কোপের উদ্ভাবনের একযুগ পরেও চার্লস বার-কে এই ফর্ম্যাটের হয়ে শৈল্পিক লড়াই লড়তে হয়েছে, তাঁর সুবিখ্যাত প্রবন্ধ 'সিনেমাস্কোপ : বিফোর অ্যান্ড আফ্টার'-এর মাধ্যমে। বিশেষভাবে ব্রিটিশ মনোভাবাপন্ন কিছু গোঁড়া চলচ্চিত্র-তাত্ত্বিকের আক্রমণ থেকে এই ফর্ম্যাটকে রক্ষা করতে গিয়ে বার ওই প্রবন্ধে আদি রুশ চলচ্চিত্রের সময় থেকে তখন পর্যন্ত ফিল্ম ফ্রেমের নান্দনিক ধারণায় যে বিবর্তন ঘটেছে তার রূপরেখাটি নির্দেশ করেন। তাঁর তৎকালীন আর একটি প্রবন্ধ উদাহরণ সহযোগে দেখায় অটো প্রেমিঙ্গার, নিকোলস রে, ফ্রঁসোয়া ত্রুফো, ডন সীগেল এবং স্ট্যানলী কুব্রিকের মতো অত্যর পরিচালক বা পূর্ণাঙ্গ স্রষ্টারা কীভাবে সিনেমাস্কোপকে শিল্পসম্মতভাবে ব্যবহার করতে পারেন। বারের মনে হয়েছিল এইসব পরিচালক প্রসারিত পর্দার ফর্ম্যাটগত সুবিধাকে সৃজনশীলভাবে কাজে লাগাতে পারবেন। চলচ্চিত্রের বিকাশে এঁদের প্রধান অবদান ফ্রেমের অভ্যন্তরস্থ কম্পোজিশন গঠনে (কম্পোজিশনসমূহের পারস্পরিক সন্নিধিতে

নয়), চিত্রভাষার ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব ডিপ ফোকস আবিষ্কারের গুরুত্বের চেয়ে, তাঁর মতে, কিছু কম নয়।

বারের মতে প্রসারিত পর্দা 'একটি শটেই মনতাজের পরিপূর্ণতার' নতুন-নতুন সম্ভাবনা তুলে ধরে এবং ষাটের দশকের সমালোচকের পক্ষে যে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা স্বাভাবিক তার দরুন বার মত দেন 'পর্দার প্রসার যা, পরিচালককে গ্রাস করে ফেলবে বলে, একদিন নিন্দিত হয়েছিল, দেখা গেল প্রকৃতপক্ষে তা, বাস্তবতার রূপকার হিশেবে চিত্রপরিচালককে আরও-আরও দায়িত্বই অর্পণ করে।' দর্শকের দায়িত্বও অনুরূপভাবে বৃদ্ধি পায়। মনতাজের মধ্য দিয়ে যে ভাবার্থ ও ব্যঞ্জনা অর্জিত হত তা ছিল অনেকটাই পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু প্রসারিত পর্দার বেলায় দর্শককে তার নিজের দৃষ্টিকোণ বেছে নিতে হয়, ফ্রেমের অভ্যন্তরস্থ উপাদান/উপকরণকে নিজের মতো করে সংযুক্ত ও সন্নিহিত করে নিতে হয়। পিটার বোগদানোভিচের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে হাওয়ার্ড হক্স্ ঠিক ওই কারণেই সিনেমাস্কোপ ব্যবহারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন : 'আমার মনে হয় না, সিনেমাস্কোপ একটা জুতসই মাধ্যম। বিরাটাকার গতিময়তা দেখাবার ক্ষেত্রেই শুধু এটা উপযোগী। অন্যান্য বিষয়ের জন্য এটা অনুপযুক্ত, এতে মনোযোগ সংহত করা কঠিন ও সম্পাদকের পক্ষে কাট করাও খুব মুশকিল। কেউ-কেউ গোঁয়ারের মতো কাট করে দেন ও দর্শকের চোখকে পর্দার এপাশ-ওপাশ ঘুরে দ্রষ্টব্য বিষয়টা খুঁজে নিতে হয়। মনোযোগ নিবদ্ধ করাটা দর্শকের পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে পড়ে— পর্দায় দেখার এত জিনিশ থাকে— দর্শক কখনোই পুরোটা একসঙ্গে দেখতে পান না।'

হক্সের বক্তব্য হয়তো একদিক থেকে যথার্থ কেন না সিনেমাস্কোপ অনেক পরিচালকের পক্ষেই অনুপযুক্ত মাধ্যম বলে প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু বারের প্রবন্ধ থেকে এটাও পরিষ্কার যে মাধ্যমটিকে সৃজনশীল ভাবে ব্যবহার করাও সম্ভব। পরে আইম্যাক্স সম্পর্কেও এই একই ধরনের সমালোচনা শোনা গেছে (এবং এখনও যায়)। সিনেমাস্কোপের অনুপাত ও আয়তক্ষেত্রতা মানুষের দৃষ্টিক্ষেত্রের সঙ্গে অনেক বেশি সাযুজ্যপূর্ণ (আইম্যাক্স ফর্ম্যাটের তুলনায়)। আইম্যাক্স পর্দা থেকে দ্রষ্টব্য সবকিছু দেখতে হলে দর্শকের মাথাকে ক্রমাগত ওঠাতে, নামাতে ও চারপাশে ঘোরাতে হয়। আইম্যাক্স-আবির্ভাবের পর থেকে বিগত কয়েক বছরে অবশ্য দর্শকের দেখার ধরন অনেক বৈচিত্র্য লাভ করেছে এবং দর্শক-সম্প্রদায়ও অনেক বিচিত্র হয়েছে। 'Tiger Child' ছবির আলোকচিত্র পরিচালক Georges Du Faux-এর ভাষায় 'চলচ্চিত্র মাধ্যম কণ্টিনিউটির ক্ষেত্রে রৈখিক ধারাবাহিকতার ধারণা থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে। টিভির প্রভাবের দরুন দর্শক বিভিন্ন ধরনের প্রতিমার (বাস্তব, কল্পনা, সংবাদ, বিজ্ঞাপন) একত্রীকরণ অনুধাবন করতে ও তার রসাস্বাদনেও এখন সক্ষম। এসবই নাট্যাভিজ্ঞতার মনস্তাত্ত্বিক ঐতিহ্য থেকে দর্শকের মুক্তিলাভ। দর্শকের দার্শন সংবেদনশীলতা বর্তমানে এক নতুন অনুভবের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।' মূল প্রশ্নটা এখন হল, আমাদের দেখার ধরনকে অনেকটা পাল্টে দিয়ে আইম্যাক্স (অথবা প্রসারিত পর্দার অন্যান্য নতুন ফর্ম্যাটগুলি) ভবিষ্যতে শুধু প্রাযুক্তিক ভাবেই বিকশিত হবে, না এর পাশাপাশি তার শৈল্পিক বিকাশও ঘটবে? এই ফর্ম্যাটগুলির কি পূর্ববর্তী ফর্ম্যাটগুলির মতো দর্শককে সৃজনশীল ভাবে সংশ্লিষ্ট করার, তার মনস্তাত্ত্বিক আগ্রহ সৃষ্টি করার ও মূল্যায়নের প্রবণতাকে উদ্দীপ্ত করার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে?

আইম্যাক্সের কথনরীতিকে বলা যায়, মোটের উপর, ব্যাখ্যাগত বা উদ্‌যাপনগত, এবং কখনো-কখনো উভয়ই। এই কথনরীতি সাফল্যের বিভিন্ন বিবরণকে তুলে ধরে। দেখায় 'মানুষ' কীভাবে মহাশূন্য জয় করেছে, প্রকৃতির মহান শক্তিকে বুঝে উঠেছে, সভ্যতার মধ্য দিয়ে যে

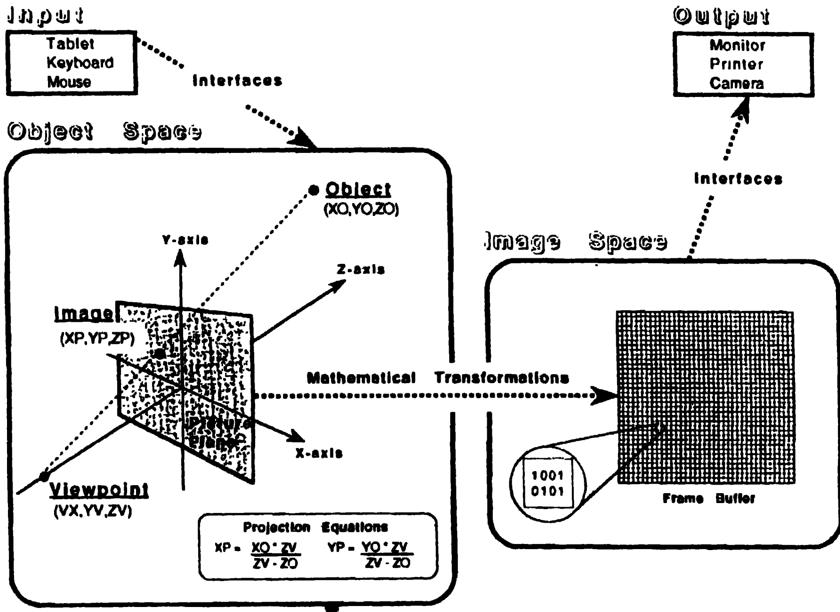
অগ্রগতি হয়েছে নিয়ত তাকে উদ্‌যাপন করছে। আইম্যাক্স সাধারণত দেখায় ও দেখিয়েছে সাফল্যের শীর্ষভাগকে। 'Blue Planet' (১৯৯০) ছবিটি হল প্রথম আইম্যাক্স ফিল্ম যা বক্তব্যের ওই প্রথাগত প্রবণতার সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করার কাজ শুরু করে। লস্‌ অ্যাঞ্জেলস্‌ টাইমস্‌ পত্রিকার ভাষায়, "Taken 330 miles above the Caribbean, through the huge pillars of a space shuttle, it reveals the vast blue ball of Earth, flecked with pearly, swirling clouds in dizzying sharp focus far, far below us. This is a deep-focus shot that might have made Orson Welles drool.' ছবিতে দেখা যায় মেরুদেশের ওপর পৃথিবীর ওজনস্তরে বিরাট হাঁ আব বনজঙ্গল সাফ হয়ে যাওয়ার পর মাদাগাস্কারের লাল মাটির ভারত মহাসাগরে গিয়ে পতন। মহাশূন্যের উচ্চ অবস্থান থেকে ধরা পড়ে এই গ্রহের পরিবেশতন্ত্রের করুণ ভঙ্গুরতা।

আইম্যাক্স তার অভিঘাত বা প্রভাবের জন্য মূলত নির্ভর করে বিশেষ দৃষ্টিকোণ-প্রসূত-শট সমূহের উপর এবং এইভাবে তা যে-জগতে আমরা বাস করি তার সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে নাটকীয়ভাবে পাল্টে দেয়, কিন্তু এটা দুঃখদায়ক হলেও সত্য যে, আইম্যাক্সের বিশেষ দৃষ্টিকোণ জনিত প্রভাবের জন্যই ফর্ম্যাটটি চরিত্রদের সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করতে পারে না এবং কথনরীতিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য অ্যাকশনের মধ্যে দর্শককে অন্তর্ভুক্ত করাতেও পারে না। আইম্যাক্স ফিল্ম দর্শকের অবস্থানকে বেঁধে দেয় জোরালো ও কঠোর ভাবে, এবং দর্শককে যে-গতির আস্বাদন দেয় বাস্তবে তার অভিজ্ঞতা অর্জন করা দর্শকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব . রকেটের নাকের ডগায় চেপে বসার, নায়াগ্রা জলপ্রপাতের উপর দিয়ে উড়ে বেড়াবার, শী-র ঢালু পথ বেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ার, মানুষের ফুসফুসের ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দেবার, ইয়োসেমিতে জাতীয় উদ্যানে খাড়াই পাহাড় বেয়ে একটু-একটু করে এগোনোর অনুভব। ফর্ম্যাটটি সাধারণ বাস্তবকে এত অসাধারণ ভাবে প্রকাশ করে যে তার প্রভাব যেন অনুজ্ঞার সঙ্গে শর্তের মিলন ঘটায় : দেখে যাও! অনুভব করো! তুমি যদি সত্যিই ওখানে থাকতে তাহলে এইরকম হত সেই অনুভূতি! ঠিক যেমন আই.এস.সি.-র প্রচারপত্রে বলা হয় 'আইম্যাক্স ফিল্ম দুর্গম উত্তেজনাকর সব জগৎকে আপনার নাগালের ভেতর নিয়ে আসে . . . ওইসব জায়গায় স্বয়ং উপস্থিত থাকতে না পারলে সবচেয়ে ভালো হল আইম্যাক্সের ভিতর দিয়ে উপস্থিত হওয়া।' আইম্যাক্স ফিল্মেব প্রচারচিত্র স্বাভাবিকভাবেই আলোকচিত্রাকারে তার বিশালাকার দৃশ্যরূপ হারিয়ে ফেলে, ফলে বিপণনের ক্ষেত্রে সেই ক্ষতিপূরণের একটা প্রধান উপায় হল প্রচারচিত্রের মধ্যে দর্শককেও মনস্তাত্ত্বিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলা। যার অর্থ দর্শককে শুধু হলে নিয়ে গেলেই চলবে না, সেই সব নেশাখোর দর্শকের মতো তার প্রতিক্রিয়া ও অনুভূতি জাগাতে হবে, যাদের চোখের বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ে আর পেটের ভিতর ভয় গুলিয়ে ওঠে!

আইম্যাক্স কীভাবে আমাদের দেখার ধরনকে, সিনেমা-দেখার অভিজ্ঞতাকে, পর্দার সঙ্গে আমাদের মিথস্ক্রিয়াকে বদলে দিয়েছে? আইম্যাক্সের বিশাল আকারের দরুন অবশ্যই দর্শকের মধ্যে একটা ভিতরে ঢুকে যাবার অনুভব জাগে, ঘটনা যেখানে ঘটছে সেখানে উপস্থিত থাকার অনুভূতি, কিন্তু সক্রিয় মিথস্ক্রিয়া ঘটে খুবই কম। দৃশ্য ও ধ্বনি যেন দর্শককে একেবারে পরিবেষ্টিত করে ফেলে, মৃত প্রজাপতির মতো পিনবদ্ধ। পর্দায় যা ঘটছে তার সঙ্গে একটা আবেগগত বা মননশীল সম্পর্ক তৈরির মতো কালচেতনা বা স্থানচেতনা কোনোটিই দর্শকের থাকে না। দৃশ্যাড়ম্বর দর্শককে বাধ্য করে এমন এক বিশ্বদৃষ্টি নিতে যা বিশেষভাবেই উত্তর আমেরিকান। বহুজাতিক সংস্থাগুলি প্রযোজক বা প্রায়োজক বলে এবং তাদের ছবি তৈরির উদ্দেশ্য ও নীতির

মধ্য দিয়ে আইম্যাক্স ফিল্মগুলি বিজেতার দাম্ভিক দৃষ্টিতে আমাদের দৃষ্টিকে প্রভাবিত করতে চায়। আর তাদের ভয়ঙ্কর অভিঘাত দর্শক হিশেবে আমাদের করে তোলে প্রায় তাদের দাস বা শিকার। আধুনিক মানুষের চোখের ভ্রমণের যে-পিপাসা আইম্যাক্স তার রসকে নিংড়ে একেবারে শেষ করে ফেলে, যাতে শেষ-পর্যন্ত আর কোথাও যাবার ইচ্ছেটাই মানুষের একদিন শেষ হয়ে যায়: আসল জায়গাগুলো আইম্যাক্সের তুলনায় এত ম্যাড়মেড়ে! নিউজউইক পত্রিকা ঠিকই বলেছে, এ হল 'the ultimate trip'.

দর্শকের আজ পর্দায় চোখের ভ্রমণের অনেক-অনেক সুযোগ। ৭০মিমিতে, ভিডিওতে, টিভিতে, এমনকি এইচ.ডি.টিভিতেও, ফিল্ম ন্যারেটিভের বহুল বৈচিত্র্যের সুযোগ। এছাড়াও আছে ভার্চুয়াল ক্যামেরাতে ভার্চুয়াল রিয়ালিটি সৃষ্টির সুযোগ ও সম্ভাবনাও।

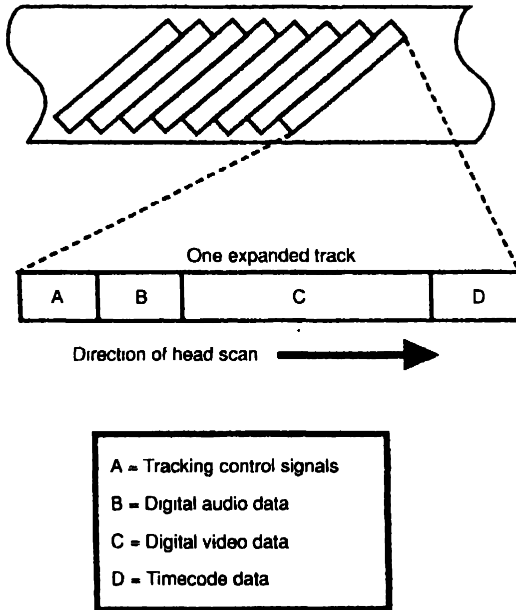


ভার্চুয়াল ক্যামেরা

এইসব মাধ্যমের ব্যবহারকারী বা নানান উত্তেজক ভূমিকার অভিনেতা হিশেবে দর্শক আজ কম্পিউটারের দ্রুতি ও বুদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাল্পনিক জগৎ বা ভার্চুয়াল ওয়র্ল্ড নিজেরাই সৃষ্টি করতে পারেন ও সেই জগতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন। ভবিষ্যতে একদিন হয়তো আইম্যাক্স আমাদের যুক্তি ও ব্যাখ্যার পদ্ধতিতে কী কী পরিবর্তন এনেছে তা নিয়ে একটা প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজন হবে, চার্লস বারের সিনেমাস্কোপ বিষয়ক আদি প্রবন্ধগুলির মতো, যা সিনেমার শিল্পরূপ ও নান্দনিকতাকে এই ফর্ম্যাট কীভাবে বিকশিত করেছে তার সঠিক মূল্যায়ন করবে, দেখাবে নতুন নতুন প্রতিভারা কীভাবে নতুন দৃশ্যরূপ তুলে ধরে আমাদের চিন্তার পদ্ধতিতে নতুনত্ব আনতে চেয়েছেন, নতুন কথনরীতি আধুনিককালের উপযোগী ভাবার্থ ও

ব্যঞ্জনা কীভাবে সংগঠিত করেছে তার আলোচনাও করবে। আবার অন্যদিকে আইম্যাক্সের কলাকৌশলগত বিশেষ সব স্বাতন্ত্র্য এবং নির্মাণ ও প্রয়োজনার বিপুল ব্যয়—এই দুটি কারণে আইম্যাক্স ফিল্মের প্রদর্শন বিজ্ঞানকেন্দ্র, বাণিজ্যমেলা ও মিউজিয়মের মতো কোনো যৌথস্থানেই সম্ভব, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে স্বয়ংসম্পূর্ণ একক হলে আইম্যাক্সের প্রসার আর তেমন সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। ভবিষ্যতে প্রসারিত পর্দার আরও বিচিত্র ব্যবহারের জন্য তাগিদ জাগবে কিনা ও তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান মিলবে কিনা তা অবশ্য এখনই বলা অসম্ভব।

অনুবাদ : নবীন সাহা



ডিজিটাল ভিডিও ট্র্যাকের ফরম্যাট

মুভি ফোটোগ্রাফির বিবর্তন

পূর্ণেন্দু বসু

চলন্ত জিনিষের ছবি তুলে আবার চলন্ত বস্তুকে দেখানো সেটাই ছিল আশ্চর্য। চলন্ত রেলগাড়ী ছুটে আসছে দেখে দর্শক ছুটে পালিয়ে গেছে। কিন্তু আবার ফিরে এসেছে যখন দেখেছে কেউ হতাহত হয়নি। কি অলীক মিথ্যা! প্রথম কয়েক বছর এই চলন্ত ছবির মায়াজালে আবদ্ধ দর্শক মুগ্ধ চোখে সারা দিনের ক্লান্তি দূর করতে "ভদেভিল" (vaudeville)-য়ে উপচে পড়তো। প্রতিদিন-ই নিত্য নতুন গাড়ীর ধাক্কা, পাহাড়ী ঝরনার পাথরের উপর আছড়ে পড়া, সৈন্যদের কুচকাওয়াজ, উড়ন্ত পাখির ঝাঁক —এসব সম্মোহিত হয়ে দেখেছে অনেকদিন। কিন্তু অভিনবত্ব বেশিদিন অভিনব থাকে না। তার উপরে ছিল "ফ্লিকার" (flicker), সমান তালে ছবি তোলা আর সমান তালে প্রদর্শন হাতল ঘুরিয়ে সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে গল্প ছাড়া এই সাদা-কালো কম্পমান ছায়াছবি তাই চোখের পক্ষে ছিল খুবই পীড়াদায়ক। অবশ্য চার্লি চ্যাপলিনের "ফ্লিকার" কিন্তু আজও হাসির উদ্রেক করে।

উনিশ শতকের গোড়ায় তাই দাবি উঠল "ফ্লিকার" মুক্ত "গল্পের" প্রদর্শন চাই। ক্যামেরা আর প্রজেক্টারের উন্নতির সাথে সমানভাবেই গুরুত্ব পেল "গল্প"। চলচ্চিত্রের অন্যতম স্রষ্টা ফ্রান্সের লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় সর্বপ্রথম ক্যামেরাম্যানদের পাঠালেন উত্তেজনামূলক ঘটনার ছবি তুলতে। প্রখ্যাত সংবাদপত্র-ব্যক্তিত্ব উইলিয়াম র‍্যানডফ হার্স্ট, বিলি বিৎজারকে জাহাজ ভাড়া করে কিউবায়, স্প্যানিস আমেরিকান যুদ্ধের ছবি তুলে আনতে পাঠালেন। কিন্তু বিৎজার বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলেন। ক্যামেরা মোটোরাইজড হয়েছে কিন্তু এত ওজন! প্রায় তিনশ পঞ্চাশ পাউন্ড —সঙ্গে ব্যাটারী কয়েক মণ —জাহাজ থেকে মাটিতে নামাতেই পারলেন না। বিৎজার, ডিক্সন, লুবিন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ক্যামেরাকে হাল্কা এবং কর্মোপযোগী করতে উঠে পড়ে লাগলেন। প্রথমত হাতে ঘোরানো ক্যামেরা (Hand Crank)-কে উন্নত করলেন "Governor Control Mechanism"-এর সাহায্যে যাতে অন্তত সমান তালে হাতে ঘুরিয়ে চালানো যাবে। কিন্তু তার জন্যও একটু অভ্যাসের প্রয়োজন ছিল। টাকো মিটার তো ছিল না (Tacho Meter)।

উনিশশো এক সালে প্রথম হাল্কা পঁচিশ পাউন্ড ওজনের ক্যামেরা এল হাতল ঘোরানো। এর প্রস্তুতকারক ছিলেন 'Pioneer Film Producing Co'. ডিক্সন/মারভিন্/বিৎজার-রা সচেষ্ট হলেন মোটর লাগাতে। ক্যামেরার ঘাড় ঘোরানোর জন্য উপকরণ তৈরি হলো, স্ট্যান্ডও এল। মোটামুটি এ-দিয়েই শুরু হলো গল্পের দাবি পূরণের প্রচেষ্টা।

প্রথম ব্যক্তি —ফরাসী দেশের জর্জ মেলিয়ে। —এসব ভূমিকা করলাম ইতিহাস বলার জন্য নয়। ক্যামেরার আধুনিকীকরণ এবং "চিত্রভাষা" কিভাবে এসেছিল সে কথা বলার জন্য।

বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আজ আমরা যে "চিত্রভাষা" (Film Language) তৈরি করেছি তার পিছনে যাদের অবদান/ক্যামেরা এবং আলোর যে 'ট্রিকারী' (Trickery) —তার কথায় আসার জন্য এ এক ভূমিকা মাত্র। মেলিয়ে-র কাছে যা ছিল তা নেহাত ম্যাজিক, আজ কিন্তু তা 'Film Grammar'। এর পিছনে অবদান অনেকের হলেও বিশেষ বিশেষ কয়েকজন যেমন গ্রিফিথ, বিলি বিৎজার, মারভিন, জন ফোর্ড, এরিখ ভন্ স্ট্রোহেম প্রমুখ ব্যক্তির প্রচেষ্টাই মূলত সমৃদ্ধ করেছিল গল্প বলার রীতিনীতিকে। আমি এঁদের-ই তৎকালীন অগ্রগতি এবং কলাকৌশল নিয়ে আলোচনা করবো। আমরা কিন্তু আজ তারই পুনঃপ্রয়োগ করছি অনেক ক্ষেত্রে।

জর্জ মেলিয়ে ছিলেন মঞ্চ প্রযুক্তিতে দক্ষ এবং যাদুকর। তিনি ক্যামেরার হুবহু প্রতিচ্ছবি সৃষ্টির ক্ষমতা দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি গল্প নির্বাচন করলেন শিশুদের বহুপঠিত উইলিয়াম টেল্স্ অথবা সিন্ডারেলাকে ভিত্তি করে। তার সাথে যুক্ত করলেন "Trick" বা "সিনেমার যাদু"। প্রকৃতপক্ষে এসব গল্পে তার যথেষ্ট সুযোগও ছিল। গল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য এবং শটগুলিকে পরপর না জুড়ে মেলিয়ে প্রতিটি শট গ্রহণের পর ফিল্ম ক্যামেরার মধ্যেই কয়েক ফুট পিছিয়ে নিয়ে পরের শট নিতে শুরু করেন এবং এইভাবেই তিনি আবিষ্কার করেন "dissolve" নামক কৌশলটির আদিরূপ। যদিও মেলিয়ে নিতান্ত যাদু দেখাতে চেয়েছিলেন সিনেমার সাহায্যে, কিন্তু নিজের অজান্তেই তিনি চিত্রভাষা তৈরি করে ফেললেন। তাঁর ছবিতে সময়ান্তর এবং স্থানান্তরও চলে এলো একইভাবে। তিনি সেদিন কিন্তু তাঁর ক্যামেরায় 'ফুটেজ কাউন্টার' পাননি, শাটার বন্ধ করার জন্য 'Variable Shutter'ও ছিল না। কিন্তু এ পদ্ধতির ব্যবহার আজও চলছে। মিক্স করতে, বিশেষ করে 'পরিচয় লিপি' (Title) দেখাতে এবং সময় ও স্থানের পরিবর্তন বোঝাতে। তিনি ই প্রথম বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহার করেন এবং 'multiple exposure'ও ব্যবহার করেছেন কোথাও কোথাও। কিভাবে তিনি অনুন্নত ক্যামেরার সাহায্যে এতকিছু উদ্ভাবন করলেন তা ভাবতে আজও অবাক লাগে। এসব কৃতিত্বের জন্যই তাঁকে চলচ্চিত্র শিল্পের স্রষ্টা বলা হয়।

আমেরিকাতে ১৯০৩ সালে তৈরি হলো 'The Great Train Robbery' যা আজও ইতিহাস হয়ে আছে। পরিচালক এডুইন.এস.পোর্টার ছিলেন ইলেকট্রিশিয়ান। তিনি গল্পের কিছু অংশ 'ব্ল্যাকমারিয়া' স্টুডিয়োতে তুললেও বেশি অংশটাই তুলেছিলেন স্টুডিয়োর বাইরে। এ ছবির চিত্রভাষা ছিল আরো সমৃদ্ধ। ছবি ছিল দৃশ্যগুণসম্পন্ন এবং এর সম্পাদনাও ছিল অনেক আধুনিক। মেলিয়ে-র সরল গল্প বলার পদ্ধতি থেকে সরে এসে পোর্টার এই মাধ্যমটির নিজস্বতা মনে রেখেই আরো উন্নত ভাবে গল্প বলতে সক্ষম হন। এ ছবি দর্শকের কাছে এতই প্রিয় হয়েছিল যে হিংসায় Lubin Co.-এর 'frame by frame' হুবহু নকল করেছিল।

ধীরে ধীরে ক্যামেরার প্রাধান্য বাড়তে আরম্ভ করলো এবং ক্যামেরাম্যানরা আরো বেশি সৃজনশীল হতে চেষ্টা করলেন। সেদিন কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্যামেরাম্যান ও পরিচালক একই ব্যক্তি ছিলেন। যেমন মারভিন্, ডিক্সন, বিৎজার, আর্থার এডিসন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এবং এইসব ক্যামেরাম্যান/পরিচালকদের স্লোগান ছিল—"GIVE US A PLACE TO STAND AND WE WILL FILM THE UNIVERSE"।

একদিকে ক্যামেরার উন্নতি করার প্রচেষ্টা চললো অন্যদিকে বিভিন্ন শ্রেণীর দর্শকরা আগ্রহী হলো চলন্ত ছবি দেখবার জন্য। ইতিমধ্যে 'ভদেভিল' থেকে 'নিকেলোডিয়ন' (Nickelodeon)-এ

স্থান পেয়েছে চলচ্চিত্র, প্রদর্শন সংখ্যারও বৃদ্ধি হয়েছে, সুন্দর সুন্দর গল্প এসেছে, সুশ্রী নায়ক নায়িকাদের খোঁজ চলেছে। এই সময় তোলা হচ্ছে ধর্মীয় গল্প, হাস্যকৌতুক, ওয়েস্টার্ন ইত্যাদি।

ক্যামেরার দিক থেকে বলতে গেলে প্রথম কুড়ি বছরে ইউরোপ এবং আমেরিকায় গড়ে পাঁচ থেকে পনেরোটি নতুন ক্যামেরা তৈরি হয়েছে অথবা পুরনো ক্যামেরার আধুনিকীকরণ হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের ক্যামেরা এবং ফিল্ম-এর মাপ (Format / Gauge) এবং প্রযুক্তি বিভিন্ন হওয়ায় এক দেশের ছবি প্রায়-ই অন্যদেশে দেখা সম্ভব ছিল না। এমন কি প্রযুক্তিগত (Film gauge) তারতম্যের জন্য একই দেশের একের ছবি অন্যজন দেখাতে পারতেন না। এই ধরনের বাস্তব অসুবিধার জন্য ক্যামেরা সহ চলচ্চিত্র নির্মাণের যাবতীয় উপকরণের এক সুনির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করা— যা দেশ কাল ভেদে সকলেই মেনে নেবে— জরুরি হয়ে পড়েছিল। একবার এই প্রযুক্তির মান নির্ধারিত হয়ে যাবার পর (standardization), গত ষাট বছর ধরে আধুনিক মুভি ক্যামেরার প্রচুর উন্নতি হয়েছে কিন্তু প্রযুক্তিগত মান বদলায় নি (35mm film gauge International Standard)।

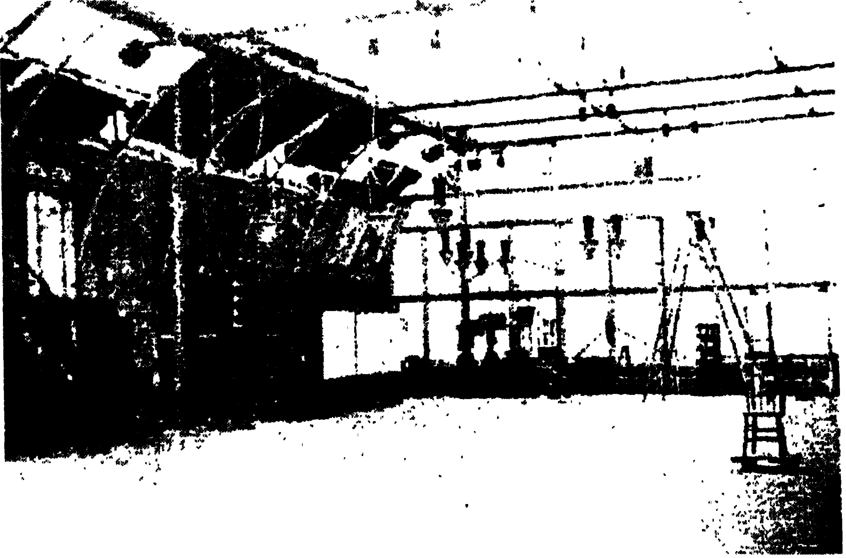
উনিশশো সালের পাথে (Pathé) ক্যামেরাতে "ট্যাকো মিটার" (Tacho Meter) লাগানো চারশো ফুট দৈর্ঘ্যের ফিল্ম রাখার ব্যবস্থা দেখা গেছে। আমেরিকাতে জেনকিন, লুবিন, বায়োগ্রাফ, সেলিগ্, ডিক্সন প্রমুখ নিত্য নতুন ক্যামেরা তৈরি করেছেন। একে অপরের থেকে একটু ভিন্ন মাপের ফিতে ব্যবহার করেন, কেউ বা 'স্প্রকেট হোল' (Sprocket Hole) ব্যবহার করেন না। —এরকম একটু আধটু তফাৎ। ১৯০৮ সালে যখন স্টুডিয়োতে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে তখনই Andrew Schustek সম্পূর্ণ ধাতুর তৈরি চামড়ার খাপে মোড়া "Variable Shutter"যুক্ত ক্যামেরা তৈরি করেন Selig Polyscope Co-র জন্য।

১৯১০ সালে তৈরি হয় 'Chronique Camera' এবং এতে প্র... যুক্ত করা হয় 'reflex view finding system', 'footage counter', এবং 'external diaphragm & focussing control'। এই বছর-ই Debric Parvo variable shutter ও direct view finding ছাড়াও সংযোজন করলেন ওজনে হাল্কা "Mat Box Lens Hood", Debric ক্যামেরার নানারকম মডেল ছিল যেমন— 'L', 'E' ইত্যাদি, তথাপি একের কার্যকরী অংশ (যথা—লেন্স, মোটর, ম্যাগাজিন) অন্যটিতে ব্যবহার করা যেত। পাথে ক্যামেরা Mitchell ক্যামেরার আগে যেমন আমেরিকাতে বহুল-ব্যবহৃত ছিল তেমনি Debric ক্যামেরা কলকাতা তথা ভারতবর্ষে। ১৯৫৮-৬০ সালে আমিও শ্যুটিং-এ এগুলির ব্যবহার দেখেছি। বিশেষ করে Back Projection trick-য়ের ক্ষেত্রে। পরবর্তীকালে অজয় কর মশায় Mitchell ক্যামেরাকে Back Projection-য়ের সঙ্গে sync করলেন। সুব্রত মিত্র এই একই কাজের জন্য Arriflex ক্যামেরাকে ব্যবহার করলেন।

ক্রমে ক্রমে ক্যামেরার আরো উন্নতি হতে লাগলো— হাল্কা ক্যামেরা, Spring Driven Bell & Howell ক্যামেরা, ৩৫ মি.মি., ১৬ মি.মি. ছাড়াও প্রফেশনাল নানা ধরনের ক্যামেরা এছাড়াও এলো Arriflex, Cineflex, Doyflex, Cameflex, Mitchell Reflex ইত্যাদি। আজ তাই ডকুমেন্টারী ধরনের শ্যুটিং করতে ২/৩ জনের একটি দল গঠন করেই অনেক কাজ করা যায়।

এবার স্টুডিয়োর কথায় আসা যাক —ব্ল্যাক মারিয়া ছাড়া বেশির ভাগই ছিল বায়োগ্রাফ অথবা লুবিন কোম্পানীর স্টুডিও, কাঁচের ছাদ, কোন কোন সময় চতুর্দিকে কাঁচের জানলা দেওয়া নাচঘরকে স্টুডিয়োয় রূপান্তর করা হলো। স্টুডিয়োতে শ্যুটিং করার প্রয়োজনও হয়েছিল অনেক ক্ষেত্রে —গল্পের চাহিদার কারণে অথবা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পাবার সময়ের কারণে আবার কখনও কখনও পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার কারণে। প্রথম ২/৩ বছর অবশ্য বৈদ্যুতিক আলোর

ব্যবহার শুরু হয়নি। নানারকম আঁকা থিয়েটার স্টেজ, ক্যানভাস, পর্দা ইত্যাদির সামনে অভিনয় হত। কাঁচের ছাদ থেকে Top light, জানলা থেকে Wash light বা Fill light ব্যবহারের পাশাপাশি আয়না (mirror) বা সিলভার পেপার দিয়ে reflector বানিয়ে বাইরের আলোকে ভেতরে আনার নানান কৌশলকে তাঁরা ব্যবহার করতেন। তেল রঙ, সাদা পশ্চাদ্‌পটে আলোর বিচ্ছুরণ প্রভৃতি নান৷ অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁরা যেসব অভাবনীয় কাজ করে গেছেন তা সত্যিই দৃষ্টান্ত স্বরূপ।



প্রসঙ্গত মনে করা যেতে পারে যে একটা সময় ছিল যখন সূর্যই ছিল আলোর প্রধান— এবং অনেক সময়-ই —একমাত্র উৎস। সুতরাং সমস্ত সেট্‌গুলোই তৈরি করা হতো revolving মুক্ত আকাশের নীচে এই প্রাকৃতিক আলো ব্যবহারের পুরো সুযোগ নিতে। বড় বড় স্তম্ভ তৈরি করা হতো মঞ্চের চারকোণে, যার উপর টাঙানো থাকতো তারের জাল। আর এর উপর বিছানো হতো মসলিন কাপড় যা আলো নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতো 'diffuser' হিসাবে। মঞ্চের পাশগুলো সাদা মসলিনে মোড়া কাঠের ফ্রেম দিয়ে ঘেরা যার ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি নিয়ন্ত্রিত হয়ে কোমল আলোর সৃষ্টি করতো। কখনও কখনও বড় বড় আয়নাকে ব্যবহার করা হয়েছে ভিতরে আলো প্রতিফলিত করে highlight তৈরি করার জন্য কিংবা সেটের উপর এক ধরনের 'effect lighting' তৈরি করার প্রয়োজনে। এই ধরনের স্টুডিয়ো কিন্তু আমাদের দেশেও ছিল। একটা সময় পাকা স্টুডিয়ো-র উত্তর দিকের দেওয়াল অনেকটাই খোলা রাখা হত 'soft light' পাবার জন্য। অনেকে আবার মসলিনের সঙ্গে সঙ্গেই জাল এবং গজ ব্যবহার করতেন। তবে মূলত ছবি তোলা হত বাইরে, সুন্দর পরিবেশে। এবং ১৯০৮সাল পর্যন্ত দশ-কুড়ি মিনিট দৈর্ঘ্যের ছবিগুলো ছিল orthochrome film-এ তোলা। এই ফিল্ম লাল রংকে ঠিকভাবে দেখাতে পারতো না এবং লালকে দেখাতো কালো। এজন্য লাল লিপস্টিক কালো হয়ে যেত। ব্লণ্ড চুল মিশে যেত কালো পশ্চাদপটের সঙ্গে।

এ প্রসঙ্গে বলা যায়—"....with this beginning, it is small wonder that when the first dramatic films arrived, and after stories began to demand more scenes than could be made actually out-of-doors. At first it was large as Photographic skill grew, there were added techniques to soften light and modulation on face lighting by creative cameramen."

Vitagraph স্টুডিয়ো আসলে ছিল নিউ ইয়র্কের একটি অফিস বাড়ির ছাদ। যেখানে রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনের বেলায় যতক্ষণ সূর্য ডুবে না যায় তারই মধ্যে তাড়াতাড়ি করে 'আঁকা-দৃশ্য' (Canvas Scenery) বসিয়ে শ্যুটিং করে নেওয়া হত। ক্রমশ চলচ্চিত্রের নিজের বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবর্তিত হতে শুরু করার কিছু সময়ের মধ্যেই এক শ্রেণীর মানুষের স্থায়ী ব্যবসা হিসাবে গুরুত্ব পেতে শুরু করে। তখন কৌশলের পাশাপাশি উন্নত উপকরণ ব্যবহার বৃহত্তর ভাবে আরম্ভ হয়—স্টীল ফ্রেমের কাঠের মঞ্চ যা বড় বাড়ি হিসাবে দেখানো শুরু হলো। ক্রমশ চলচ্চিত্র কোম্পানীগুলো অনুকূল পরিবেশ না থাকলেও শ্যুটিং চালিয়ে যাবার মতো যথেষ্ট উপকরণে সমৃদ্ধ হতে থাকে যেমন—ডিফিউজার ব্যবহার করে জোরালো আলোকের বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে আলো-ছায়ার নানা কৌশল আলোকচিত্রীগণ কার্যকরী করেন (হলিউডের photography বিশেষ করে "নীরব" যুগে প্রাকৃতিক আলোর সাহায্যে যে সকল কাজ হয়েছে তার গুণমান ছিল অসাধারণ। অবশ্য সকলের ক্ষেত্রে একথা বলা না গেলেও John Ford/Griffith/Charlie/De Milleদের কাজ সম্পর্কে নিশ্চয় এ-কথা বলা চলে)।

কিন্তু এ ব্যবস্থাতেও কিছু অসুবিধা দেখা দিল। দিনের আলো তো চিরস্থায়ী নয়। সূর্যের অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আলোর ধারাবাহিকতা থাকে না। স্বাভাবিক আলোর তীব্রতা সর্বদাই পরিবর্তনশীল হওয়ার দরুন দৃশ্য গ্রহণের কাজে এক ধরনের সীমাবদ্ধতা ছিল। কখনই খুব সাবলীল ভাবে ছবি তোলা সম্ভব ছিল না আলোর অসম বণ্টনের কারণে। ফলে দৃশ্যে গল্পের নাটকীয়তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার খাতিরে আলোক নিয়ন্ত্রণের জন্য কৃত্রিম আলো ব্যবহারের প্রয়োজন হলো। তাতে আলোর সমতা (Balance) এলো।

এই সময় গুণী কৃতী আলোকচিত্রীগণ বুঝতে পারছিলেন যে যদি তাঁরা চরিত্রগুলির মুখে ছাদের উপর দিয়ে আসা সূর্যের আলোর সঙ্গে সামনের দিক থেকে কৃত্রিম আলো ফেলতে পারেন তাহলে চরিত্রগুলি অনেক বেশি স্পষ্ট এবং সুন্দর হয়।

সম্ভবত এক মেঘলা দিনে তাঁরা অনুভব করলেন যে সূর্যের আলোর উপর আর নির্ভর করা চলে না। সোজাসুজি বৈদ্যুতিক আলো দিয়েই 45^0 থেকে 'keylight' এবং ক্যামেরার পাশ থেকে 'filllight' করলে কাজ সহজ হয় এবং ইচ্ছামত রং বিবেচনা করে লাইটিং-এর উন্নতি করা যায়।

সেদিন থেকে কৃত্রিম আলো দিয়ে দিনের আলো তৈরি কর্মপদ্ধতি শুরু হলো। ঢাকা হয়ে গেল কাঁচের ছাদ, কাঁচের দেওয়াল দেওয়া স্টুডিয়োগুলো' সৃজনশীল আলোকচিত্রীগণ অত্যন্ত সাবধানে মাপ-জোক করে আবিষ্কার করে ফেললেন কিভাবে কৃত্রিম আলো দিয়ে শ্যুটিং করা যায় এবং নানা effect তৈরি করা যায়।

অধিকাংশ আলোকচিত্রী নেহাৎ ছবি তোলার জন্যই ছবি তুলতেন। যাকে এখন বিদ্রূপ করে বলা হয় "ছেপে দাও।" অর্থাৎ এঁরা ছিলেন Functional ক্যামেরাম্যান। অবশ্য কারণও ছিল। তা হলো ফিল্ম-এর মান এবং উপযুক্ত আলোর অভাব। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রদর্শকদের চাহিদা। তাঁরা সর্বদাই চাইতেন চরিত্র সেটের যেখানেই থাকুক না কেন উজ্জ্বলতার পরিবর্তন যেন না হয়। অর্থাৎ একই উজ্জ্বলতা সর্বত্র ধরে রাখার দাবি প্রবল হয়ে উঠল। কৃত্রিম আলো

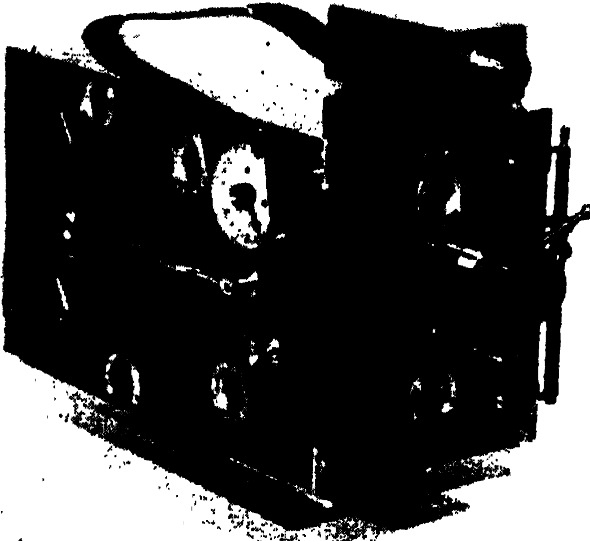
আসলে ব্যবহার করা হচ্ছিলো সমানুপাতিক হারে, কোনরকম তারতম্য ছাড়াই। সেইসঙ্গে এটাও স্থির হয়ে গেল যথাযথ এক্সপোজার পাবার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ আলো দিয়ে সেট্‌কে আলোকিত করতে হবে। এটা করা হচ্ছিলো বেশ মোটা দাগে, কোন রকম ভাবনা-চিন্তা ছাড়া, অনুভূতির কথা না ভেবেই। মোটের উপর লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র গতিময় ছবি রেকর্ড করা এবং পর্দায় পরিষ্কারভাবে দেখানো। বাস্তবতা বা স্বাভাবিকত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে অনেকেই রাজী হচ্ছিল না। আলোগুলো ছিল অনেকটা শহরের রাস্তার আলোর মতো। এদের নাম ছিল "কুপার হিউইট" (Cooper Hewit) মার্কারী ভেপার টিউব। আলোগুলো সাধারণত লাগানো হত দুপাশে দশটা করে এবং পাকাপাকি ভাবে উপর থেকে দশটা আলো ঝুলিয়ে রাখা থাকতো। আর্ক (Arc) লাইটগুলো গ্র্যাণ্ড পিয়ানোর মত বড় এবং প্রচণ্ড ভারী বলে নাড়ানো প্রায় অসম্ভব ছিল। সেট্‌গুলো সরাসরি এই আলোগুলোর নীচে বানানো হত এবং এতে ক্যামেরাম্যানের কোন বক্তব্য থাকতো না। শিল্পীদেরও নড়াচড়ার স্বাধীনতা এ ধরনের সেটে খুব একটা ছিল না। সেটের মেঝেতে পেরেক পুঁতে তার লাগিয়ে নির্দেশিকা তৈরি করা হত আর তার মধ্যেই শিল্পীরা ঘোরা ফেরা করতেন। এ অবস্থায় চলচ্চিত্রের ভাষার খুব একটা উন্নতি সম্ভব ছিল না। কিন্তু এ সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মারভিন্ বা বিৎজারের মতো সৃজনশীল আলোকচিত্রীরা অসাধারণ কাজ করেছেন। আমাদের দেশেও শ্রদ্ধেয় ডঃ বিদ্যাপতি ঘোষ, বিমল রায়, নীতিন বসু, অজয় কর বা সুব্রত মিত্র অনেক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও অসাধারণ চিত্রভাষার সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যথোপযুক্ত স্বীকৃতি পাননি। মুভি ক্যামেরার প্রকৃত স্রষ্টা যে ডিক্‌সন, আজ তা সকলে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু একশ বছর আগে নানা জনের মিথ্যার স্বীকার হয়ে তিনি জীবনের একটা বড় অংশ স্বেচ্ছা নির্বাসনে কাটিয়েছেন। ঠিক তেমনি বিৎজারও তাঁর সৃষ্টির উপযুক্ত স্বীকৃতি পাননি। যাইহোক, ফ্ল্যাট লাইট যেমন কোন ভাষা নয়, একটি চরিত্রের একাধিক ছায়া নিয়ে চলাফেরাও তেমনি গ্রহণযোগ্য নয়। ছায়াহীন "ডিফিউসড্" (diffused) আলো অনেক ক্ষেত্রেই খুব বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি করে, যে আলোর সাথে আমরা চলাফেরা করি। ঘরের মধ্যে দিনের বেলা কি কোন ছায়া পড়ে? হলিউডের একটা প্রচলিত অভ্যাস আছে যেমন রঙিন ছবির আকাশ নীল হতেই হবে। বহির্দৃশ্যে নায়িকার মুখ ছায়ায় নেয়া যাবে না। এ অবস্থা এখানেও দ্বারকা দেভাচাকে অনুসরণ করতে দেখলাম "প্রফেসর" ছবিতে ১৯৬১ সালে দার্জিলিং-এ। আমরা তখন "কাঞ্চনজংঘা" তুলছি।

কৃত্রিম আলোর ব্যবহার ১৯০২ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাণ্ডজ্ঞান বিহীনভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। বিৎজার এবং মারভিন একসঙ্গে "Pipa Passes" নামের একটি ছবি করেন। এই ছবিটি আলোর প্রয়োগরীতির জন্য বিশেষ মর্যাদা পেয়েছিল এবং এটাই ছিল নিউ ইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকায় সমালোচিত প্রথম চলচ্চিত্র। ১৯০৯ সালে তোলা এই ছবিতে আলোর বিশেষ উদ্ভাবনী প্রয়োগের সাহায্যে প্রভাত থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত দিনের পরিবর্তন দেখানো হয়। একাজে সমস্ত ধরনের প্রযুক্তিগত প্রকরণকেই ব্যবহার করা হয়েছিল। ভোরের পরিবেশকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা ছিল সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। এর জন্য সেটের একেবারে পিছনের দেওয়াল কেটে ৩ ফুট × ১ ফুট চতুষ্কোণ তৈরি করা হয় এবং সেটিকে ঢাকা দেওয়া হয় একটা স্লাইডিং প্যানেল দিয়ে। এর রং আর সেটের রং রাখা হয় একই। ঐ কাটা অংশটির পিছন থেকে একটা জোরালো আর্ক ল্যাম্প জ্বালিয়ে যখন প্যানেলটি নিচু করা হত তখন মনে হত যেন উদীয়মান সূর্যের প্রথম আলো সেটের উপর এসে পড়ছে। জানলার পাশে লাগানো অন্যান্য বাতি থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে সকালের কোমল আলোর মত

দেখাতো। দুপুর বেলায় সূর্য যখন মধ্য গগনে তখন স্টুডিয়োর সমস্ত আলো একসঙ্গে জ্বালিয়ে দেওয়া হত আর দেওয়ালের প্যানেল বন্ধ করে দিয়ে সম্পূর্ণ দেওয়াল দেখানো হত।

"পিপা পাসেস" ছবিটি আলোর প্রয়োগের দিক থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির চিহ্ন সূচিত করে। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে সুব্রত মিত্র তাঁর "নিউদিল্লী টাইমস্" ছবিতে প্রায় একইভাবে রাত থেকে সকালের একটি দৃশ্য রচনা করেছিলেন। তবে এক্ষেত্রে তাঁর সমস্যা একটু কঠিন ছিল কারণ ছবিটি ছিল রঙিন। বিৎজার সবসময়ই আলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন। অনেক সময়ই কোন কোন effect আবিষ্কৃত হয়েছে নিছক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে। কিন্তু সেইসব কৌশল চলচ্চিত্র-র ভাষাকেই উন্নত করেছে। ১৯০৯ সালে "Drunkard's Reformation" ছবিতে তিনি ফায়ার প্লেসের ভিতরে আর্ক লাইট বসিয়ে এবং কিছু কুপার হিউইট টিউব ব্যবহার করে চমৎকার সাফল্য লাভ করেন। ফায়ার প্লেসের effect এতই প্রশংসিত হয়েছিল যে বিৎজার এই কৌশলটির প্রয়োগরীতি পরবর্তী ছবিতে আরো উন্নত করেন। "The Cricket On The Heart" ছবিতে নায়ক মোমবাতির আলো নিভিয়ে ফায়ার প্লেসের সামনে এসে বসে। এক্ষেত্রে বিৎজার মূল source light-কে খুবই কমিয়ে ফায়ার প্লেসের আলোকে source light করেন। এ ধরনের আলোর effect আমাদের দেশেও ১৯৫০ সালের পরে হয়েছে। আগেও অবশ্য কেউ কেউ এ ধরনের কাজ করেছেন তবে সকলে সবসময় সাহসের সঙ্গে এগিয়ে আসতে পারেননি। এ ধরনেব এফেক্টের জন্য "ডিমার" (dimmer) ব্যবহার করা হত। সেই পুরনো 'ডিমার'গুলোকে আমি দেখেছি। এক ধরনের 'soil pipe'-য়ের এক দিকটা সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করে তাতে নুনজল রাখা হত। তলায় একটি লোহার পাতে সুইচের দুটি তারের একটিকে আটকে রাখা হত, অন্যটির মাথায় লোহার একটি ওজন আটকে দিয়ে ক্যামেরাম্যানের নির্দেশ অনুযায়ী সেটিকে নুনজলের মধ্য দিয়ে অন্য তারটির কাছাকাছি আনা হত অথবা সরিয়ে নেওয়া হত, এভাবেই ডিমার ব্যবহার করা হত। গত যুদ্ধের শেষে আমি কলকাতায় এই পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করেছিলাম। যুদ্ধের শেষে অনেক সাজ সরঞ্জাম ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ির পেছনে বিক্রি হত। তার মধ্যে ছিল নানা ধরনের মেকানিকাল এবং ইলেক্ট্রিকাল ডিমার। যেমন—প্লেট ডিমার এবং ব্যারেল ডিমার। প্লেট ডিমার অধিকাংশই তাপস সেন কিনে নিয়েছিলেন। তাঁর নাটকে আলোর কাজে এগুলো খুবই কাজে লাগতো। আমিও দু-একটি পেয়েছিলাম যা আজও আমার কাছে আছে। এছাড়াও আমি কিনেছিলাম অনেকগুলো ব্যারেল ডিমার যা এখনও খুঁজলে ইণ্ডাস্ট্রির কারুর না কারুর কাছে পাওয়া যাবে। তবে আধুনিক ডিমার আকারে ছোট এবং অনেক সহজ। সে সময়ের কেনা ডিমারের ব্যবহার অনেক ছবিতেই হয়েছে। যেমন "পরশপাথর" ছবির পার্টির দৃশ্যে। আবার লণ্ঠন জ্বালানো হচ্ছে বা নিভে যাচ্ছে, কোন দৃশ্য ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে উঠছে—এসব এফেক্টের জন্যও ডিমারের ব্যবহার হয়েছে। আবার প্রথম দিকে আমরা বজ্র বিদ্যুতের এফেক্ট তৈরি করেছি ডিমার ঘন ঘন in / out করে। পরে অবশ্য 'Kit-Cut' ব্যবহৃত হয়েছে। তারও পরে ব্যবহৃত হয়েছে ওয়েল্ডিং মেশিন আয়নার সামনে স্পার্ক করে। যখন এসব নিয়ে পড়াশুনো করতে শুরু করেছি তখন বুঝেছি যে আমরা বিশেষ কিছু নতুন করছি না। আমাদের পূর্বসূরিরা এর আগে এসব করেছেন। তফাৎ শুধু এই যে আমরা একই কাজ একটু মার্জিত ভাবে করেছি মাত্র।

১৯০৭ সালে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে—ফিল্ম, ক্যামেরা এবং প্রজেক্টার মেশিন এক আন্তর্জাতিক চুক্তির ফলে standardised বা সমমান সম্পন্ন করা হবে নির্ধারিত হয়। চুক্তি



অনুযায়ী ঠিক হয় যে ফিল্ম ৩৫ মিলি. মিটার চওড়া হবে এবং চারটে করে "স্প্রকেট হোল্" (Sprocket Hole) থাকবে। একই ভাবে অন্যান্য খুঁটি-নাটি বিষয়েও মান নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। এই চুক্তির ফলে এক দেশের ছবি অন্য দেশে আসতে আরম্ভ করলো এবং এক প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবও গড়ে উঠলো নির্মাতা ও প্রদর্শকদের মধ্যে। কিন্তু তখনও থিয়েটারের দর্শক সিনেমাকে খুব একটা সম্মানের চোখে দেখতেন না, এবং সিনেমায় অভিনয় করার ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না। এ সময়কার তোলা ছবিতে শিল্পীদের নাম পরিচয় লিপিতে থাকতো না। প্রথম দিকে শিল্পীরা তো চাইতেন-ই না, কলাকুশলীরা চাইলেও পেতেন না। সে সময়ে শিল্পীদের পরিচয় দেওয়া হত কোম্পানীর নামে—"বায়োগ্রাফ বয়েজ" বা "ভিটোগ্রাফ গার্লস"। এই নামে অনেক প্রেমপত্রও আসতো। শিল্পীদের জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের যথাযথ স্বীকৃতির দাবিও জোরালো হয়ে উঠলো। কিন্তু প্রযোজকরা অনেক দিন এ দাবি মেনে নেননি বাণিজ্যিক কারণে।

সে সময় মাত্র পাঁচ সেন্টের বিনিময়ে একজন দর্শক ঘণ্টাখানেকের বিনোদন উপভোগ করতে পারতেন। এর মধ্যে থাকতো স্ল্যাপস্টিক কমেডি, চেজ, কাউবয়দের ঘোড়ায় চড়া এবং গুলি ছোঁড়ার মত চাঞ্চল্যকর দৃশ্য এবং অসহায় মেয়েদের বিপদ থেকে উদ্ধার—এরকম খণ্ড খণ্ড ছবি। ১৯০৭ সালের মধ্যেই হাজার হাজার নিকেলোডিয়ন তৈরি হয়ে গেছে আমেরিকাতে। আর এইসব ছোট ছোট প্রেক্ষাগৃহের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল গরীব এবং অশিক্ষিত মানুষ। এ সময়কার ছবিতে চড়া মেক-আপ, মোটা দাগের অভিনয়, অতি নাটকীয় গল্প, এসব কিছুর মাঝে বাস্তবানুগ আলোর দাবি মানানসই ছিল না। তবু ১৯০৯ সালের মধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছিল চলচ্চিত্র নির্মাণ পদ্ধতিতে :

(ক) "ব্যাক লাইট" (Back light) আবিষ্কৃত হলো;

(খ) একই দৃশ্যের মধ্যে ক্যামেরার অবস্থান পরিবর্তন শুরু হলো;

(গ) রেমব্রাঁ লাইটিং শুরু হলো;

(ঘ) মাস্ক এবং ফিলটারের প্রচলন হলো;

(ঙ) স্টার সিস্টেম শুরু হলো ১৯১০ সাল নাগাদ।

১৯০৯ সাল নাগাদ বিৎজার শ্যুটিং চলাকালীন তাঁর এক অভিজ্ঞতার কথা এইভাবে বর্ণনা করেছেন—"একদিন লোকেসান শ্যুটিং-এর ফাঁকে আমরা লাঞ্চ করছিলাম। সামনে উঠোনের মতো একটা জায়গা। একই অক্ষের মধ্যে আমি, আমার সামনে ট্রাইপডের উপর ক্যামেরা এবং তার সামনে বিখ্যাত নায়িকা মেরী পিকফোর্ড ও নায়ক ওয়েন ম্যুর। তাদের পিছনে একটা দরজা। একটু পড়ন্ত বেলা। কোন্ ফাঁকে সূর্যও একই অক্ষের উপর শিল্পীদের পিছনে এসে গেছে। আমার দেখতে অপূর্ব লাগছিল। তাই কিছু ফিল্ম এক্সপোজ করলাম। পিছন থেকে নায়ক নায়িকাদের মাথায় এসে পড়া সূর্যের আলো অসাধারণ এফেক্ট তৈরি করেছিল। বিশেষত মেরী পিকফোর্ডের কোঁকড়ানো সোনালী চুলের উপর এই আলো অসাধারণ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেছিল। আমাদের মতো পরিচালক গ্রিফিথও মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমরা অনুধাবন করলাম চলচ্চিত্রে আলোর প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক চমৎকার এফেক্ট উদ্ভাবন করা গেছে।"

প্রায় একই সময়ে বিৎজার সরাসরি সূর্যের দিকে ক্যামেরা রেখে, সূর্যের আলো সরাসরি লেন্সে প্রতিফলিত হতে দিয়ে চমৎকার এফেক্ট সৃষ্টি করেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ১৯৬০ সালে সত্যজিৎ রায় তাঁর রবীন্দ্রনাথ তথ্যচিত্রে 'সেদিন প্রভাতে রবির কর' কবিতার ক্ষেত্রে একই ধরনের শট ব্যবহার করেছেন। পরবর্তীকালেও তিনি এই ধরনের এফেক্ট ব্যবহার করেছেন। 'গুপীগাইন' ছবিতেও এ ধরনের শট আছে। ঋত্বিক ঘটকও তাঁর 'কোমল গান্ধার' ছবিতে এ ধরনের শট ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ব্যাকলাইট ব্যবহারের সমস্যাও ছিল। এ ধরনের আলো এমন মায়াজাল সৃষ্টি করে যে নায়ক নায়িকারা এর ব্যাপক ব্যবহার দাবি করতে শুরু করে। বিৎজার নিজেই বলেছেন যে লিলিয়ান গিস্ সবসময়ই নিজেকে পর্দায় সুন্দর দেখাতে চাইতেন এবং তাঁরাও বাধ্য হতেন ব্যাক লাইট ব্যবহার করে তাঁর সেই নিষ্পাপ সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে। এইভাবে নায়ক নায়িকাদের চাপের কাছে ক্যামেরাম্যানদের নতি স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু সে যুগের ক্যামেরাম্যানদের কাছে ব্যাক লাইট ছিল এক হাতিয়ার। অর্থক্রোম ফিল্মেব জন্যে যখন শিল্পীর মাথা কিংবা পোষাক পশ্চাদপটের সঙ্গে মিশে যেত তখন ব্যাক লাইট ব্যবহার করে বিভাজন করা যেত। কিন্তু বিৎজারের মত ক্যামেরাম্যানও ব্যাক লাইটের অপব্যবহারে বিরক্ত হয়ে এর ব্যবহারকে সীমিত করেন। বিৎজারের লেখায় আরো উল্লেখ আছে। "...আরো একটি ঘটনার কথা বলি—ওভার এক্সপোজার এবং প্রিন্টিং ডাউন করে যে কি অসাধারণ 'সফট্ এফেক্ট' (soft effect) হয় তা একটি ভুল করে তবেই জানতে পারলাম। ...ঘটনার আগের দিন রাত্রে মদ্যপান দু-পাত্র বেশি হয়ে গেছিল। ফলে পরদিন স্টুডিয়ো আসতে দেরি। ঢুকেই দেখলাম গ্রিফিথ মহাশয় পদচারণা করছেন। আমি ঢুকেই বললাম "lights on", ফোকাসটা ঠিক করেই শট নিতে শুরু করলাম। সিন-এর মাঝখানে মনে পড়ল মস্ত ভুল হয়ে গেছে। "অ্যাপারচার" (Aperture)টা খুলেছিলাম ফোকাস দেখার জন্য কিন্তু তা আর ঠিক করা হয়নি। সিনের মাঝে আর ঠিকও করলাম না। সিন শেষ হওয়া মাত্র আমি ল্যাব-এ গেলাম। "ডেভোলাপ" (develop) হল, প্রিন্ট বেরোলো সন্ধ্যায়—আমি একাই দর্শক। দেখে মুগ্ধ হলাম। "হাই কী" (High Key) আলোক-চিত্রের কারণে তারকাদের অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল। গ্রিফিথ লক্ষ করলেন পরদিন। Strong key light এবং "ওভার এক্সপোজার" মিলে নায়িকা মিস্ গিস্য়ের প্রতিচ্ছবি এক অসাধারণ গুণগত মান লাভ করলো। গ্রিফিথ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন এত মাখনের মতো নরমসুন্দর এফেক্ট কি করে হলো। বললাম—একমাস ধরে এই এফেক্টটার কথা ভাবছিলাম আজ প্রয়োগ করলাম।" এভাবেই জন্ম নিল হলিউডের সফট্ লাইটিং-এর যুগ—বিখ্যাত "হলিউড রোম্যান্টিক

ক্লোজ আপস্" (Hollywood Romantic Close-ups)। অ্যাড ফিল্ম-এর জগতে এরই দৃঢ় পদচারণা এখনও দেখতে পাই। ১৯৬০ সাল নাগাদ এ দেশে নায়িকাদের কাছে এই আলো ছিল বিশেষ জনপ্রিয়। তাদের প্রিয় হবার জন্য এখানকার ক্যামেরাম্যানরা এর ব্যবহার করেছেন যথেষ্ট। আর আর. বি. মেহেতো ল্যাব ইনচার্জ এইসব ক্যামেরাম্যানদের সন্তুষ্ট করার জন্য বলতেন—"আপনার নেগেটিভ তো একেবারে 'মাক্ষন' কী তরাহ্"। অবশ্য অনেক অন্যান্য পদ্ধতি অবলম্বন করেও এই এফেক্ট তৈরি করা গেছে।

বলা যেতে পারে বিৎজার এবং গ্রিফিথ ছিলেন হলিউডের তৎকালীন সর্বাপেক্ষা সৃজনশীল জুটি। সময়টা ধরুন ১৯০৮ থেকে ১৯১৫। এইসময়-ই তৈরি হয়েছিল মোশন পিক্চারের গ্রামার। এঁরা দুজনেই খুব তাড়াতাড়ি নতুন যন্ত্রমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের জীবনে উন্নতির পথকে প্রশস্ত করেন। অবশ্য শুধু তা কেন এমন সোনায় সোহাগা জুটি এদেশেও আছে যাঁরা অসামান্য সমস্ত পরিবর্তন সাধন করেছিলেন এই চলচ্ছবির দুনিয়ায়।

গ্রিফিথের দক্ষতা প্রসঙ্গে ১৯০৮ সালের একটি বিষয় উল্লেখ করা বোধহয় উচিত। প্রথম ছবি "Adventure of Dolly"-র মধ্যে গ্রিফিথ নিয়ে এলেন "প্যারালাল কাটিং" (Parallel cutting)। যা এমন এক কৌশল যা কখনই মঞ্চে সম্ভব নয়। এ এক অভিনব সৃষ্টি। থিয়েটারের মতো সমস্ত শট একসাথে না নিয়ে টুকরো টুকরো করে গল্পকে ধারাবাহিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম এই জাতীয় সম্পাদনা। ফলে চলচ্চিত্রে গল্পের ফ্লো আরো বেশি মসৃণ হলো। এই ছবিতে মারভিন এবং বিৎজার উভয়েরই অবদান ছিল।

যতদিন পর্যন্ত গ্রিফিথের "For Love of God" ছবিটি (১৯০৮ সালের আগস্ট মাসে নির্মিত) হয়নি ততদিন পর্যন্ত এটাই নিয়ম ছিল যে সম্পূর্ণ দৃশ্য একটি মাত্র শটে তোলা হবে। এমন একটি কোণে ক্যামেরা ব্যবহৃত হতো যা নড়ত না, গ্রিফিথ অবশ্য তাঁর "In The Lonely Villa" (১৯০৯) ছবিটি সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে তোলেন। তিনি ক্যামেরাকে চরিত্রগুলোর কাছাকাছি, দূরে নানা অবস্থানে বসিয়ে শ্যুটিং শুরু করলেন। প্রদর্শক/পরিবেশক/প্রযোজক সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ আরম্ভ করলো। গ্রিফিথ একটুকুও বিচলিত হলেন না। তিনি অনড়।

১৯১০ সালের মধ্যেই গ্রিফিথ চরিত্রদের আরো কাছাকাছি থেকে শ্যুটিং-এর কৌশল-ই শুধু রপ্ত করলেন তাই-ই নয়, সেটের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দিয়ে এক এক করে শট নিতে শুরু করলেন। বড় ক্লোজ আপ নেওয়া হত। বিভিন্ন কোণে ক্যামেরা বসিয়ে এইসব শটগুলি নিতেন। এর সঙ্গে ছিল বিৎজারের আলো নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা যা ইতিমধ্যেই আমার লেখায় আলোচিত হয়েছে। ১৯১০-১২ সাল থেকেই চলচ্চিত্রের ভাষা এবং আলোকচিত্র-শিল্পীদের গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরো বিস্তার লাভ করতে শুরু করলো।

১৯১২ সালে স্টুডিয়ো থেকে কম তীব্রতার আলোগুলোকে সরিয়ে ফেলে সাদা শিখা যুক্ত কার্বন আলো (white flame carbon) ব্যবহার শুরু হলো। আলোকচিত্রীগণের কাছে এগুলি দ্বারা কাজ করা সম্ভবত সহজ হলো, কারণ এতে 'ছোট অ্যাপারচার' (small aperture) এবং 'বড় গভীরতা' (greater depth) নিয়ে কাজ করা যায়। যাতে এক নাটকীয় পারিপার্শ্বিকতা তৈরি হয়। এই ধরনের আলোর ব্যবহার তাঁরা মঞ্চ থেকেই অনুকরণ করেন। এর ফলে দৃশ্যের মধ্যে ঘোরাফেরা করা ছায়াছবির মান হলো উন্নত। পূর্বে এক ধরনের ফ্লাড আলো আসতো স্থিরচিত্র এবং গ্রাফিক আর্ট শিল্প থেকে পরে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে কার্বন আলো মঞ্চ থেকে। এমনকি তারা সেনাবাহিনীতে ব্যবহৃত স্পট সার্চ লাইটও আনতেন উন্নত ও সৃজনশীল এফেক্ট তৈরি করতে। এখানে উল্লেখ্য হলিউডে কিছু কিছু Cameraman কিন্তু প্রাচীন চিত্রকরদের ছবির

আলোর ব্যবহারের নকল করতে চেষ্টা করতেন। এবং সেটা তারা বলতেনও। আমরা কিন্তু এই reference বা দৃষ্টান্ত তখনকার সময়ে ব্যবহার করিনি। নিছক নকল করেছি মাত্র তাঁদের কাজ। এদিকে আমরা ১৯৬০-এর দশকের "অভিযান" ছবিতে উড়োজাহাজের ল্যাণ্ডিং আলো ব্যবহার করি। ২৪ ভোল্টের এই স্পট লাইট দিয়ে যত পরিচয় লিপির শট এবং আবার এই লাইটকেই বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে রাতের দৃশ্যে "মধ্যবর্তী ও নিকটবর্তী শট" (Med and Close shot) নিয়েছি। অবশ্য এটা আমরা করেছিলাম আমাদের পূর্বসূরিদের কথা না জেনেই। আসলে যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে প্রয়োজনে মানুষ নিজেই হাতিয়ার খুঁজে নেয়। ক্রমে এলো 'Incandescent revolution'—দু হাজার ওয়াট থেকে ত্রিশ হাজার ওয়াট পর্যন্ত। কারণ অবশ্য সাদা কালো ছবি নয়, আসলে তখন রঙিন ছবি উঁকি ঝুঁকি মারছে ইণ্ডাস্ট্রিতে। কিন্তু গতি কম থাকায় তা বিশেষ লাভ দিল না। তবে ইণ্ডাস্ট্রি যাতে লাভবান হলো তা প্যানক্রোম্যাটিক ছবির (Panchromatic film) জন্য।

১৯১৩ সালটি হলিউডের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কারণ এই বছরই ম্যাক সেনেট চার্লি চ্যাপলিন নামে এক বালককে নিয়ে এলেন। এইসময় "নিকেলোডিয়ন" থেকে রোজকার থিয়েটার তৈরি আরম্ভ হয়েছে। সব ধরনের দর্শক-ই চিত্তবিনোদনের জন্য ফিল্ম দেখতে আসছে। আমাদের দেশেও তখন হরিশ্চন্দ্র হয়ে গেছে। নানারকম ধর্মীয় ছবি, সামাজিক হাসির গল্প আরম্ভ হয়েছে। বিদেশেও চলছে ধর্মীয় ছবি/ওয়েস্টার্ন ছবি/সামাজিক প্রেমের গল্প। দমবন্ধ করা হাসির গল্পরও ব্যাপক চাহিদা। চার্লিকে সেনেট মশায় নিয়ে এলেন নিউইয়র্ক থেকে। সেখানে চার্লি একটা ইংরিজি মিউজিক্যাল কোম্পানীতে চাকরি করতেন। মাইনে সপ্তাহে পঁচাত্তর ডলার। সেনেট মশায় তাঁকে সপ্তাহে একশ পঁচিশ ডলারের প্রস্তাব দিয়ে নিয়ে আসেন তাঁর "Keystone Comedies Company"-তে। সেনেটের ক্যামেরাম্যান খুব সম্ভবত ভুল করে "আণ্ডার ক্র্যাঙ্ক" (under crank) অর্থাৎ ১৬টি ফ্রেম প্রতি সেকেণ্ডেরও কম ফ্রেম রেট-এ শ্যুট করেছিলেন। এটা একটা দুর্ঘটনা ছিল। সে গল্প দীর্ঘ। তার উল্লেখ করছি না। সেনেট এই ছবি দেখে বলে উঠলেন— "It is funnier than fun." সেই থেকে চ্যাপলিন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 'under crank' থেকে গেলেন। চ্যাপলিনের মাইনে বাড়তে শুরু করল এবং তিনিই প্রথম কমেডি ফিল্ম-এর জন্য মিলিয়ন ডলারে চুক্তি করলেন। চুক্তি হলো তিনি আঠারো মাসে আটটি যে কোন দৈর্ঘ্যের কমেডি জাতীয় ছবিতে অভিনয় করবেন। এইসময় কমেডি ছিল ছবির জগতের রাজা। আর চ্যাপলিন অমর হয়ে রইলেন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে।

এদিকে ১৯১৩ সালেই গ্রিফিথ-বিৎজার জুটি বায়োগ্রাফ কোম্পানী ত্যাগ করলেন। তাঁদের সমস্ত যাদু, শিক্ষা ঢাললেন "বার্থ অফ এ নেশান" (Birth of A Nation) ছবিতে। দৈর্ঘ্যে ছিল ছবিটি বেশ বড়, হ্যাণ্ড হেল্ড শটও ছিল, ছিল নাইট ফর নাইট শট, এখানে উল্লেখ করা যায়— "...to capture the vast sweep of action, Bitzer had a Tower one hundred feet in height. The camera was mounted atop, vignette shots, night combat shots were taken with the aid of magnesium flares for illumination, this cast an eeri effect over the entire field of action." —এই ধরনের 'flare' বা রংমশাল জ্বালিয়ে ১৯৬৬ সালে "দুর্গাভাসান" তুলেছি গঙ্গার ঘাটে। তবে আমি তখন বিৎজারের "লাইটিং ইনোভেশান" পড়িনি। আবার "তিনকন্যা"/"দেবী" ছবির জন্য ত্রিশ ফুট উচু বাঁশ দিয়ে উপরে টেবিল বানিয়েছি টপ শট নেওয়ার জন্য।

এরপর-ই শুরু হলো গ্রিফিথের "ইনটলারেন্স" ছবিটি—একটার পর একটা নতুন প্রয়োগ—

এ সবই বিৎজার আগে আবিষ্কার করেছেন।

সে সময়ে বিৎজার যা করেছেন ভাবলে অবাক লাগে এই কারণে যে তখনও film-এর গতি, লেন্সের গতি বা কর্মক্ষমতা তুলনামূলক ভাবে অত্যন্ত নগণ্য ছিল। রাতের দৃশ্য রাতেই তুলেছেন, প্রতিবন্ধকতাকে অস্বীকার করে এবং সার্থকও হয়েছেন। সে তুলনায় আমাদের প্রচেষ্টা খুব একটা উল্লেখের দাবি রাখে না। তবুও লিখছি একারণে যে না জেনে একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম। ফোটোগ্রাফির দিক থেকে ইনটলারেন্স এক অসাধারণ সৃষ্টি। এই সাফল্য শুধুমাত্র জমকালো যুদ্ধের দৃশ্যগুলো ফ্রেম 'মাস্কিং' (Masking) করে আজকের দিনের সিনেমাস্কোপের এফেক্ট সৃষ্টি করার জন্যই নয়, একই সঙ্গে এ ছবির সফট্ ফোকাস ক্লোজ-আপ আর এর 'vignette shots'-এর জন্যও। এই সঙ্গে ছিল আরো কিছু দৃশ্য যার মধ্যে পাওয়া যায় রুক্ষ বাস্তবধর্মী তথ্যচিত্রের মেজাজ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্যুটিং-এর সময়ে একসঙ্গে চারটে ক্যামেরাও ব্যবহার করা হয়েছে আর বিৎজারের সঙ্গে ক্যামেরার কাজে হাত লাগিয়েছেন কার্ল ব্রাউন (Carl Brown), জে. জি. বিৎজার (J. G. Bitzer) এবং ই. ফিল্ডার (E. Fielder)। এ ছবির সমস্ত অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছিল দিনের বেলা প্রাকৃতিক সূর্যালোকে; শুধুমাত্র কয়েকটি রাত্রের দৃশ্য তোলা হয়েছিল রাত্রিবেলা ফ্লেয়ার (Flare)-এর সাহায্যে। এ ছবিতে কোন বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহার করা হয়নি। সুযোগও ছিলনা। জেনারেটর ছিলনা। ছিলনা উপযুক্ত আলো।

ইনটলারেন্স ছবিটিকে যথার্থ শিল্পের মর্যাদা দিয়ে অনেকেই রেমব্রাঁ আর মাইকেলেঞ্জেলোর শিল্পকর্মের সঙ্গে তুলনা করেন। চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাসকার উইলিয়াম কে. এভারসন (William K. Everson)-এর মতে ইনটলারেন্স চিত্রভাষার দিক থেকে সমৃদ্ধতম ছবি। আজকে পর্দায় চলচ্চিত্রের যা কিছু কৌশল দেখি তার সবই এসেছে এই ছবিটি থেকে। এ ছবিতে একটি ভোজসভার দৃশ্য রয়েছে যেখানে ক্যামেরা অনেক দূর থেকে এগিয়ে আসতেই থাকে, মনে হয় যেন ক্যামেরা শূন্যে ভেসে আছে, তারপর ধীরে ধীরে অবতরণ করতে থাকে এবং একটা ক্লোজ-আপে এসে শেষ হয়। এ যেন ঠিক আজকের দিনে যাকে প্ল্যান সিকোয়েন্স বলা হয় তা-ই। ভাবলে অবাক লাগে একটা ডলির (dolly) কথা। একশো চল্লিশ ফুট উঁচু একটা পাটাতন। এর নীচটা ষাট ফুট চওড়া। এটাকে বসানো হয়েছে ছ'জোড়া চার চাকার রেলগাড়ির ট্রলির ওপর আর এর মাঝখানে রয়েছে একটা এলিভেটর (elevator)। ট্রাকের ওপর দিয়ে অনেকদূর থেকে এটির সাহায্যে পুরো সেটটাকে ধরা হয় যার মধ্যে পাঁচ হাজার এক্সট্রা রয়েছেন। এই বিশাল আকৃতির ডলি চালাবার জন্য পঁচিশ জন লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। আরো একদল লোক এলিভেটর চালাবার জন্য রাখা হয়েছিল যারা ধীরে ধীরে ক্যামেরাকে রাজপুত্র এবং রাজকন্যার ক্লোজ-আপ ধরার জন্য এগিয়ে এনেছিল। পুরো দৃশ্যটা ধরা হয়েছিল মাত্র একটা হাতে ঘোরানো প্যাথে ক্যামেরার সাহায্যে। কার্ল ব্রাউন ক্যামেরার নীচে বসে ক্যামেরার হাতল ঘুরিয়ে গেছেন এবং বিৎজার ক্যামেরার বাকি কাজ করেছেন।

খুব ভালোভাবে 'টপ শট' (Top shot) পাওয়ার জন্য বিৎজার মস্ত বড়ো বেলুন ব্যবহার করেছিলেন—এই বেলুনের নীচের পাটাতনে ক্যামেরা বসানো হয়েছিল এবং ক্যামেরাম্যান বেলুনে চড়ে শট নিয়েছিলেন।

১৯১৬ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে স্টুডিও আলোর স্বর্ণযুগের সূচনা। এটা আরো উন্নত হয়েছিল 'লাস্ট লাফ' আর 'যোয়ান অব্ আর্ক' ছবির সময়। এসময় ছবিকে আবার কৃত্রিমভাবে রঙিন করার প্রথাও শুরু হয়। ''আবার'' বলছি এ কারণে যে ১৯০৯/১০ সালে গ্রিফিথ একবার ছবিতে কৃত্রিম ভাবে রং করার চেষ্টা করেছিলেন। যোয়ানকে আগুনে পুড়িয়ে মারার দৃশ্যটিকে

লাল রঙ করা হয়েছিল। রাত্রের দৃশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল নীল টিন্ট (tint)। কখনো কখনো পর্দার পেছন থেকেও দৃশ্য অনুযায়ী লাল বা নীল রঙ ফেলা হয়েছে এফেক্ট তৈরি করার জন্য। ধীরে ধীরে নাটকীয়তা তৈরির ক্ষেত্রে আলোর গুরুত্ব সম্পর্কে স্টুডিওর কর্তারা সচেতন হতে শুরু করলেন। আলোর ব্যবহারের দিকটা যতোই উন্নত হতে লাগলো ক্যামেরাম্যানরা ততো বেশি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা শুরু করলেন। প্রেস এবং সাধারণ দর্শকও এ ধরনের কাজের তারিফ করতে লাগলো। ধীরে ধীরে দেখা গেল যে আলোকচিত্রীরা উৎসাহিত হচ্ছেন তাঁদের নৈপুণ্য এবং কল্পনাশক্তির প্রয়োগে—কারণ আলো এখন পরিগণিত হয়েছে শিল্পসৃষ্টির উপাদানে। বা শিল্পের অঙ্গ হিসাবে।

বিগত একশো বছরে ক্যামেরাম্যানরা অনেক নতুন কলাকৌশল সৃষ্টি করেছেন, জন্ম দিয়েছেন সম্পূর্ণ নতুন ধারার (STYLE) যা চলচ্চিত্রের ভাষাকে আরো পরিশীলিত করেছে। সমস্ত নতুন সংযোজনই সময়ের মাপকাঠিতে পরীক্ষিত হয়ে তবেই স্বীকৃতি পেয়েছে এবং ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছে। ১৯১৯ সালে ব্রোকেন ব্লসমস্ (Broken Blossoms) তোলেন বিলি বিৎজার যা চলচ্চিত্র জগতে প্রচণ্ড আলোড়ন তোলে। বিৎজার এ ছবিতে যে কোমল দৃশ্যপট রচনা করেন তা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অন্যদেরও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। ব্রোকেন ব্লসমস্ যে সংবেদনশীল দৃশ্যশৈলী রচনা উপস্থাপিত করে তাকে বর্ণনা করা হয়েছিল এইভাবে "Almost as fragile as its title."—আসলে ছবির কাহিনীসূত্র দাবি করেছিল ক্যামেরার এক সংবেদনশীল প্রয়োগ যা কাহিনীর প্রতিটি আবেগ-অনুভূতিকে তুলে ধরবে। এর সঙ্গে কাহিনীর পরিবেশকে যথাযথ ভাবে তুলে ধরবার জন্য বিৎজার দক্ষতার সঙ্গে রাতের বহির্দৃশ্যগুলো গ্রহণ করেছিলেন। অল্প আলোকিত রাস্তা, কুয়াশাঘেরা টেমস্ নদীর তীর বিৎজারের ক্যামেরায় বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। তবে সব থেকে আলোচিত হয়েছিল নরম আলোয় উদ্ভাসিত ক্লোজআপ শটগুলো, বিশেষতঃ নায়িকার বেদনাকাতর মুখের ছবি যা বিৎজার 'সফট্ ফোকাসের' সঙ্গে আলোর অসাধারণ ব্যবহারের মিলনে সফল করেন। এর অনুপ্রেরণা অবশ্য এসেছিল পোর্ট্রেট-ফোটোগ্রাফির ঐতিহ্য



থেকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিৎজার জোরালো 'আর্ক' লাইট ব্যবহার করেন এবং নেগেটিভকে সামান্য 'ওভার এক্সপোজ' করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে আলটন উইলসনের (Alton Wilson) মন্তব্য, "The purpose of lighting is two fold, that is for quantity and quality."

আলোর প্রয়োগের ক্ষেত্রে যারা গুণমান নিয়ে চিন্তিত তাঁরা সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে ভেবে থাকেন :

১. Orientation—দর্শককে প্রাথমিকভাবে দেখতে সাহায্য করা (এবং আমার মতে কাহিনীটি অনুভব করতে সাহায্য করা)

২. অনুভূতি এবং মেজাজ (Mood), ঋতু, সময় ইত্যাদি

৩. দৃশ্যগত সৌন্দর্য্য

৪. ত্রিমাত্রিকতা, পরিপ্রেক্ষিত এবং গভীরতা (depth)।

সফট্ ফোকাসের ব্যবহার বহুল প্রচলিত হয়েছিল এবং এর অপপ্রয়োগও হয়েছে। এ সময়কার বিশেষ কয়েকজন ক্যামেরাম্যানের কথা বলতে চাই যাঁরা নতুন চিন্তা ভাবনায় নিজেদের কাজকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিৎজারেরও আগে ফ্রেড বালসোর (Fred Balshore), জিমি ফ্রেঞ্চ (Jimmy French) প্রমুখ ক্যামেরাম্যানরা এই মাধ্যমটির দৃশ্যগত সম্ভাবনার কথা বুঝতে পেরেছিলেন। ফ্রিৎস ল্যাঙ সর্বপ্রথম তাঁর লাস্ট লাফ (Last Laugh) ছবিতে ১৯২৪ সালে প্রমাণ করেন যে শুধুমাত্র ক্যামেরার সাহায্যে, চিত্রভাষার মাধ্যমে একটা কাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করা যায়। এ ছবিতে তিনি কোনো টাইটেল কার্ড ব্যবহার করেন নি।

এই ধারার পাশাপাশি অবশ্য চলছিল এক বাস্তবানুগ আলো ব্যবহারের ধারা। এই ধারার প্রবক্তা ছিলেন রবার্ট ফ্লাহার্টি। তাঁর নানুক অব দ্য নর্থ (Nanook of the North) ছবির (১৯২২) জন্য তিনি প্রথম প্যানক্রোম্যাটিক ফিল্ম ব্যবহার করেন যা ইতিপূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ দৃশ্যের জন্য—গোটা ছবিতে নয়। ফ্লাহার্টি এসকিমোদের সঙ্গে বসবাস করে, বাস্তব জীবনের নাটকীয়তাকে চলচ্চিত্রায়িত করেন। বিষয়বস্তুর কারণেই এ ছবিতে অবাস্তব রোম্যাণ্টিকতার স্থান ছিল না। ফ্লাহার্টির কাজের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী আর তাঁর যোগ্য শিষ্যও ছিলেন কয়েকজন যাঁদের মধ্যে রিচার্ড লিকক ছিলেন অন্যতম। এঁর কাজ দেখে আমরা মোহিত হয়েছিলাম। আমি তো লুইসিয়ানা স্টোরি (Lusiana Story) দেখেই ক্যামেরাম্যান হওয়ার স্বপ্ন দেখি। পরে শুনেছি, সুব্রত মিত্রও ফ্লাহার্টির কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পরে লিককের সঙ্গে দেখা হওয়ারও সৌভাগ্য হয়েছিল MIT, হার্ভার্ডে।

যাইহোক, রোম্যাণ্টিক (এবং অবাস্তবানুগ) আলোর ব্যবহারের কথায় ফিরে আসা যাক। বিৎজার ডিফিউশন ব্যবহার করতেন এবং এটা বিভিন্ন শটের মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই করতেন। ব্রোকেন ব্লসমস্‌কে অনেকেই পরবর্তীকালে অনুসরণ করেছেন এবং কোমল, কাব্যিক আলোর প্রয়োগ করেছেন। এটা সাধারণত করা হত নেগেটিভকে ওভার এক্সপোজ এবং আণ্ডার-ডেভেলপ করে। এভাবে আমি শ্রী জি. কে. মেহেতাকে (G.K. Mehta) দেখেছি কাজ করতে ১৯৫৮ সালে। তিনি হলিউডে গিয়ে কাজ শিখে এসেছিলেন এবং তাঁর কাজের মধ্যে হলিউডের প্রভাব ছিল খুব স্পষ্ট।

হলিউডের আর একজন পরিচালক সিসিল ডি মিল সিনেমাটোগ্রাফি সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। ছোটবেলা থেকে তাঁর চারুকলায় আগ্রহ ছিল এবং প্রদর্শনী দেখতেন নিয়মিত। এরই ফলে তাঁর ছবিতে তিনি বরাবর কম্পোজিশনের (composition) ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

এমনকি তাঁর আলো সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা ক্যামেরাম্যানদেরও অনুপ্রাণিত করেছে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি রোম্যান্টিক, অবাস্তবানুগ আলো পছন্দ করতেন, গ্ল্যামার (glamour) লাইটিং চাইতেন। অন্যদিকে তিনি বলতেন, 'অপেরাতে সঙ্গীতের যা ভূমিকা, চলচ্চিত্রে আলোরও সেই ভূমিকা রয়েছে।' ডি মিল চলচ্চিত্রে এক ধরনের আলোর ব্যবহার করেন যাকে 'রেমব্রাঁ লাইটিং' বলা হয়। একটা ছবির শ্যুটিং-এর সময় ডি মিল দেখেন যে সেটটির দূরতম স্থান এবং ক্যামেরার নিকটতম স্থান একই রকমভাবে আলোকিত হয়ে রয়েছে। কিছু পরিবর্তনের জন্য তিনি স্থানীয় অপেরা থেকে স্পট-লাইট নিয়ে আসেন এবং অভিনেতাদের মুখ এক পাশ থেকে আলোকিত করেন। মুখের অন্যপাশ অপেক্ষাকৃত কম আলোকিত থাকে। ছবি তোলার সময়ে অনেকে আপত্তি করলেও ছবি দেখার পরে এই আংশিক আলোকিত করার পদ্ধতিটিকে কেউ কেউ রেমব্রাঁর আঁকা ছবির সঙ্গে তুলনা করে 'রেমব্রাঁ লাইটিং' নাম দেন। এ ছবির প্রযোজক ছিলেন স্যামুয়েল গোল্ডউইন (Samuel Goldwin) এবং ছবিটি দেখে তাঁর কিছু প্রদর্শক বন্ধু তাঁকে টেলিগ্রাম করে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে এই আধো আলো আধো অন্ধকার মুখ দেখবার জন্য দর্শক পয়সা দেবে না। এর উত্তরে ডি মিল বলেন যে আমি ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি যে আপনি বা আপনার বন্ধুরা এই 'রেমব্রাঁ স্টাইল অব্ লাইটিং' দেখে এর যাথার্থ উপলব্ধি করতে পারেন নি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে এই দৃশ্যগুলোতে দর্শক আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বে এবং ছবিটি জনপ্রিয় হবে। আর, তা যদি হয় তাহলে আপনি আমাকে দ্বিগুণ অর্থ দেবেন। বস্তুত, ছবিটি সত্যই জনপ্রিয় হয় এবং গোল্ডউইন সত্যই ডি মিলকে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দেন।

হলিউডে এ সময়ে বেশ কিছু কঠোর বাস্তবধর্মী ছবি হয়েছিল। দ্য কভারড্ ওয়াগন (The Covered Wagon), দ্য আয়রন হর্স (The Iron Horse) বা গ্রিড (Greed) ছবিগুলো বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য হলিউডের অবাস্তবানুগ রোম্যান্টিক ফোটোগ্রাফির ধারা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। এ প্রসঙ্গে দ্য সানরাইস (The Sunrise) ছবিটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। ১৯২৭ সালে তোলা এই ছবির উন্নত ফোটোগ্রাফি নানা কারণেই ছিল অতুলনীয়। এ ছবিতেই ব্রোকেন ব্লসমস্-এর রোম্যান্টিক, অবাস্তবানুগ আলোর প্রয়োগরীতির সঙ্গে মিলন ঘটানো হয়েছিল সাবলীল ক্যামেরার ব্যবহারের যা 'দ্য লাস্ট লাফ' ছবিতেও সকলকে অভিভূত করেছিল। এর ফলে এ ছবিতে অনেক অবিস্মরণীয় দৃশ্যাবলী রচিত হয়েছিল যার তুলনা মেলা ভার—বিশেষতঃ রাতের দৃশ্যগুলোর কাব্যিক সুষমা নিঃসন্দেহে চলচ্চিত্রকে শিল্পকলার মর্যাদা দিয়েছে। 'সানরাইজ' ছাড়াও আমি উল্লেখ করতে চাই 'দ্য সেভেন্থ হেভেন' (The Seventh Heaven) এবং 'দ্য স্ট্রিট অ্যাঞ্জেল' (The Street Angel) ছবি দুটোর কথা যেখানে সুন্দর নরম আলোর সাহায্যে অসাধারণ চিত্রভাষার সৃষ্টি করা হয়েছিল। চিত্রগ্রাহক গভীর কালো ছায়ার সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন নানা মাত্রার ধূসর বা 'গ্রে' যা ছবির চাপা, অনালোকিত পরিমণ্ডলকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিল। 'দ্য প্যাসন অব্ যোয়ান অব্ আর্ক' হচ্ছে শেষ গুরুত্বপূর্ণ নির্বাক ছবি যেখানে ক্যামেরার নির্দয় পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে পুরোপুরি ব্যবহার করা হয়েছিল।

মনে রাখতে হবে যে, সেদিনের সেই 'সফট্ লাইটিং এফেক্ট' বা 'সফট্ ফোকাস' শুধুমাত্র নেগেটিভকে ওভার-এক্সপোজ এবং আণ্ডার-ডেভেলপ করেই করা হয় নি। এছাড়াও আরো অনেকগুলো কৌশল বা পদ্ধতি ছিল: ক্যামেরার লেনসের সামনে পাতলা এবং স্বচ্ছ 'গজ' ব্যবহার করে আলোকরশ্মি কিছুটা প্রতিহত করে 'ডিফিউসড' এফেক্ট সৃষ্টি করা। আবার আর্থার মারভিনের মতো ক্যামেরাম্যান ক্যামেরার সামনে পাতলা জাল ব্যবহার করেছেন। আর একটা পদ্ধতি ছিল যার সাহায্যে ফ্রেমের শুধুমাত্র মধ্যবর্তী স্থানটুকু ফোকাসে রেখে বাকি অংশ আবছা

করে দেওয়া। এর জন্য ব্যবহৃত জালের মাঝখানটায় একটা গোলাকৃতি ছিদ্র করে দেওয়া হতো। বিৎজার 'সফট্ ফোকাস' কৌশলকে অনেকটা নিখুঁত করে তোলেন 'ওয়ে ডাউন ইস্ট' (Way Down East) ছবিতে। এ ছবিতে কঠোর বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি তিনি কোনো কোনো দৃশ্যে 'প্যাস্টেলে' আঁকা ছবির নরম মেজাজকেও ধরেন। সফট্ ফোকাসের কৌশল, বিশেষ 'মুড লাইটিং' এবং ক্লোজ-আপের সুচারু প্রয়োগ শুধু দর্শকদেরই নয়, চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কলাকুশলীদেরও প্রচণ্ড প্রভাবিত করেছিল। এর ফল হিসাবে সিনেমাটোগ্রাফি-র বৈপ্লবিক উন্নতি সাধিত হয় এবং এর উন্নত মান চলচ্চিত্রকে 'শিল্প' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান ওয়ালটার লেসেলির (Walter Lesseli) কথা। তিনি তাঁর ঠাকুমার বিয়ের সময়কার টুপির সামনে ব্যবহৃত নেট চুরি করে ছবি তোলার সময় ব্যবহার করে চমৎকার 'সফট্ ফোকাস' পেয়েছিলেন। জেমস্ ওয়াং হো (James Wang Howe) একইভাবে নায়িকাদের রূপসী তৈরি করতে একই পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, ব্যবহার করেছেন মেয়েদের রেশমের মোজা। কার্ল ট্রস (Carl Tros) ব্যবহার করেছেন মেয়েদের খোঁপার নেট।

তাঁদের দৃষ্টান্ত আমরাও অনুসরণ করেছি। আজো করি। আসলে আমাদের দেশে চলচ্চিত্রে আলোর ব্যবহারের যে বিরাট ভূমিকা আছে তা সঠিকভাবে বুঝতে সময় লেগেছে অনেক। আমাদের দেশেও বিশেষ করে বোম্বের আলোকচিত্রী ফালি মিস্ত্রি (Fali Mistry), জাল মিস্ত্রি (Jal Mistry), দ্বারকা দেভাচা (Dwarka Devacha) এবং অন্যান্যরা এ ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। কলকাতাতে আমি অমূল্য মুখার্জি, জি. কে. মেহেতা, ডঃ বিদ্যাপতি ঘোষ প্রমুখদের এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে শুনেছি। এঁদের অনেকেই হলিউড বা জার্মানির উফা (UFA) স্টুডিওতে শিক্ষা নিয়েছিলেন এবং এই কৌশলটির ব্যবহার চলেছিল প্রায় ১৯৬০ সাল পর্যন্ত— যদিও এইসময়ে নানা ধরনের 'ডিফিউশন ডিস্ক' তৈরি হয়ে গেছে। আজকাল এই ধরনের এফেক্ট তৈরি করার জন্য নানা ফিলটার পাওয়া যায়। অবশ্য সাধারণত এদের ব্যবহার বিজ্ঞাপনের নায়িকাদের ছবি তোলাতেই সীমাবদ্ধ।

১৯০৮ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত যত কলাকৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে তার সবই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে আজও। তবে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। যেমন, 'ডিফিউজ লাইট' আমরা তৈরি করি 'ইনডায়রেক্ট রিফ্লেকটেড লাইটিং'-এর সাহায্যে। এরই অসাধারণ সহজ পদ্ধতি তৈরি করেন সুব্রত মিত্র একটা তিন ফুট × দু ফুট কাঠের বাক্সে ৩২টা সাধারণ বাল্ব লাগিয়ে। এই আলোকে আরো নরম করা যায় এর সামনে 'টিসু' কাগজ লাগিয়ে।

চলচ্চিত্র শিল্পের প্রথম যুগে আলোর প্রধান কাজ ছিল পুরো সেট এবং অভিনেতাদের সমানভাবে আলোকিত করা যাতে ঠিকভাবে ছবি তোলা যায়। এর পর যখন সাধারণ 'কর্মী' ক্যামেরাম্যানদের জায়গায় সৃজনশীল ক্যামেরাম্যানরা এলেন তখন আলোর ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তা ভাবনা আসতে শুরু করলো, আলোর বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগ শুরু হলো। আজকের দিনে আলোর ব্যবহার অনেক নিখুঁত হয়েছে, হয়েছে নাটকীয় এবং নিয়ন্ত্রিত। আজকের দিনে আলোর ব্যবহারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পরিচালক এবং অভিনেতাদের জন্য ছবির জন্য এক দৃশ্যগত রূপ ফুটিয়ে তোলা, আলোর সাহায্যে ছবির কাহিনীর উপযুক্ত পরিমণ্ডল গড়ে তোলা। অন্যভাবে বলতে গেলে, চলচ্চিত্র নির্মাণের আদি যুগে আলোর সমস্যা ছিল প্রয়োগগত, এখন তা পরিণত হয়েছে প্রেক্ষাপট থেকে আরম্ভ করে পারিপার্শ্বিক মেজাজ সৃষ্টি করায়। শুধু আলোর উপযুক্ত ব্যবহারে নাটকীয় সমস্যা এবং শিল্পের সমস্যার অনেক সমাধান সহজ হয়ে যায়।

চলচ্চিত্র কাহিনীর নাটকের দাবি থেকেই আলোর অতিনাটকীয় ব্যবহার শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে, সিটিজেন কেইন-এর সময়কালে চলচ্চিত্র নিয়ে ভাবনাচিন্তার সামগ্রিক পরিবর্তন আসতে শুরু করে এবং আলোর ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ে। সিটির্জেন কেইন অনেক পরিবর্তন এনেছে। আলোর কথাই বলছি—গ্রেগ টোলাণ্ডকে সেটে যেহেতু সিলিং ছিল তাই সব আলো দরজা, জানালা দিয়ে করতে হয়েছে। ফলে বাস্তবতা পেয়েছে। প্রামাণিক চিত্রের মত মনে হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে। আজো উল্লেখযোগ্য ছবি—সর্বদিক থেকে। হলিউডের ছবিকে অনেকে আলোর প্রাধান্যের কারণে 'হলিউড গ্লস' (Hollywood Gloss) বলে অভিহিত করতেন। স্টুডিওদের এই প্রথা থেকে বের করে আনাটা সোজা কাজ ছিল না। এ প্রসঙ্গে 'টর্ন কার্টেন' (Torn Curtain) ছবির পরিচালক হিচকক যখন স্বাভাবিক, 'ন্যাচারালিষ্টিক' আলোর ব্যবহারের কথা বলেন তখন একজন তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'স্বাভাবিক আলো আবার কি?' হিচকক উত্তরে তাকে বলেন যে তাঁরা যেখানে বসে আলোচনা করছেন সেই ঘরের আলো দেখতে। চলচ্চিত্রে যেমন দেখা যায় তেমন গাঢ় ছায়া তো কোথাও নেই। সরাসরি কোনো আলো তাদের ওপর এসে পড়ে নি, এমন কি জানালাগুলোও পর্দায় ঢাকা বলে বাইরের আলো অনেক নরম হয়ে ভেতরে এসেছে। এজন্য ঘরের আলোয় কোনো অস্বাভাবিকতা নেই, কোনো চড়া মাত্রার আলোর দরকার হয় নি। হিচকক প্রশ্ন করেন, 'এই স্বাভাবিকতা কেন চলচ্চিত্রে আনা হবে না?' এই স্বাভাবিকতার প্রতি ঝোঁক আসলে এসেছিল চলচ্চিত্রকে আরো বাস্তবের কাছাকাছি আনার তাগিদে। দর্শকের মধ্যে পর্দার ছবি যদি বাস্তবের অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারে তাহলে দর্শক অনেক সহজে কাহিনীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়বে এবং দর্শকমনে কাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। এপ্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে হিচকক তাঁর চলচ্চিত্র জীবন শুরু করেছিলেন লাইটিং ক্যামেরাম্যান হিশাবে। একটি কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে হিচকক কত আধুনিক ছিলেন সেই সময়েই। ব্যাক লাইটকে বলেছেন "বদ অভ্যাস"।

১৯১৯ সালে কিংবা তার একটু আগেই অর্থাৎ যখন "ইনক্যাণ্ডেসেণ্ট" (Incandescent) লাইট (থিয়েটারে ব্যবহৃত আলো—আজো আমাদের স্টুডিওয় ব্যবহৃত 1K, 2K, 5K আলোকে থিয়েট্রিকেল লাইট বলে।) ব্যবহার শুরু হয়নি তখন আলো ব্যবহার করা হত স্টুডিয়োর মেঝের উপর থেকে। এমন কি যখন "ইনক্যাণ্ডেসেণ্ট" আলো প্রথম ব্যবহার শুরু হলো তখন তাকেও মেঝের উপরেই রাখা হত। এরপরে সমস্ত আলোই মেঝে ছেড়ে সেটের উপরে "রেলে" (rail) লাগানো শুরু হলো। সুতরাং আলো সবসময়েই উপর থেকে ব্যবহার করা হতো। অনেকটা টপ স্পট ধরনের 'ব্যাক লাইট' (Back light) এই সময়েই সাধারণ আলোর সাথে ব্যবহৃত হতে থাকে। আর এই ব্যাক লাইট সম্পর্কে বিখ্যাত আলোকচিত্রী হাল মোর (Hal Mohr) মন্তব্য করেছিলেন—"Oh! that was the mode, not just for Marry Pickford or Miss Lilian Gish, but for every body, we used to put back-light on them like 'Mid-Summer-Night Dream.'" বিলি ড্যানিয়েল (Billy Daniel) এবং ওলি মার্স (Ollie Marsh) তাঁদের নায়িকাদের অনেক সময়েই এমনভাবে 'ব্যাক লাইট' করতেন যে তাদের মুখ প্রায় দেখাই যেত না। ব্যাপারটা এইরকম হতো যে ছবি তোলা হতো জোরালো ব্যাক লাইট এবং প্রচুর প্রতিফলিত আলোর সাহায্যে। সে সময়ে ফিল্মের কারণে এক্সপোজার সাধারণভাবে যখন F 8 দরকার তখন তা তোলা হতো F4 দিয়ে। সেই ওভার এক্সপোজ এবং আণ্ডার ডেভেলপ করার পদ্ধতি—ডেভেলপ করার সময় ছবি ফুটে উঠলেই তার ডেভেলপ করা হতো না।

আলো যখন মেঝের ওপর রেখে ব্যবহার করা হতো তখন ক্যামেরাম্যানরা একটা স্পট

আলো ব্যবহার করতেন টপ-ব্যাক থেকে, আর এর ফলে চরিত্রের মাথার পেছনে চূড়ান্ত অবাস্তব আলোর বৃত্ত (halo) তৈরি হতো। এই এফেক্টকে বলা হতো "লাইনার"। আসলে ক্যামেরাম্যানদের মাথায় সর্বদাই ব্যাকলাইটের ব্যবহারের ভাবনা ঘুরতো কেননা তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল চরিত্রকে পশ্চাদ্‌পট থেকে আলাদা করে দেখানো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং তার পরে ইউরোপ এবং আমেরিকায় বাস্তবানুগ আলোর ব্যবহার শুরু হওয়ার মূল কারণ অবশ্য ছিল বিদ্যুতের অভাব। এটা বেশি হয়েছিল ফ্রান্স এবং ইতালিতে। আমেরিকায় সিটিজেন কেইন-এর প্রভাব, তথ্যচিত্রের ধারা—এগুলোও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল আলোর ব্যবহারের ভাবনায়। আমাদের দেশে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল কয়েকজন ফিল্ম কর্মীর মধ্যে। তার কারণ ইউরোপের ছবির কিছু কিছু প্রদর্শন হত তখন। Studio-র ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায় ত'ন।

সেই সময়েই নিমাই ঘোষ "ছিন্নমূল" ঋত্বিক ঘটক "নাগরিক' বিদ্যাপতি ঘোষ মশায় এঁরা এবং রামানন্দ সেন মহাশয় সবাই মিলে ইউরোপের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এই ধারার কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন। রামানন্দ বাবুর ওপর আবার জাঁ রেনোয়ার (Jean Renoir) প্রভাব রয়েছে, কারণ, রেনোয়া পরিচালিত রিভার (River) ছবিতে রামানন্দ বাবু ক্লদ রেনোয়ার (Claude Renoir) অপারেটিং ক্যামেরাম্যান ছিলেন। এই একটি ছবি আমাদেব বাংলায় অনেক পরিবর্তনের জন্য দায়ি। রেনোয়ার সঙ্গে সেদিন সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, হরিসাধন দাশগুপ্ত, সুব্রত মিত্র কোন না কোন ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। এঁদের প্রত্যেকের কাজেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রেনোয়ার প্রভাব পড়েছে। পথের পাঁচালী হয়েছে। ক্লদ রেনোয়া এবং হরিসাধন দাশগুপ্ত মিলে কোনরক করেছেন, সদ্য ইতালি থেকে ফিরে আসা বারীন সাহার সঙ্গে হরিসাধন বাবুর কাজ পঞ্চথুপি, বারীন সাহা ও শান্তি চৌধুরীর একসঙ্গে তৈরি কাজ বিরসা মুণ্ডাব ওপব তথ্যচিত্র, চিদানন্দ বাবু ও বারীন সাহার পোর্ট্রেট অব্ এ সিটি—ইত্যাদি ছবিগুলো বাস্তবতাব নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি করলো।

এত ধরনের প্রগতির পরও কিন্তু অবাস্তব স্বপ্নালু আলোব ভাষা চলচ্চিত্র থেকে কখনই পুরোপুরি নির্বাসিত হয়নি। বস্তুতঃ একাধিক ধারা পাশাপাশি চলছিল। এব প্রধান কারণ হচ্ছে গল্প। দর্শকের চাহিদার উপর নির্ভর করে শিল্পমাধ্যমের চরিত্র। ফ্র্যাঙ্ক কাপরা (Frank Capra) দুঃখ করে বলেছিলেন যে চলচ্চিত্র অত্যন্ত ব্যয়বহুল শিল্প কিন্তু তিনি তাঁর ঘরের লোককেই বোঝাতে পারেন নি যে গভীর অন্ধকারের দৃশ্য যখন বোঝাতে চেয়েছেন তখন নায়ক-নায়িকাদের মুখ খুব বেশি উজ্জ্বল কি করে দেখানো যাবে? আসলে বিনোদনের দাবি বাস্তবতার দাবি-র থেকে অনেক বেশি জোরালো। আমি নিজে যখন সহকারী হিসাবে কাজ করি তখন এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমারও হয়েছে। একজন আলোকচিত্রী দিনের দৃশ্যের ছবি তুলছিলেন, এর পর ঐ সেটে-ই এলো রাতের দৃশ্য। কিন্তু লক্ষ করলাম আলোর বিশেষ কোন পরিবর্তন হলো না। সংযোজন হলো একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন আর এক্সপোজারটা একটু চেপে দেওয়া হলো। এভাবে এখনও অনেকে রাতের দৃশ্য তৈরি করেন—যথেষ্ট আলোকিত ঘরে চরিত্র আলো হাতে ঢোকে অথবা ঘরে ঢুকে আলোর সুইচ অন্ করে। মনে রাখতে হবে এসব কিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে রুচির প্রশ্ন। দর্শক রুচি পরিবর্তনের চেষ্টা এদেশে সেভাবে হয়নি। অন্যদিকে দর্শক যে বাস্তবানুগ আলো প্রত্যাখ্যান করে তাও কিন্তু সত্যি নয়। এদিক থেকে বলতে গেলে বলা যায় যে এটা পুরোপুরি নির্ভর করে পরিচালকের উপর। পরিচালক যদি সাহস করে বলেন, "আমি দৃষ্টিনন্দন ছবি চাই না, আমি গল্পের দাবি অনুযায়ী রুক্ষ বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলতে চাই।" তাহলে

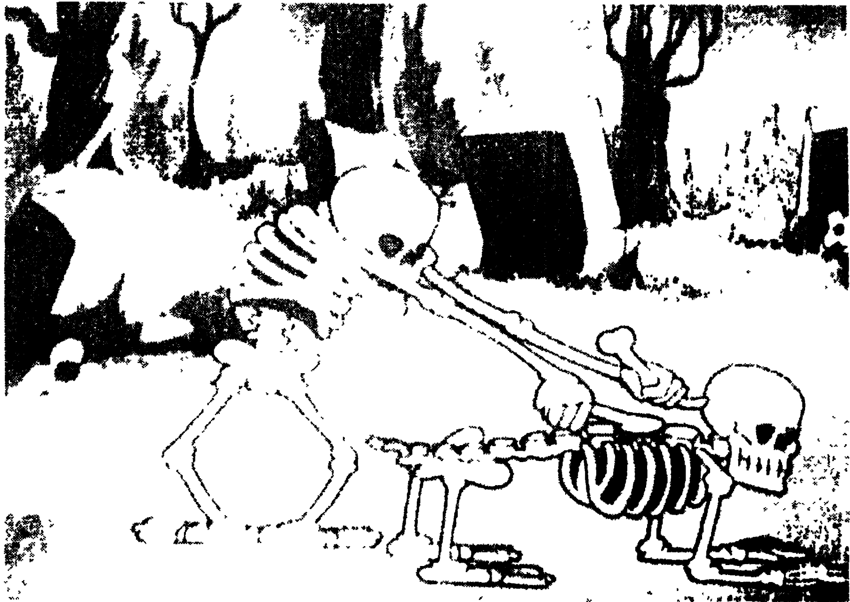
আলোকচিত্রী সেই দাবি অনুযায়ী সাবলীল ভাবে কাজ করতে পারেন। দুর্ভাগ্য যে আমাদের পরিচালকরা তখনো পরিবেশক, প্রদর্শক-এর কাছে দায়বদ্ধ ছিল। স্বাধীনতা আসেনি তাদের কাজের মধ্যে।

হলিউডের কট্টরপন্থী আলোকচিত্রীদের অন্যতম ছিলেন বার্নেট (Barnet)। কিন্তু তিনিও প্রয়োজনে পরিচালকের দাবি মতো বিষয়বস্তুর উপযুক্ত বাস্তবানুগ আলো ব্যবহার করতে ইতস্তত করেননি। একাজ তিনি সাফল্যের সঙ্গে করতে পেরেছিলেন কারণ তিনি টেক্‌নিক জানতেন। একসময় আমরাও কিন্তু 'কোমলগান্ধার', 'অযান্ত্রিক', 'অভিযান' এবং '২২শে শ্রাবণ'-এর মত ছবি তৈরি করেছিলাম। এসব ছবিতে আলোর ব্যবহাব দর্শক কিন্তু বাতিল করে দেননি। এ ছবিগুলো যখন হয়েছে তখন বাণিজ্যিক ছবিতে হলিউড-এর গ্ল্যামার লাইটিং নকল করা হচ্ছে। অর্থাৎ দু'য়েরই সহাবস্থান চলছিল। অন্যদিকে একশ্রেণীর মানুষ 'নিও রিয়্যালিস্ট' (neo-realist)-দের তীব্র সমালোচনা করছিলেন, বলছিলেন, 'তথ্যচিত্রের স্টাইল আবার কোন স্টাইল নাকি?' মনে রাখতে হবে সমালোচকরা কিন্তু পরিচালকদের এই আক্রমণের বাইরে রেখেছিলেন, কারণ অবশ্যই তাঁদের আন্তর্জাতিক খ্যাতি। আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল চিত্রগ্রাহকরা। হলিউড গ্ল্যামার আলোর ধারা এদেশে যারা বজায় রেখেছিলেন— যেমন জাল মিস্ত্রি, ফালি মিস্ত্রি, ফারদূন ইরানী, রাধু কর্মকার—এঁরা সকলেই কিন্তু পুরোপুরি স্টুডিওর মধ্যে ছবি তুলতে অভ্যস্ত ছিলেন। স্টুডিওর বাইরে খুব একটা যেতেন না। গানের, নাচের দৃশ্য তুলতে সিমলা, দার্জিলিং, কাশ্মির যেতেন সঙ্গে এক ট্রাক বোঝাই রিফ্লেকটার নিয়ে। উজ্জ্বল আকাশের সাথে সমতা রাখবার জন্য তীব্র আলো ব্যবহার করতেন রিফ্লেকটার দিয়ে। শিল্পীর চামড়া পুড়ে যেত। এটা অবশ্য ছিল যুগের ধর্ম। এরই পাশাপাশি বিদ্যাপতি ঘোষ 'নীচা নগর' তুলেছিলেন। অথবা, মনে করা যেতে পারে বিমল রায়ের 'দো বিঘা জমিন'—পরিবর্তন সহজেই চোখে পড়বে। ছায়াহীন বাস্তবানুগ আলো করতে অনেকেই সাহস পান নি, 'Low light level'-এ স্বল্প আলোতে কাজ করতেও অনেকে ভয় পেতেন, অনেকে 'মুড লাইটিং' এবং 'সোর্স লাইটিং' স্বীকার করতে চান নি। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে—সুব্রত মিত্র যখন তিসরি কসম্ ছবির শ্যুটিং করছেন বোম্বাইতে তিনি স্বভাবতই খুব কম আলো ব্যবহার করতেন। ইলেকট্রিসিয়ান থেকে আরম্ভ করে অনেক cameraman প্রথম প্রথম খুবই সন্দিগ্ধ ছিলেন এ ছবি উঠবে তো? তবে এ অবস্থা আজো বিদ্যমান। অনেকে যুক্তি দিয়ে বলেছেন যে মিনিয়েচার পেনটিং-এ তো কোনো সোর্স লাইট নেই—সুতরাং চলচ্চিত্রেই বা তা অনুসরণ করা হবে না কেন? এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'পারসিভাল' (Perceval) ছবির আলোকচিত্রী নেস্টর আলমেনড্রস (Nestor Almendros)-এর কথা। ছবিটি পুরোপুরি স্টুডিয়োতে তোলা হয়েছিল এবং পরিচালক ছবিতে কোন বাস্তবতার ছাপ রাখতে চাননি। এই দাবি ছিল চিত্রগ্রাহকেব নিজের কাজের ঐতিহ্যের বিরোধী। সেজন্য তাঁকে নিজের সমস্ত শিক্ষা ভুলে গিয়ে নতুন করে শিখতে এবং ভাবতে হয়েছে আলোর ব্যবহারের কথা। শেষপর্যন্ত মিনিয়েচার পেন্টিং-এর আদলেই ছায়াহীন, শুধুমাত্র রং এবং আকৃতি (form) ব্যবহার করে ছবিটিতে একটি বিশেযত্ব সৃষ্টি করা হয়। নেস্টর বলেছেন তার আলোর ব্যবহারে হলিউডের বিদ্যুৎ কর্মীরা প্রথম প্রথম খুবই অসন্তুষ্ট ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে নতুন করে সফট্ লাইট (soft light) ফিরিয়ে এনেছিলেন জি. আর. আলডো (G. R. Aldo)। যিনি ছিলেন ভিসকণ্টি (Visconti)-র ক্যামেরাম্যান। রাউল কুতার (Raoul Coutard) আলডো-কে অনুসরণ করেছিলেন। আবার অন্যেরা রাউল কুতারকে অনুসরণ করেছেন। আলডো-র বিখ্যাত কাজ "লা টেরা ট্রামা" (La Tera Trama), "উমবারটো

ডি' (Umberto-D) এবং ''সেনসো'' (Senso) আলোর ব্যবহারের দিক থেকে পুরোপুরি ভাবে হলিউড ঐতিহ্য-বিরোধী। অনেক ক্ষেত্রে আলোকচিত্রীকে হয়তো বাস্তব কারণেই গ্ল্যামার-বিরোধী আলোকে বেছে নিতে হয়েছে। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালির নিও-রিয়ালিস্ট কাজ। আলডো, রাউল কুতার, ম্যেক্ কর্ভরা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন। আজকের প্রজন্মের কাছে তাঁরা, তাঁদের কাজ দৃষ্টান্ত হয়ে গেছে। এবং তারা সজ্ঞানে সুবিবেচনার সাথে অনুসরণ করতে চেষ্টা করে। নিকভিস্ট আর একটি নাম। তাঁর অবদানও অসামান্য। ইউরোপ, আমেরিকায় আর্থিক অভাব। সবমিলিয়ে Studio বিপর্যস্ত। যুদ্ধের কারণে বিদ্যুতের অভাব, সাজ-সরঞ্জামের অভাব চিত্রগ্রাহককে বাধ্য করেছে বাস্তবানুগ, গ্ল্যামারবিহীন ছবি তুলতে। হয়তো অন্য পরিস্থিতিতে এঁদের কাজের ধারা অন্য রকম হতো। যাইহোক, ইউরোপ-আমেরিকার চলচ্চিত্র-ঐতিহ্যের সবকিছুই যে এদেশে এসেছিল এমন মনে করার কারণ নেই।

ক্যামেরার ভাষা সার্বজনীন। সংলাপের সীমাবদ্ধতা থাকলেও চিত্রভাষার সে সমস্যা নেই। দর্শকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা, দর্শক ও চিত্রিত কাহিনীর মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করাই ক্যামেরার ভাষার মূল কাজ। একে সার্থক রূপ দিতে গেলে পরিচালক এবং আলোকচিত্রীর মধ্যেও পরিষ্কার বোঝাপড়া থাকা দরকার। নেস্টর আলমেনড্রস-এর মতে চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়ায় পরিচালকের সঙ্গে আলোকচিত্রীর বোঝাপড়ার জায়গাটা অনেকসময়েই স্পষ্ট থাকে না এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। পরিচালকরা অনেকসময়েই চিত্রগ্রাহকের প্রযুক্তিগত খুঁটিনাটি দাবিগুলোকে বুঝতেই পারেন না, বুঝতেই চান না। অনেক সময়েই পরিচালকের আত্মকেন্দ্রিকতা ছবির কাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে—অনেক সময়েই পরিচালক ভুলে যান যে চলচ্চিত্র হচ্ছে এক যৌথ শিল্প।



সিলি সিম্ফনি : ওয়াল্ট ডিজনি

ভিডিও ক্যামেরা ও ভিডিওগ্রাফি

তপন গুহঠাকুরতা

আজ ঘরে বসে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ যেমন সরাসরি দেখতে পাচ্ছি—তেমনি কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা নিয়ে ভারত পাকিস্তানের কারগিল লড়াই-এর দৃশ্য সারা বিশ্ববাসী দেখতে পাচ্ছে—আবার বিদেশে ন্যাটো লড়াই করছে যুগোশ্লাভের সাথে—সমস্ত দেশ বিদেশের ঘটনা আমরা ঘরে বসেই দেখছি। এতে প্রমাণ হয় যে পৃথিবী আজ কত ছোট হয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। যেন আমাদের ড্রইং রুমে বন্দী। হ্যাঁ কতকটা তাই—দূরকে যেমন নিকট করতে আবিষ্কার হয়েছিল টেলিফোন—পরিচিত অপরিচিত সবার কণ্ঠস্বর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে শোনাবার জন্য। ঠিক ঐ ভাবে মানুষ বিমান আবিষ্কার করেছিল—কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অতিদূর প্রান্তে পৌঁছে যেতে। এরই সাথে আবিষ্কারের পথে ছিল—টেলিভিশন—যার মাধ্যমে টেলিফোনের শব্দ শোনা নয়—বিমানে চেপে দূর দেশে যাওয়া নয়, মানুষ ঘরে বসে সেই সব দেশের দৃশ্য ও শব্দ যেন প্রত্যক্ষ করতে পারে। পেজার, ফ্যাক্স, ইনটারনেট, টেলেক্স, মোবাইল, ই-মেল এসব আজ আমরা প্রত্যহ ব্যবহার করছি। টেলিভিশন আজ আমাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ করেছে। সাদাকালো দিয়ে প্রথম শুরু হয়—এখন রঙ্গীন টেলিভিশনে পরিণত হয়েছে। শব্দ এখন ষ্টিরিওফনিকে পাওয়া যাচ্ছে—এরপর হয়তো ত্রিমাত্রিক অর্থাৎ থ্রি ডাইমেন্শন ছবি পাব অদূর ভবিষ্যতে।

সিনেমা, চলচ্চিত্র, ফোটোগ্রাফি এসব শব্দ যখন শোনা যায় তখন মনের মধ্যে নানান দৃশ্যপট ভেসে ওঠে। পরবর্তীকালে টেলিভিশন শুরু হওয়ায় আমরা শুনতে পাই নতুন এক শব্দ "ভিডিওগ্রাফি"। এই ভিডিওগ্রাফি কিন্তু ফোটোগ্রাফি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই ভিডিও সংক্রান্ত সমস্ত যন্ত্রপাতি নির্ভর করে বিদ্যুতের উপর। ফিল্ম ক্যামেরা কিন্তু নানান যন্ত্রপাতির সমষ্টিতে চালিত হয় বিদ্যুতের দ্বারা—কিন্তু ভিডিও ক্যামেরা চলে নিঃশব্দে—যেখানে ফিল্ম ক্যামেরার মত কোন যন্ত্রপাতি নেই—আছে ইলেকট্রনিক নানান বোর্ডের সমন্বয়। তারও প্রয়োজন বিদ্যুৎ।

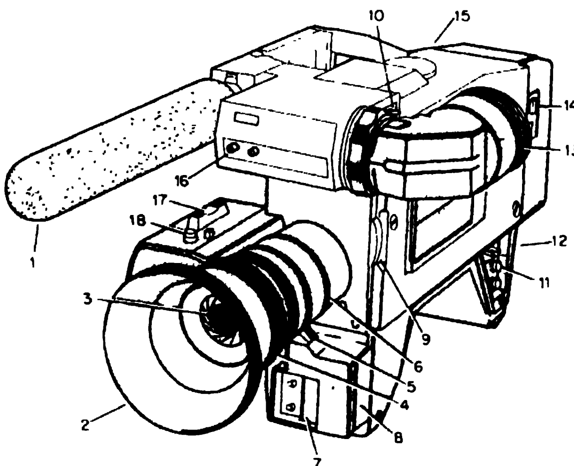
আজকের সমাজে টেলিভিশন একটা নিজস্ব জায়গা তৈরি করেছে। ঘরে বসে পৃথিবীর নানান দেশের নানান অনুষ্ঠান আমরা টেলিভিশনের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করতে পারি।

প্রথম যখন টেলিভিশন চালু হয়—তখন অনেকের মনে সংশয় ছিল ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রীর যবনিকা নেমে আসবে। সেই সময় প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে—এর ফলে অনেক নতুন প্রযুক্তি ফিল্মের জন্য আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তী কালে দেখা গেছে যে—টেলিভিশন ফিল্মকে বিপদে ফেলে দেয় ঠিকই তবে যতটা ভয় বা উদ্বেগ ছিল শেষ পর্যন্ত ততটা হয়নি।

টেলিভিশনের দৌলতে আমরা দূরকে নিকট করেছি—পৃথিবীটা আমাদের ঘরের বৈঠকখানায় এনে পৌছিয়েছি। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে আমরা তাৎক্ষণিক ছবি প্রক্ষেপণ করতে সমর্থ হয়েছি। যেমন ক্রিকেট খেলা যখন ইংলন্ড বা অষ্ট্রেলিয়াতে চলে তখন সেই সময় সেই মুহূর্তে আমরা আমাদের ভারতীয় সময়ে ঐ ক্রিকেট খেলা ঘরে বসে দেখতে পারি। এই ধরনের প্রসারণকে আমরা ইংরেজিতে বলি LIVE—আজকাল হামেশাই এই LIVE কথা আমরা শুনে থাকি। টেলিভিশনের পরিভাষায় সরাসরি প্রক্ষেপণকে বলে LIVE TELECAST—বেতার বা রেডিওতে শব্দ প্রক্ষেপণকে বলা হ'ল BROADCAST।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে TV Camera বা তার কারিগরী যন্ত্রাংশের পরিভাষা বাংলায় সব পাওয়া যাবে না বা পাওয়া গেলে তা বোধগম্য হবে না তাই পরিভাষা বা Term এই প্রবন্ধে ইংরাজীতেই লেখা হবে।

আমাদের বিষয়বস্তু হ'ল—ভিডিও ক্যামেরা ও ভিডিওগ্রাফি।



Parts of the camera

Camera designs vary, but the following are typical facilities found in the video camera : 1. Microphone – electret unidirectional 2. Lens hood 3. Lens aperture (iris) – f/1.6 max 4. Focus control 5. Manual zoom control 6. Aperture control 7. White balance adjust; black adjust 8 Video gain (0 dB, 6 dB, 12 dB), color bars, camera standby/operate switch 9. Color compensation filter – 3200 K, 5600 K, 5600 K + 12.5% ND, closed 10. Viewfinder adjustable – 1.5 in (37 mm) with LED indicators 11 Power selection, intercom, audio monitoring jack 12. Camera back, VTR connector, video output camera cable, monitor video output, gen-lock connection for multi-camera setups 13. Eyepiece 14. Snap-on battery pack 15 Side of camera . mike input connector, external d.c. socket 16. Viewfinder controls 17. Power zoom switch 18. Auto-iris on/off

আজকে সাদাকালো টেলিভিশন আর কোথাও নেই বললেই চলে। রঙ্গীন টেলিভিশন আমেরিকাতে আবিষ্কৃত হয় ১৯৫১-৫৩ সালে। NTSC (National Television System Committee) পদ্ধতিতে তারা ৫২৫ লাইন দিয়ে শুরু করে। পরবর্তীকালে জাপান, কানাডা, ও মেক্সিকো এই NTSC-এর কারিগরী গ্রহণ করে ১৯৬০ সালে।

ফানকেন পশ্চিম জার্মানীর টেলি ল্যাবরেটরী এবং ইংলণ্ড-এর যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯৬৭ সালে এই NTSC কে আরো উন্নত করে তোল্য হয়। এই উন্নত কারিগরি বা পদ্ধতিকে বলা হয় PAL

(Phase Alternative Lines)। পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশই এই PAL প্রথায় টেলিভিশন সম্প্রচার করে থাকে। এবং তৃতীয় পদ্ধতি SECAM (Sequential Memory System) ১৯৫৯ সালে আবিষ্কৃত হয় ফরাসীদেশে। পরবর্তীকালে রাশিয়া ও হাঙ্গেরী এই SECAM প্রযুক্তি গ্রহণ করে। প্রথম দিকে সাদাকালো টেলিভিশনের সূত্রপাত ICONOSCOPE tube দিয়ে। ICON-এর অর্থ হ'ল দৃশ্য এবং SCOPE-এর অর্থ হ'ল পর্যবেক্ষণ করা, tube হ'ল টেলিভিশন ক্যামেরার প্রাণবিন্দু। এই tube এর মধ্যে যে ধাতুর পাত থাকে সেই পাতের উপর Lens এর সাহায্যে দৃশ্য প্রতিফলিত হয়। এই ধাতুর পাতকে বলা হয় mosaic। এই ICONOSCOPE এর উন্নত tube হ'ল Image Orithicon—এখনও Studioতেএই tube পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে গবেষণার ফলে যে সব tube আবিষ্কৃত হয়েছে—তা আকারে খুবই ছোট—এর ফলে সহজ-বহনযোগ্য অর্থাৎ Portable ক্যামেরা তৈরি হতে থাকে। বড় tube ক্যামেরায় তখন একমাত্র studioতেই কাজ করা হতো। আজ ছোট ক্যামেরা হওয়ার ফলে বড় ক্যামেরার চাহিদাও কমে যাচ্ছে। বর্তমানে ছোট ক্যামেরাতে কাজ করতে অনেক সুবিধা। যে সব tube উন্নত হয়েছে—তাদের নাম Vidicon, Plumbicon, Saticon–এসব tube তৈরি হবার আগে Image Orithicon tube সেই ১৯৪৫ সাল থেকে বহু বছর ধরে টেলিভিশন কারিগরীতে ব্যবহার হয়েছে।

Vidicon tube ১৯৫০ সালে ও Plumbicon tube ১৯৬২ সালে আবিষ্কৃত হয়—আকারে ২/৩"; ১", ১.২", ৪", ৫" লম্বায়—এই মাপকাঠিতেই বোঝা যায় যে এ সব tube কত ছোট আকার ধারণ করেছে। এ সব tube সাধারণত high resolution—কম আলোতে দৃশ্য ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে। এরপর আরো কিছু tube উন্নত হয় তবে সর্বদাই Vidicon tube এর মত কিছু কিছু জায়গায় তফাৎ আছে। এই tube হ'ল—NENVICON, CHELNICON বা PASECON।

ভিডিও টেপরেকর্ডার আবিষ্কৃত হওয়ার আগে Studio-ভিত্তিক সব অনুষ্ঠান LIVE হতো অর্থাৎ সরাসরি Studio থেকে সম্প্রসারণ করা হোত— অনুষ্ঠানে যদি ভুল ত্রুটি হতো তা আর সংশোধন করা যেত না—সেই ভুল দৃশ্য বা চিত্রটি টেলিভিশনে উপস্থিত হতো। বর্তমানে record করা অনুষ্ঠান edit (সম্পাদনা) করা সম্ভব। বর্তমানে কোন সঙ্গীতবহুল অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক সভা সমিতি বা খেলাধূলার অনুষ্ঠান এসব Studio-র বাইরে থেকে যখন সরাসরি সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন হয়—সেই সম্প্রসারণকে LIVE TELECAST বলা হয়—এ কথাটা আগেও একবার বলা হয়েছে। সব সময় যে record করা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয় তা নয়—এই recorded অনুষ্ঠানের সাথে সাথে সংবাদ বা ঘোষণা কিন্তু LIVE হয়ে থাকে Studio থেকে। সংবাদের মধ্যে যে সব দৃশ্য দেখানো প্রয়োজন সেসব দৃশ্য আগে থেকে ক্যামেরা ও রেকর্ডারের সাহায্যে তুলে এনে সম্পাদনা করা হয়—এবং সেই দৃশ্য ভিডিও টেপ-এ ধরে রাখা হয়—LIVE সংবাদ পঠনের মধ্যে মধ্যে সেই দৃশ্য বা চিত্র দেখানো হয়ে থাকে।

Studioতে যখন ইলেকট্রনিক ক্যামেরাতে শ্যুটিং চলে সেখানে একই সঙ্গে একের বেশী ক্যামেরা চালু থাকে—এই শ্যুটিং-এ যখন চার পাঁচটি ক্যামেরা নানান জায়গায় বসিয়ে দৃশ্যের শট নেওয়া হয়—একই সঙ্গে চালু থাকে সবকটি ক্যামেরা। এক এক ক্যামেরায় এক এক অ্যাঙ্গেলে ছবি, কার পর কোন ছবি যাবে সেটা তাৎক্ষণিক এডিট হচ্ছে ইলেকট্রনিক বোতামের সাহায্যে। এক্ষেত্রে টিভির ভূমিকা হ'ল তাৎক্ষণিক দৃশ্যটিকে তুলে ধরা এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে সেই দৃশ্যটি পৌঁছে দেওয়া। সেই একই দৃশ্যকে আবার ভিডিও টেপ করে ধরে রাখা যায়—

সেই রেকর্ডারকে বলে VTR বা Video Tape Recorder.

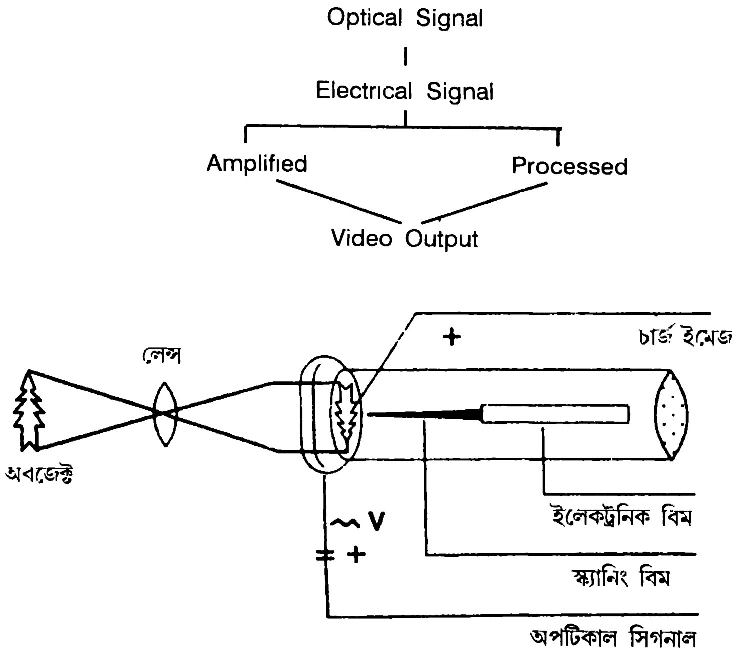
প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা Studio ক্যামেরাকে চারটি ভাগে ভাগ করে থাকি— ১. ক্যামেরা হেড ২. ক্যামেরা কেবল ৩. প্রসেসিং ইলেকট্রনিকস ৪. অপারেশনাল কনট্রোল প্যানেল।

১. ক্যামেরা হেড

এই ক্যামেরা হেড-এ আছে তিনটি অংশ : ক. ক্যামেরা টিউব খ. ভিউ ফাইণ্ডার গ. লেন্স।

ক. ক্যামেরা টিউব

ভিডিও ক্যামেরার প্রাণ বিন্দু হ'ল টিউব—এই টিউব-এর মধ্যেই তৈরি হয় ছবি যা আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই। এই tube-কে আমরা বলে থাকি Pick up tube বা Phototube বা ক্যামেরা টিউব। প্রথমে কোন দৃশ্য লেন্সের সাহায্যে এই ক্যামেরা tube-এ এসে পড়ে। সেই দৃশ্য কমবেশী আলো আঁধারিতে Photo-conductive, সে নিজে স্ক্যান (Scan)-এর মাধ্যমে সমতা রেখে তৈরি করে electrical signal অর্থাৎ বৈদ্যুতিক সংকেত। এই ভাবে আলোক দৃশ্য বা optical signal পরিবর্তিত হয় electrical signal-এ। এই সংকেত আরো সম্প্রসারিত হয় সম্প্রসারণ যন্ত্রের (Amplifier) সাহায্যে। এই দৃশ্য যখন টেলিভিশনে পৌছনর উপযুক্ত হয়ে ওঠে সেই সংকেত দৃশ্যকে বলা হয় video output.



Basic block of optical to electronic conversion

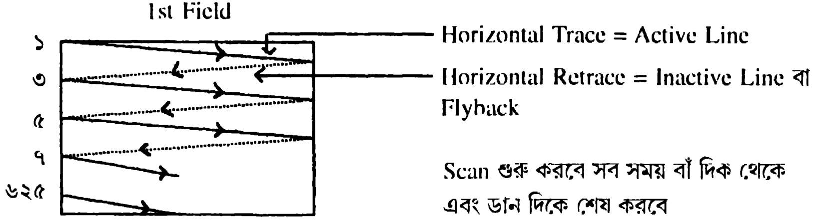
সাধারণত monochrome বা সাদাকালো টেলিভিশন ক্যামেরাতে একটি মাত্র Pick up tube থাকে যে একাই দৃশ্যের গুণাগুণ আলোছায়া বিচার করে দৃশ্যটি উৎপন্ন করে।

রঙ্গীন টেলিভিশন Camera-তে একটি-দুটি বা তিনটি Pick up tube থাকে।

SCANNING

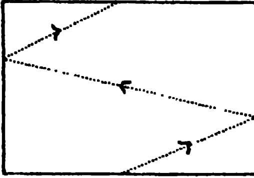
Scanning

টিভির স্ক্রীনে অসংখ্য সূক্ষ্ম রেখা বা লাইন দিয়ে ছবি তৈরি হয়। এই লাইনগুলোকে বলা হয় স্ক্যানিং লাইন। ছবির একটা ফ্রেম তৈরি হয় দুটো ভাগে। এক একটা ভাগকে বলা হয় ফিল্ড। একটা অড ফিল্ড এবং আরেকটা ইভেন ফিল্ড। এই প্রক্রিয়ার নাম ইন্টারলেস্‌ড্ স্ক্যানিং।



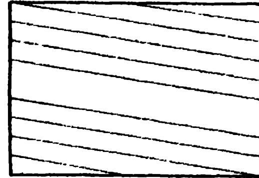
Scan শুরু করবে সব সময় বাঁ দিক থেকে এবং ডান দিকে শেষ করবে

Odd Lines



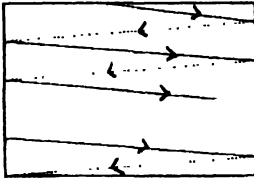
Inactive Lines – 1st vertical retrace

Trace করতে সময় লাগবে ৫২ মাইক্রোসেকেণ্ড এবং Retrace অর্থাৎ ফিরে আসতে সময় লাগবে ১২ মাইক্রোসেকেণ্ড

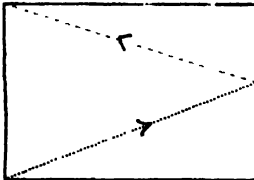


অড্ লাইন এবং ইভেন লাইন মিলে ১টা ফ্রেম

2nd Field



Even Lines



Inactive Lines – 2nd vertical retrace

Trace এবং Retrace মিলে অর্থাৎ ৫২ + ১২ = ৬৪ মাইক্রোসেকেণ্ড সময় লাগে একটা ফ্রেম Scan করতে

একটা ফ্রেম তৈরিতে অড লাইন দিয়ে শুরু হয় এবং এই লাইন একটা কৌণিক রাস্তা ধরে শুরু করে, সোজা পরপর লাইন তৈরি করে না—আগের ছবিটা লক্ষ করলেই বোঝা যাবে। আরো একটা ব্যাপার হচ্ছে এর শুরু কিন্তু বাঁ দিক থেকে ডান দিকে এবং ফ্রেমের মাঝখান থেকে শুরু হয়। যথাক্রমে ১-৩-৫-৭ এইভাবে পরের পর ৬২১-৬২৩-৬২৫-এ শেষ করে। শেষ যখন করে তখন লাইনটা ফ্রেমের মাঝে গিয়ে শেষ হয়। এই সমস্ত লাইনগুলো Horizontal পথে চলে। এরপর ৬২৫ লাইন যখন শেষ হয় তখন অড ফিল্ডে স্ক্যানিং সম্পূর্ণ। এরপর ঐ একই প্রক্রিয়ায় ইভেন ফিল্ডে শুরু হয় স্ক্যানিং—অড ফিল্ডের শূন্য স্থান পূরণ করার জন্য যেমন ২-৪-৬-৮ এইভাবে তখন কিন্তু ফ্রেমের মাঝখান থেকে শূন্যস্থান পূরণ করতে থাকে এবং শেষ করে ৬২০-৬২২-৬২৪টি রেখা বা লাইন-এ। এই অড ও ইভেন ফিল্ডে সমস্ত লাইন অর্থাৎ ১ থেকে ৬২৫টি যখন সম্পূর্ণ স্ক্যানিং হয় তখন আমরা ছবির একটা ফ্রেম পেয়ে থাকি। এই স্ক্যানিং লাইনকে বলা হয় Horizontal trace. ১ থেকে ৬২৫ টা লাইন অড বা ইভেন ফিল্ডে যে তৈরি হয় এই প্রত্যেকটি লাইনকে বলে active scan—এই লাইন দৃশ্য তৈরি করতে সাহায্য করে। আমরা সাধারণত এই ভাবে দৃশ্য দেখে থাকি।

অড ফিল্ডে ১ নং লাইন যখন বাঁ দিক থেকে শুরু করে ডান দিকে শেষ করবে এরপর ৩ নং লাইন তৈরি করার জন্য সে আবার বাঁ দিকে ফিরে যাবে—এই ফিরে যাবার সময় একটা লাইন তৈরি হয়—একে বলে Horizontal retrace—এই লাইন অর্থাৎ retrace লাইন আমরা কখনই দেখতে পাই না। এই retrace লাইনকে তাই বলা হয় Inactive Line.

প্রথম ফিল্ড অর্থাৎ অড ফিল্ডে যখন স্ক্যান সম্পূর্ণ হবে—লাইনটা নীচ থেকে উপরে উঠবে দ্বিতীয় ফিল্ড অর্থাৎ ইভেন ফিল্ডে—অড ফিল্ডের শূন্য স্থান পূরণ করার জন্য। এই যে লাইনটা নীচ থেকে উপরে উঠল—এই লাইনকে বলা হয় Vertical retrace। এই ভাবেই অড এবং ইভেন ফিল্ড-এ চলাচল করে পরপর দৃশ্যপট ফ্রেম তৈরি করতে থাকে।

অড এবং ইভেন ফিল্ডে স্ক্যানিং active line তৈরি করার সময় যখন retrace করে সেই গ্যাপ সময়টুকু অড এবং ইভেন ফিল্ডে যে সৃষ্ট হয় সেই সময়ের ফাঁকটিকে বলা হয় Blanking interval.

৫০ সাইকেল ফ্রিকোয়েন্সিতে দেখা যায় যে একটা সম্পূর্ণ ফিল্ড তৈরি হয় অর্থাৎ স্ক্যান করতে সময় লাগে ১/৫০ সেকেণ্ড। একটা ফ্রেম তৈরি হয় দুটো ফিল্ডের সাহায্যে অর্থাৎ ২. ১/৫০ সেকেণ্ড বা ১/২৫ সেকেণ্ড সময় লাগে—একটা ফ্রেম তৈরি হতে। ১ সেকেণ্ডে আমরা ২৫টা ফ্রেম পাই।

৬২৫ ২৫ বা ৩১২.৫ ৫০ = ১৫৬২৫ লাইন ১ সেকেণ্ডে হয়

১ লাইন স্ক্যান করে = ৬৪ মাইক্রো সেকেণ্ডে

২৫ ফ্রেম স্ক্যান করে = ১ সেকেণ্ডে

১ ফ্রেম স্ক্যান করে = ১/২৫ সেকেণ্ডে বা ৪০ মিলি সেকেণ্ডে

(১ মিলি সেকেণ্ড = ১/১০০০ সেকেণ্ড)

Blanking Interval-এর জন্য আমরা ৫০টা Horizontal line প্রতি frame-এ হারিয়ে থাকি ও বাস্তবে Scanning line প্রতি ফ্রেমে ৬২৫-৫০ = ৫৭৫ পাই।

স্ক্যানিং-এর trace-এর সময় হ'ল ৫২ মাইক্রো সেকেন্ড এবং retrace-এর সময় হ'ল ১২ মাইক্রো সেকেন্ড। Trace এবং retrace এ সময় লাগে ৬৪$_{\mu}$ Sec.

খ. ভিউফাইন্ডার

ক্যামেরার মাথায় সাধারণত এই ভিউফাইন্ডারের অবস্থান। লেন্সের সাহায্যে যে দৃশ্য ক্যামেরা

টিউবে এসে পড়ে সেই দৃশ্যই আমরা ভিউফাইন্ডারের সাহায্যে দেখতে পাই। এই ভিউফাইন্ডার না থাকলে ক্যামেরা পরিচালনা করা বা অপারেট করা দুরূহ — কারণ চোখে না দেখলে দৃশ্যটির ফোকাস করা বা দৃশ্য পরিধি ছোট বড় করা অসম্ভব। এই ভিউফাইন্ডার না থাকলে ক্যামেরা অচল এই কারণে যে —ছবি বা দৃশ্য ক্যামেরার মাধ্যমে রেকর্ড করা সম্ভব কিন্তু অন্ধের মত অপারেট করতে হয় —অর্থাৎ চোখ বন্ধ করে ছবি তুললে যা হয়। সুতরাং ভিউফাইন্ডার ক্যামেরার একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

ডাইক্রোইক মিরর বা প্রিজম

ডাইক্রোইক মিরর ব্যবহারের আগে, আলো লেন্সের মধ্য দিয়ে একটি পারা লাগান আয়নায় এসে পড়ে, ঐ আলো রিলে লেন্স ও অপটিক্যাল ফিলটারের সাহায্যে শেষে লাল, সবুজ ও নীল পিক আপ টিউবে এসে পড়ে। দেখা যাচ্ছে এই প্রক্রিয়াতে আলো যথেষ্ট নষ্ট হয়। এই নষ্ট হয়ে যাওয়া আলোর সমস্যা অনেকটা সমাধান হয় পরবর্তী উন্নত ডাইক্রোইক মিরর-এর জন্য। এই Dichroic মিরর বসিয়েও দেখা গেছে—হাওয়া ও গ্লাসের ব্যবধান কিছুটা থাকায় আলোর বিচ্ছুরণ নষ্ট হয়। এই প্রযুক্তি দিনে দিনে উন্নত হওয়ার ফলে দেখা গেছে ঐ মিরর-এর বদলে যদি প্রিজম বসান হয় তাহলে আলো পুরোটাই প্রতিফলিত হচ্ছে—এখানে হাওয়া ও গ্লাসের কোন ব্যবধান নেই—প্রিজম থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে সোজা টিউব বা চিপ্‌সে এসে পড়ছে। এতে আলো বা রং নষ্ট হচ্ছে না। এই প্রিজম প্রক্রিয়ায় আলোর প্রক্ষেপণ ক্ষমতা অনেক বেশী। বর্তমানে সমস্ত উন্নত ক্যামেরাতে এই ডাইক্রোইক প্রিজমের ব্যবহার চলছে।

গ. লেন্স

ক্যামেরার এটি একটি প্রধান অঙ্গ। এই লেন্সের মাধ্যমে সরাসরি আলোর সাহায্যে দৃশ্য ক্যামেরাতে এসে পড়ে। Zoom lens আমরা দেখেছি—এই লেন্স তিন প্রকারের Lens-এর সমন্বয়ে তৈরি অর্থাৎ Tele, Wide এবং Normal। এর একমাত্র সুবিধা হ'ল—একই লেন্সে প্রয়োজন মত Zoom-এর সাহায্যে দৃশ্য ছোট বড় করা যায় অতি অল্প সময়ে। এছাড়া ভিন্ন ভিন্ন লেন্স রয়েছে Tele, Wide ও Normal—এই তিনটে লেন্স একই বৃত্তে পর পর সাজানো থাকে। এক থেকে অপর লেন্সে সরাতে হলে ঐ বৃত্তের মধ্যে হয় বাঁদিক থেকে অথবা ডান দিক থেকে ঘুরিয়ে সঠিক জায়গায় আনতে হয়—একে বলে Turret Lens।

২. ক্যামেরা কেব্‌ল

এই কেব্‌ল সাধারণ Cable-এর মত নয়—একে বলে multicore cable—এই Cable-এর সাহায্যে Signal সাধারণত Processing electronics থেকে ক্যামেরা হেড-এ বহন করে আনা হয়, আবার এই Camera head থেকে ফিরে যায় Processing electronics-এ।

৩. প্রসেসিং ইলেকট্রনিকস্

এর কাজ হ'ল ভিডিও Signal-কে সরাসরি ক্যামেরা থেকে CAR-এ পাঠান। এই CAR হ'ল Central Apparatus Room, এর কাজ Camera থেকে যে Signal বা সংকেত উৎপন্ন হয় তা ক্রমশ উন্নত করে তোলা—এই উন্নত সংকেতকে বলে Composite Video Output Signal.

৪. অপারেশনাল কন্ট্রোল প্যানেল

Studio থেকে যে অনুষ্ঠান—তা উপভোগ্য করার জন্য যে সব প্রয়োজন—তা একটি ঘরে বসে

টিভি প্রযোজক—তিন/চারটি ক্যামেরা নিয়ে নানান কারিগরির সাহায্যে তৈরি করেন—ঐ ঘরটিকে বলা হয় PCR (Production Control Room)। এখানেই যাবতীয় কারিগরী আঙ্গিকে উৎপন্ন হয়—দৃশ্যাবলী। এখানকার উত্তম গুণাগুণ সম্পন্ন দৃশ্যাবলীকে বলা হয় Final Output Picture Quality.

এই PCR থেকে অনুষ্ঠানের প্রযোজক বা প্রডিউসার—তিন বা অধিক ক্যামেরা নিয়ে যখন Studio-তে অনুষ্ঠান প্রযোজনা করেন তখন তিনি একটি Switcher ব্যবহার করেন। এই Switcher-এর কাজ হ'ল এক ক্যামেরা থেকে অন্য ক্যামেরায় শট বদল করা। এই যন্ত্রের ভীষণ প্রয়োজন। এর সাথেই ছবির গুণ ও সমতার জন্য CCU সাহায্য করে (Camera Control Unit)। এর ফলে প্রত্যেক ক্যামেরা থেকে শটগুলো বাছাই করে তাৎক্ষণিক সম্পাদনা করা হয়। আজকাল ক্যামেরা আরো উন্নত হয়েছে—তার কারণ Tube এর বদলে প্রচলিত হয়েছে Solid State Technology, এক কথায় CCD, এর ফলে ক্যামেরার আকার অনেক ছোট—হাল্কা ও সহজে বহনযোগ্য (Portable) হয়েছে।

CCD হ'ল "Charge Coupled Devices"। এটি একটি ছোট সেমিকন্ডাক্টর (Semi Conductor)। এই ছোট আকৃতির বস্তুটি Tube-এর মতই অপটিক্যাল সিগন্যালকে পরিবর্তন করে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে। এই সেমিকন্ডাক্টর-এর সাইজ বা আয়তন অনেকটা আমাদের আঙ্গুলের নখের মত। Tube-এ যেমন নানান সার্কিট মিলিয়ে একটা বড় আকৃতি পেয়েছিল—এটা কিন্তু খুবই ক্ষুদ্র অথচ কর্মে বৃহৎ। এছাড়া এর ছবির গুণাগুণ অতি উত্তম—resolution অনেক বেশী।

CCD টেক্‌নোলজি আসার অনেক আগে Vidicon, Plumbicon ইত্যাদি Tube আবিষ্কার হয়। তখন থেকে ক্যামেরা কিন্তু অনেক ছোট আকৃতি ধারণ করেছিল—Studio ক্যামেরার থেকে অনেক ছোট হওয়ায়—বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য খুব সুবিধা হয়। তখনও আলো ও ছায়ার মাঝে দৃশ্য গ্রহণে খুবই অসুবিধা হত। এর সাথে সাথে উন্নত হয় ভিডিও রেকর্ডার—Low Band থেকে উন্নত হয় High Band-এ। ক্যামেরার ক্ষেত্রে কখনই High Band বা Low Band হয় না। এই High Band-এর সংমিশ্রণে যখন Solid State Technology যুক্ত হ'ল তখন Photography-এর দিক থেকে স্বল্প আলোয় উন্নত মানের ছবি তুলতে ক্যামেরাম্যানদের অনেক সুবিধা করে দিল।

¾" Umatic ক্যামেরা

Recorder-এ magnetic video tape যার সাইজ ¾" চওড়া। এই টেপ যখন চড়ানো (Load) হয় তখন recorder-এর Head-এ অনেকটা ইংরেজী U এর মত পাক খেয়ে সোজা হয়ে চলে —এই U এর মত হয় বলে একে বলে U-matic। এছাড়া এই Portable ক্যামেরা সংবাদ মাধ্যমের কাজে খুবই উপযোগী—সেই উদ্দেশ্যেই এই সব ক্যামেরা দিনের পর দিন উন্নত করা হচ্ছে। এই সব Camera-কে সাধারণত ENG অর্থাৎ Electronic News Gathering বলা হয়। এ ছাড়া অনুষ্ঠান কর্মসূচী প্রযোজনার জন্য EFP অর্থাৎ Electronic Field Production বলা হয়। এর ফলে নাটক, সিরিয়াল, সঙ্গীতবহুল অনুষ্ঠান যখন রেকর্ড করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন এই ENG / EFP Camera একমাত্র আদর্শ ক্যামেরা। এরপর Tube-এর জায়গায় স্থান নিয়েছে CCD টেকনোলজি।

জাপানের Sony কোম্পানী এরপর আরো একটি নতুন format-এর ক্যামেরা তৈরি করে যার নাম Betacam—এর ভিডিও টেপের সাইজ ১/২" চওড়া কিন্তু ১/২" কখনই VHS-এর সাথে তুলনা করা চলে না। এর উন্নত কারিগরী বিন্যাসের তুলনা করা চলে একমাত্র Profes-

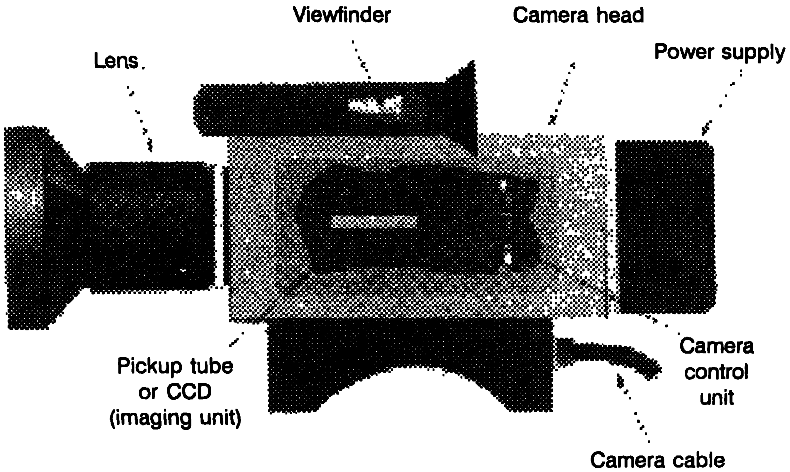
sional Quality Picture-এর সাথে। এই Betacam তৈরি হল একটাই Unit অর্থাৎ ক্যামেরা ও রেকর্ডার একসাথে—এইভাবে, আলাদা করে রেকর্ডার ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। ক্যামেরাম্যান একাই এই Betacam Operate করতে পারবে। এর জন্য আলাদা করে শব্দগ্রাহক (Recordist)-এর প্রয়োজন নেই। এই Betacam Unit থেকে recorder আলাদা করা সম্ভব, তখন এই Camera-কে সরাসরি সম্প্রচারণ অনুষ্ঠানে নিয়োগ করা যায়। যে রেকর্ডার ক্যামেরা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'ল এই recorder-কে camcorder বলে। এখন নতুন আরো একটা Technology চালু হয়েছে যার নাম—Digital.

ক্যামেরাতে যেসব ব্যবস্থা থাকে

ভিডিও প্রস্তুতকারকরা বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা রাখে ক্যামেরাতে। বর্তমান ক্যামেরাতে যে সব সুবিধা রয়েছে তাই নিয়ে এবার আলোচনা।

মূল functions এবং controls নিয়ে একটা লিস্ট দেওয়া হ'ল।

ক্যামেরা ON করার সাথে সাথে কি কি পরীক্ষা করা দরকার কারণ Studio-এর বাইরে অর্থাৎ Outdoor-এ শ্যুটিং করতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে ক্যামেরাতে কারিগরী দিক দিয়ে কিছু অসুবিধা দেখা দিচ্ছে তাহলে শ্যুটিংটাই নষ্ট হয়ে যাবে। গোলযোগ দেখা দিতেই পারে। সে ক্ষেত্রে করার কিছু নেই। তবে প্রত্যেক ক্যামেরাম্যানকে সতর্ক থাকতে হবে ক্যামেরা সম্বন্ধে। ঘরের বাইরে অর্থাৎ Outdoor Location-এ যাবার আগে ভাল করে দেখে নিতে হবে ক্যামেরা ঠিক আছে কিনা।



কি কি দেখা দরকার

১. ক্যামেরার ON / OFF Switch কাজ করছে কিনা
২. ক্যামেরা ON করে দেখে নিতে হবে—ব্যাটারি পুরো Charged আছে কিনা
৩. IRIS autoতে কাজ করছে কিনা
৪. Back focus ঠিক আছে কিনা
৫. Black / White balance হচ্ছে কিনা

৬. Video output থেকে ছবি বা দৃশ্য monitor-এ দেখা যাচ্ছে কিনা—এরপর সামান্য রেকর্ড করে তা আবার Playback করে দেখে নিতে হবে
৭. Return video-তে viewfinder-এ দৃশ্য VCR থেকে রেকর্ড করা দৃশ্য দেখা যাচ্ছে কিনা। এটা দেখতে হবে remote cable-এর সাহায্যে
৮. Viewfinder-এ brightness, contrast lable ঠিক কাজ করছে কিনা
৯. Shot gun বা Lappel-এ শব্দ রেকর্ড হচ্ছে কিনা
১০. ঐ শব্দ Head Phone-এ শোনা যাচ্ছে কিনা
১১. Servo motor যেটা Zoom lens-কে সক্রিয় করে তা কাজ করছে কিনা
১২. CCU cable, BNC / RF cable ঠিক আছে কিনা
১৩. Video / Audio-lable মিটারে দেখা যাচ্ছে কিনা
১৪. Gain Switch On করলে আলো বাড়ছে / কমছে কিনা
১৫. কালার বার কাজ করছে কিনা
১৬. ফিলটার রিং ঠিকমত ঘুরছে কিনা
১৭. রেকর্ডিং-এর সময় লাল আলো সংকেত দিচ্ছে কিনা। এ ছাড়া menu switch on করে অনেক information পাওয়া যায়—যদি কোন পরিবর্তন করতে হয় তবে ঐ menu থেকে তা পরিবর্তন করতে হবে। যেমন Pedestal হয়তো বেশী আছে তাতে ছবি বা দৃশ্য ধূসর হবে অর্থাৎ কনট্রাস্ট কম—menu-তে দেখে সেটাকে হয় OO বা প্রয়োজন মত নির্দিষ্ট মাপে নিতে হবে।

FUNCTION

ভিডিও ক্যামেরার ব্যাপারে একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে যে ফিল্ম ক্যামেরার মত ভিউফাইন্ডারে ছবি দেখা যায় না যতক্ষণ না ক্যামেরাতে ব্যাটারি দিয়ে বিদ্যুৎ চালু হচ্ছে।

POWER

প্রধান পাওয়ার সুইচ সাধারণত ক্যামেরার পিছনে থাকে। প্রত্যেকবার এই সুইচের সাহায্যে ক্যামেরা ON / OFF করতে হয়। বর্তমানে 537 / 637 Beta এদের সুইচ Lens ও ক্যামেরা বডির মাঝে নীচের দিকে রয়েছে। ক্যামেরাকে ON করতে গেলে নিজস্ব ব্যাটারি বা পাওয়ার য়্যাডাপটার লাগে অথবা VCR-এর সাহায্যে ক্যামেরা চালানো যায়। তবে ব্যাটারি মাঝে মধ্যে বদল করতে হবে কারণ অনেকক্ষণ চলার পর ব্যাটারির শক্তি কমে যায়। ব্যাটারি বদল করার আগে ক্যামেরার সুইচ OFF করে নিতে হবে।

PRE-HEAT / ON

এই সুইচ খুব দরকারী বিশেষ করে tube ক্যামেরার জন্য। পাওয়ার সুইচ যখন ON করা হয় তখন ক্যামেরায় আস্তে আস্তে সমস্ত সার্কিট চালু হয়। এই পজিশনকে বলা হয় Stand-by। এরপর Pre-heat সুইচ যখন ON পজিশনে যাবে তখন ক্যামেরার সমস্ত বিভাগে বিদ্যুৎ চালু হবে সেই সঙ্গে ক্যামেরা ছবি তোলার জন্য প্রস্তুত থাকবে। টিউব ক্যামেরাতে পাওয়ার অনেক বেশী লাগে অর্থাৎ ব্যাটারি খরচ হয় বেশী তাই এই টিউব ক্যামেরা ছবি তোলা হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে Pre-heat পজিশনে সুইচটা নিয়ে যেতে হবে যাতে ব্যাটারির বিদ্যুৎ খরচ কম হয়।

CCD ক্যামেরাতে Pre-heat-এ সুইচ থাকলে ভিউফাইন্ডারে ছবি দেখা যাবে এবং ভিউফাইন্ডার তখন Stand-by পজিশনে থাকবে। তবে কাজের মধ্যে প্রধান সুইচ ON / OFF করলে কোন

অসুবিধা নেই কারণ ON করার সঙ্গে সঙ্গে ছবি পাওয়া যায়। সে তুলনায় টিউব ক্যামেরা, প্রধান সুইচ ON করলে খানিকটা সময় নেবে—তাই Pre-heat পজিশনে রেখে কাজ করতে হয়।

PRE-HEAT / ON / CAM / VTR

এই ধরনের ব্যবস্থা থাকে ক্যামকর্ডারে। এ রকম যন্ত্রাংশে একটাই বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা (Power) থাকে যেখান থেকে ক্যামেরা এবং VCR-কে চালানো যায়। এছাড়া দুটো ON পজিশন হয়—একটাতে ক্যামেরা চালানোর জন্য এবং দ্বিতীয় পজিশন VCR চালানোর জন্য। যখন সুইচ ক্যামেরা পজিশনে তখন ক্যামেরার সব function চালু হয় এবং যখন সেই সুইচ VCR-এ থাকে, তখন ক্যামেরা ও VCR দুটোই বিদ্যুৎ পেয়ে থাকে। ক্যামেরা ছবি তৈরি করার জন্য প্রস্তুত থাকে আর VCR রেকর্ডিং করার জন্য Stand-by পজিশনে তৈরি।

VCR Start

মাল্টিকোর কেব্‌ল-এর সাহায্যে ক্যামেরা ও ভিসিআর যখন যুক্ত হয় তখন এই সুইচ-এর সাহায্যে ভিসিআরকে চালু করা যায়। এই সুইচ সাধারণত হ্যান্ডগ্রিপ-এ থাকে এবং ক্যামেরার সামনে অর্থাৎ লেন্সের নীচে বা কখনও ক্যামেরা বডির পাশে থাকে।

Colour Bars / Camera / DCC

সমস্ত ক্যামেরাতে এই কালার বার-এর ব্যবস্থা থাকে। এর সাহায্যে অন্যান্য যন্ত্রাংশ সঠিক টেস্ট সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন মনিটর-এ সঠিক রং পেতে হলে এই কালার বার-এর সাহায্য নিতে হয়। এছাড়া তা ব্রাইটনেস ও কনট্রাস্ট ঠিক করতে ক্যামেরাম্যানকে সাহায্য করে। নতুন ভিডিও টেপ-এ এই কালার বার দিয়ে সিগন্যাল রেকর্ড করা হয় সবার প্রথমে। পোষ্ট প্রোডাকশনের সময় ভিডিও লেভেল ঠিক করা হয়। যখন কালার বার ক্যামেরাতে সুইচ অন থাকে তখন কিন্তু ভিউফাইন্ডারে কোন ছবি পাওয়া যায় না। ছবি পেতে গেলে এই সুইচ বার থেকে ক্যামেরা পজিশনে নিয়ে যেতে হবে।

কিছু কিছু ক্যামেরাতে দেখা যায় যে এই কালার বার সুইচ অন করলে লেন্সে আইরিস (IRIS) নিজে থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

DCC ছবির মানকে উন্নত করে। আমরা Controls বিভাগে এ বিষয়ে আলোচনা করবো।

VTR ON / OFF

এই সুইচ অন/অফ-এর সাহায্যে VCR বা VTR রেকর্ডিং করা সম্ভব অর্থাৎ ক্যামেরা থেকেই VCR চালানো সম্ভব।

Return VTR

ক্যামেরাম্যান ক্যামেরার ভিউফাইন্ডারে VCR-এ তোলা ছবি বা রেকর্ডিং করা ছবি দেখতে পায়। মাল্টিকোর কেব্‌ল বা remote কেব্‌ল-এর সাহায্যে এই ছবি দেখা সম্ভব। Studio-তে বসে রেকর্ড করলে তা মনিটরের সাহায্যে দেখা যায় কিন্তু Outdoor-এ যেখানে ইলেকট্রিসিটি নেই সেখানে ব্যাটারির সাহায্যে কি রেকর্ডিং করা হ'ল সেটা দেখা একান্ত প্রয়োজন—তাই এই রিটার্ন ভিটিআর-এ এই ব্যবস্থা করা আছে।

Zoom Control Manual / Auto-Tele / Wide

এই Zoom lens সাধারণত চালনা করা যায় Servo motor-এর সাহায্যে বা মোটর ছাড়া হাতে ঘুরিয়ে। Servo motor-এর সাহায্য নিলে Zoom খুব সমান ভাবে চলতে থাকে তবে হাতের

চাপের উপর নির্ভর করছে। চাপ যদি বেশী হয় তবে খুব তাড়াতাড়ি Zoom হবে বা Wide হবে। এই Zoom বা Wide করতে গেলে lens-এর নীচে সিলেকটর রয়েছে—সেটা আগে বেছে নিতে হবে যে motor-এ চলবে না হাতে করতে হবে। এরপর lens-এর ডানপাশে রয়েছে কনট্রোল সুইচ, তাতে লেখা আছে Tele / Wide। এর একদিকে চাপ দিলে Tele হবে অর্থাৎ Zoom, অন্যদিকে চাপ দিলে Wide হবে।

IRIS Control Auto / Manual

Iris অর্থাৎ exposure দেওয়ার ব্যাপারে পুরোটা নির্ভর করছে আলো ওঠা নামার উপর। Zoom Control সুইচের পাশেই রয়েছে Auto / Manual। এ ছাড়া আরো একটা ছোট্ট গোল মত সুইচ আছে manual অবস্থাকে auto-তে নিতে গেলে ওটা চেপে থাকতে হবে। Auto অবস্থায় থাকলে আলোর ওঠা নামার অর্থাৎ আলো বাড়া কমার উপর iris নিজে থেকে খুলতে থাকে বা বন্ধ হতে থাকে। আর manual অবস্থায় থাকলে ক্যামেরাম্যান আলোর স্বল্পতা বা বৃদ্ধির উপর নিজের বিচার বুদ্ধিতে iris কন্ট্রোল করবে। এ ক্ষেত্রে যদি আলো বেড়ে যায় বা কমে যায়—iris কিন্তু এই একই মাপকাঠিতে থাকবে তবে সেই মুহূর্তে যদি ঐ ছোট্ট সুইচ চেপে রাখা যায় তবে Auto হবে। সেই সময় যখন চেপে রাখা হবে। ছেড়ে দিলে একটা জায়গায় এসে iris থেমে যাবে আলোর উপর নির্ভর করে।

Viewfinder / Auto / Camera

ভিউফাইণ্ডারের সাহায্যে আমরা ছবি দেখতে পাই ও সেই অনুসারে VCR-এ রেকর্ড করে থাকি। Auto বা VCR পজিশনে থাকলে যে ছবি রেকর্ড করা হয়েছে তা আমরা ভিউফাইণ্ডারে দেখতে পাই অর্থাৎ Playback করার ব্যবস্থা। এই সুইচ যখন camera পজিশনে থাকবে তখন আবার স্বাভাবিক অবস্থা অর্থাৎ আবার আমরা দৃশ্য বা ছবি দেখতে পাব এই ভিউফাইণ্ডারে।

Earphone

ক্যামেরাম্যান যদি নিজে রেকর্ডিং-এর সঙ্গে শব্দের মান জানতে চায় বা শব্দ ঠিক আছে কিনা জানার প্রয়োজন হয় তবে earphone-এর সাহায্যে সে শুনতে পারে। তবে সেই মাল্টিকোর কেব্‌ল যেন ক্যামেরা ও VCR-এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। শুধু রেকর্ডিং নয় প্লেব্যাকও শুনতে পারবে।

Viewfinder Controls

ক্যামেরাম্যান শট নেবার আগে এই ভিউফাইণ্ডারে ঠিকমত দেখা যাচ্ছে কি না দেখে নেবে, brightness এবং contrast ঠিকমত সেট করে না দিলে ছবির মান ভাল বোঝা যাবে না। ভিউফাইণ্ডার-এ brightness এবং contrast TV Set-এর মত বাড়ানো কমানো যায়। এতে manual-এ iris set করতে অসুবিধা হবে। সুতরাং এই ভিউফাইণ্ডার য়্যাডজাস্টমেণ্ট খুব দরকার। ভুল থাকলে ছবির মানও (quality) খারাপ হবে। ভিডিও ক্যামেরায় ভিউফাইণ্ডার সাধারণত সাদাকালো হয়ে থাকে। এতে adjust করতে অনেক সুবিধা হয়—বিশেষ করে brightness ও contrast। ভিউফাইণ্ডারে যে সব কনট্রোল থাকে তা হল—

১. Brightness ২. Contrast ৩. Sharpness / Peaking ৪. Eye piece focus ৫. Zebra

Brightness ও Contrast সাধারণত কালার বার সিগ্‌নালের সাহায্যে ভিউফাইণ্ডারে Set

করা হয়। প্রথমে brightness ও contrast সব off করে দিতে হবে। এরপর আস্তে আস্তে brightness adjust করতে হবে যে লেভেলে তোলা দরকার। এরপর contrast-কেও ঐ একই ভাবে চোখের সাথে সামঞ্জস্যে রাখতে হবে তার কালার বার-এর মাধ্যমে। এছাড়া কালার বার সুইচ অন্ করে আবার একটু adjust করতে হবে—এবার ভিউফাইণ্ডারে দৃশ্যপট যখন ভেসে উঠবে তখন ঐ দৃশ্যই হবে আদর্শ দৃশ্য।

আরো একটা ব্যবস্থা করা যায়—যদি পূর্বের তোলা ভাল দৃশ্য থেকে থাকে সেটাকে VCR-এর সাহায্যে Playback করে Camera-র viewfinder-এ ঐ ছবি ভেসে উঠলে সেই ছবি চোখের সাথে adjust করে নিতে হবে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে—এই ভিউফাইণ্ডার-এ যদি সুন্দর ছবি ভেসে ওঠেও সেটাই কিন্তু ছবির মান নয়। এটার উপর নির্ভর করে iris control করতে হবে প্রতি নতুন দৃশ্যের জন্য। ভিউফাইণ্ডার adjustment হ'ল—Brightness ও Contrast-এর মিলন।

CCU Cable Connector

ক্যামেরার সঙ্গে CCU কেব্‌ল যুক্ত হবে CCU Unit-এর সাথে অর্থাৎ Camera Control Unit—এই ইউনিটের কাজ হ'ল ক্যামেরাতে iris pedestal-কে কন্ট্রোল করা।

Camera Connector

এই কানেক্‌টার সাধারণত যুক্ত হয় VCR-এর সাথে। এই কানেক্‌টার হ'ল মাল্টিকোর কেব্‌ল।

Video Out

Cameraতে একটা সকেট আছে Video out। এর সাহায্যে ছবি মনিটরে দেখা যাবে। যে কেব্‌ল এই Video out থেকে মনিটরে যুক্ত হয়েছে তাকে বলা হয় BNC (Bottle Neck Cable)।

Battery Carrier

ক্যামেরার সাথে এটা যুক্ত থাকে— ব্যাটারি ধরে রাখার ব্যবস্থা আছে এর সাথে, আছে কানেক্‌শন।

DC Input Connector

বাইরে থেকে পাওয়ার যুক্ত করার ব্যবস্থা আছে—সে ক্ষেত্রে এই ব্যাটারি তখন কাজ করে না—নিজে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।

Microphone

ক্যামেরার ব্যাটারি রাখার নীচে microphone-এর আউটপুট রয়েছে—এক বা অধিক চ্যানেল রয়েছে—শব্দযন্ত্রী নিজে বেছে নেবেন কোন্ চ্যানেলে কি রেকর্ড করবেন।

Sharp / Peaking

কোন দৃশ্য যদি অল্প আলোয় তোলা হয় তবে ভিউফাইণ্ডারে ভাল করে দেখে নেওয়ার জন্য এই কনট্রোল দ্বারা ফোকাস করা হয়—ভাল করে দেখার জন্য। তবে যে ছবি রেকর্ড করা হবে তার সাথে ভিউফাইণ্ডারের ফোকাসের সম্বন্ধ নেই—আসল দৃশ্য ফোকাস হবে Lens-এর মাধ্যমে।

Eye Piece

প্রত্যেক ক্যামেরাম্যানের চোখের সাথে মিলিয়ে eye piece ফোকাস ঠিক করে নিতে হয়।

Zebra On / Off

Zebra সুইচ যখন On থাকবে তখন যদি দৃশ্যপটের কিছু অংশে সরু সরু লাইন দেখা যায়—তাহ'লে বুঝতে হবে ঐ অংশটুকু exposure বেশী হয়েছে অর্থাৎ সামগ্রিক লাইটিং-এর মধ্যে ঐ সব জায়গায় বেশী লাইট পড়েছে যার জন্য ঐ লাইন দেখা যায়। তবে যদি white balance-এর সময় ঐ সুইচ অন থাকে তবে সাদা কার্ডে যাতে কোন লাইন দেখা না যায় তারজন্য iris control করতে হবে।

Marker

ছবি বা দৃশ্যপট উপরে বা নীচে এমন কি দুপাশে যেন কেটে না যায় তার জন্য Frame line করা থাকে। এক এক ক্যামেরায় এক এক রকম ব্যবস্থা—ভিউফাইণ্ডার-এ এই Frame line থাকার দরুন ক্যামেরাম্যানের অনেক সুবিধা।

Viewfinder Indication

ভিউফাইণ্ডারে কি কি দেখতে পাওয়া যায় যার দরুন ক্যামেরাম্যান সতর্ক হতে পারেন পরবর্তী রেকর্ডিং করার জন্য :

১. Low light
ভিউফাইণ্ডার স্ক্রীনে একটা ছোট্ট লাল লাইট জ্বলে ওঠে তাতে বোঝায় যে দৃশ্যপটে লাইট কম অর্থাৎ লাইট বাড়াতে হবে নয়তো iris খুলতে হবে।

২. Battery end
ক্যামেরার ব্যাটারি বা VCR-এর ব্যাটারির শক্তি যদি কমে যায় তবে Low light-এর মত লাল ছোট্ট বাতি জ্বলতে থাকে।

৩. Tally light
ভিউফাইণ্ডারে এই ছোট্ট বাতি যখন জ্বলে উঠবে ক্যামেরাম্যান বুঝতে পারবেন যে তার তোলা ছবি রেকর্ডিং হচ্ছে। এ ছাড়া স্টুডিওতে শ্যুটিং চলার সময়ে যদি ঐ রকম লাইট জ্বলে ওঠে ক্যামেরাতে তা হলে বুঝতে হবে ছবি সরাসরি প্রসারণ হচ্ছে। ক্যামেরার সামনেও ঐ লাল বাতি জ্বলবে—শিল্পীকে বুঝিয়ে দেবার জন্য। Portable Camera-তেও ঐ একই ব্যবস্থা রয়েছে।

৪. Clock
কিছু কিছু ক্যামেরাতে ঘড়ির সময় ভিউফাইণ্ডারে ব্যবহার করা যায় এবং রেকর্ডিং-এও ঐ সময় রেকর্ড করা যায় দৃশ্যের সাথে।

৫. CG (Character Generator)
অনেক ক্যামেরায় এই CG-র ব্যবস্থা থাকে—এতে ক্যামেরাম্যানকে ক্যামেরার ব্যাপারে অনেক সাহায্য করে। এ সবই ভিউফাইণ্ডারে দেখা দেয়। এ ছাড়া সময়, স্থান-নাম ইত্যাদি বিষয় রেকর্ড করা যায়।

Pedestal / Black Level

Pedestal বা Black Level যদি কন্ট্রোল ফাংসানের সাহায্যে অদলবদল করতে হয় তবে viewfinder-এ তা দেখে নিতে হবে।

Iris

Over অথবা under exposure এমনকি high বা low light এই auto iris-এর সাহায্যে ভিউফাইণ্ডারে দেখে নেওয়া যায়।

Knee Low / High / DCC

Knee level set করার আগে DCC সুইচ অন করতে হবে এবং তা ভিউফাইণ্ডারে দেখা যাবে।

Audio

কিছু কিছু ভিউফাইণ্ডারে audio level-এর ব্যবস্থা আছে। রেকর্ডিং চলাকালে ক্যামেরাম্যান audio level নিজেই ভিউফাইণ্ডারে দেখে নিতে পারেন।

Gain

কম আলো থাকলে Gain Switch On করলে ভিউফাইণ্ডারের এক কোণে লাল রং জ্বলে উঠবে—অনেক সময় কত Gain দেওয়া হল সেই সংখ্যাও দেখা যায়।

Filter Selection

ভিউফাইণ্ডারে আমরা filter-এর নম্বর দেখতে পাই তাতে বোঝা যায় যে কোন filter নিয়ে আমরা কাজ করছি।

Colour Temperature

সব ক্যামেরাতে না হলেও 637 বা Beta Cam এসব Camera-তে Colour Temperature ভিউফাইণ্ডারে দেখায়। এতে ক্যামেরাম্যানদের খুবই সুবিধা হয়—সে বুঝতে পারে তার ছবিতে কি রকম রং রেকর্ড হচ্ছে।

Tape End / Tape Position

ভিডিও টেপ শেষ হয়ে আসার ২ মিনিট বাকি থাকতে ভিউফাইণ্ডারের এক কোণে ছোট্ট লাল বাতি জ্বলে ও নেভে। এমনি করে ক্যামেরাম্যানকে সতর্ক করে দেয় যে তার টেপ শেষ হয়ে আসছে—আর রেকর্ড করা যাবে না। কিছু কিছু ভিউফাইণ্ডারে এই বাতি না জ্বলে সেখানে টেপের মাপ অর্থাৎ কত ফিট বাকি আছে সেটা দেখাতে থাকে।

Black Stretch

Black Stretch সুইচ অন করলে তাও ভিউফাইণ্ডারে দেখিয়ে দেবে।

Shutter

Shutter Speed যে পজিশনে থাকবে তাও ভিউফাইণ্ডারে দেখিয়ে দেবে।

EVS

EVS সুইচ অন করলে আমরা ভিউফাইণ্ডারে তাও দেখতে পাবো।

Tone

কোন কোন ক্যামেরাতে audio tone (1 Kc) রেকর্ড করার ব্যবস্থা আছে। এই টোন রেকর্ড

করতে গেলে কালার বার সুইচ অন করতে হবে। ভিউফাইণ্ডারে আমরা 'Tone On' এটা দেখতে পাবো। এছাড়া কালার বার রেকর্ড করার সময় এই audio level ঠিক করে নেওয়া যায়।

এতক্ষণ আমরা ক্যামেরার ক্রিয়াকলাপ নিয়ে একটা তালিকা প্রস্তুত করেছি। এবার ক্যামেরার নিয়ন্ত্রণগত প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার।

Controls and their applications

ছবির গুণাগুণের জন্য অনেকসময় কিছু কিছু জিনিষ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। তার কিছু সরাসরি নিয়ন্ত্রিত হয়। সরাসরি ছাড়া অনেক সময় ফাংশন দ্বারাও নিয়ন্ত্রণ হয়।

নিম্নলিখিত সুইচগুলো ভিডিও ক্যামেরার সামনের প্যানেলে অবস্থিত।

Auto Centering

এটা সাধারণত ৩ টিউব ক্যামেরাতে বেশী প্রয়োজন হয়। ক্যামেরার সামনে auto centering card ধরতে হবে এবং এই সুইচ অন করলে ৩ টিউব নিজে থেকে সমান ভাবে কেন্দ্রবিন্দু এক করে দেয়—ছবি কখনই frame-এর কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরে যাবে না। সব টিউব ক্যামেরাতে auto centering ব্যবস্থা নাও থাকতে পারে।

W / B Black and White Balance

এই সুইচের সাহায্যে কালো বা সাদা ব্যালান্স করা হয়। কালার ক্যামেরাতে কালার ব্যালান্স করতে গেলে প্রথমে filter বেছে নিতে হবে প্রয়োজন অনুসারে—এরপর সাদা কাগজ বা কার্ড Lens-এর সামনে ধরতে হবে যেখানে আলো কার্ডে এসে পড়বে—এবং Lens যেন সাদা কার্ডের ১/৫ ভাগ অধিকার করে থাকে— frame-এর বাইরে যেন কোন অংশ দেখা না যায়—এই অবস্থায় White ব্যালান্স করতে হবে। এই ব্যালান্সে নীল ও লাল চ্যানেল সবুজ চ্যানেলের সাথে নিজেরা নিজেদের এ্যামপ্লিচুড (amplitude) য়্যাডজাস্ট করে নেয়।

Black Balance

White Balance করার আগে Black Balance করা প্রয়োজন। ৩ টিউব ক্যামেরা বা CCD ক্যামেরার চিপস্‌কে Black level-কে একটা level-এ নিয়ে আসতে হয়। এই ব্যালান্স করার সময় হয় iris বন্ধ করতে হবে নয়তো lens-এ ঢাকনা দিতে হবে যাতে কোন আলো যেন কোন ভাবেই পিক আপ (Pick up) এর ফেস্ প্লেটে না পড়ে। অনেক সময় ছবির ছায়া (Shadow) অংশে কিছু কিছু রং দেখা যায়—এতে বুঝে নিতে হবে যে Black balance ঠিক মত হয়নি।

W / B Auto (A / B) / PRE-SET

White balance করার সময় এই সুইচ Auto পজিশনে থাকবে। অনেক ক্যামেরাতে ২টো white balance মেমারি পজিশন আছে—'A' এবং 'B'। আলোর তারতম্যে ২ রকম White Balance করা যায়। যেমন Outdoor-এ খুব প্রখর আলোয় 'A' পজিশনে এবং স্বল্প আলো বা ছায়া ঘেরা জায়গায় 'B' পজিশনে white balance করে মেমারিতে রাখা যায়। Pre-set-এ আলাদা করে white balance করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ ক্যামেরা তৈরির সময় কালার টেম্পারেচার 3000-3200 বা 5600^0 K ধরে White Balance করা থাকে।

Filter Section Ring

প্রত্যেক ক্যামেরাতে এই filter-এর ব্যবস্থা থাকে। কোন্ কালার টেম্পারেচারে কাজ হবে সেই

মত filter বেছে নিতে হবে। ক্যামেরার বাঁ পাশের প্যানেলে সাধারণত ১,২,৩,৪ নম্বর দেওয়া থাকে—আলোর তীব্রতার উপর নির্ভর করে এবং কেলভিন বা কালার টেম্পারেচার কত দরকার সেই মত নম্বর ঘুরিয়ে—প্রয়োজনীয় filter বেছে নিতে হবে। যেমন ২ নম্বর filter নিলে দেখা যাবে ২ এর উপর ১ ও নীচে ৩ নম্বর দেখাচ্ছে। এইভাবে যখন প্রত্যেক নম্বর ঘুরবে তখন ঐভাবে কম নম্বর উপরে ও বেশী নম্বর নীচে থাকবে।

MENU / Function Selection Switch / Status

ঐ সুইচ অন করলে—যে সব function ক্যামেরাতে আছে তা ভিউফাইণ্ডারে দেখা দেবে—যে সব function দরকার বা দরকার নয়—তা ছবি তোলার শুরুতে প্রয়োজন মত সেট করে নিতে হয়।

Pedestal / Black Level

যে ছবি বা দৃশ্য ভিডিও ক্যামেরার সাহায্যে রেকর্ড করি সেই দৃশ্য সাধারণত এই Pedestal এর উপর বসে—যদি আমরা বলি Pedestal হ'ল বসার চেয়ার—এর উপর ঐ দৃশ্য বসবে—তবেই আমরা দৃশ্যকে সুন্দর ভাবে দেখতে পাবো। ছবি বা দৃশ্যে কনট্রাস্ট নির্ভর করে এই Pedestal-এর উপর। যদি কোন সিগ্ন্যাল Pedestal Level-এর নীচে নেমে যায় তবে সেই দৃশ্য কার্যত দেখা যাবে না। যদি Pedestal-এর level বাড়ানো যায় অর্থাৎ উঁচু level-এ ওঠানো যায় তাহলে সমস্ত দৃশ্যই উঁচু level-এ উঠবে—এর ফলে দৃশ্যের ছায়া অংশ অর্থাৎ dark অংশ অনেকটা ধূসর অর্থাৎ Grey দেখাবে। আর Pedestal level নীচের দিকে নামিয়ে আনলে দৃশ্যের মিড টোন ক্রমশ লুপ্ত হবে। Pedestal level-এর ওঠা নামাতে দৃশ্যের ছায়া অংশ বা shadowpart পরিবর্তন হয়—এতে highlight-এর অংশে খুব একটা হেরফের হয় না। অনেক ক্যামেরাতে আবার master pedestal স্ক্রু রয়েছে যার সাহায্যে এই level কমানো বাড়ানো যায় কিন্তু ভিউফাইণ্ডারে কোন কিছু দেখা যাবে না—সে ক্ষেত্রে wave-form monitor-এর সাহায্যে level স্থির করতে হবে। কিছু ক্যামেরাতে Push Button-এর মাধ্যমে Master Pedestal-এর level পরিবর্তন করা যায়—এই level কমানো বাড়ানো ভিউফাইণ্ডারে দেখা যায়। এই Pedestal level পরিবর্তন করা মানেই Black level-কে বাড়ানো কমানো। সাধারণত যে কোন দৃশ্যের flat টোন, কম কনট্রাস্ট যদি থাকে তবে এই Pedestal বা Black level-কে পরিবর্তন করতে হয়—অর্থাৎ কনট্রাস্ট প্রয়োজন মত বাড়ানো কমানো হয়। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে—Pedestal level পরিবর্তন করে কনট্রাস্ট সৃষ্টি হয় ঠিকই তবে দৃশ্যের ছায়া অংশে detail হারিয়ে যায়।

ABL (Automatic Black Level)

ABL হ'ল Automatic Black Level। ABL সুইচ যদি On করা হয় তবে এই Black Level নিজে থেকে যে Black Level-এ থাকা দরকার সেই Level-এ এসে দাঁড়াবে। তবে white level-এ কখনই বিঘ্ন ঘটাবে না। এই ABL হ'ল অনেকটা Pedestal Level-এর কার্যক্রম। Black Level সাধারণত একটা নির্দিষ্ট level-এ থাকে, যদি কোন দৃশ্যে কালো বা Black level উঁচু বা নীচুর দিকে থাকে তবে এই ABL সুইচ অন করা হলে তা নিজে থেকে সেই নির্দিষ্ট level-এ কালো বা Black level-কে এনে দেবে।

DCC (Dynamic Contrast Control)

DCC হ'ল ডাইনামিক কনট্রাস্ট কনট্রোল। এর কাজ হ'ল কোন দৃশ্যে over exposed অংশের

brightness নিয়ন্ত্রণ করা। এই DCC সাধারণত ২½ স্টপ over exposed অংশকে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়। এই DCC মিডল টোন বা ছায়া অংশকে খুব একটা পরিবর্তন করে না।

Knee Low / High

এই Knee দৃশ্যকে যে সংশোধন করে তা DCC-র আরেক রূপ।

Black Stretch

এই Black Stretch-এর কাজ হ'ল ছায়া অংশকে খানিকটা হাল্কা করে তার detail বার করা। তখন দৃশ্যে ছায়া অংশ অনেকটা ভাল দেখা যায়। এই Black Stretch কিন্তু highlight বা মিড টোনকে নষ্ট করে না।

Gamma

দৃশ্যের টোনের দিক দিয়ে যদি কোন আমূল পরিবর্তন দেখা যায় তবে বুঝতে হবে Gamma পরিবর্তন হয়েছে। সাধারণত Gamma ভিডিও রেকর্ডিং-এ 0.45 পজিশনে রাখা উচিৎ সমস্ত ভিডিও ক্যামেরাতে। Gamma বাড়ানো মানে দৃশ্যে ছায়া অংশের detail হারাবে এবং Gamma কমানো মানে দৃশ্যে highlight detail হারাবে। Gamma পরিবর্তন করা হলে মনে রাখতে হবে ল্যুমিন্যান্স (Luminance) এবং ক্রমিন্যান্স (Chrominance) সিগনালে গণ্ডগোল দেখা দেবে।

Contour

এই সুইচ অন করলে সাধারণত সমস্ত দৃশ্যের detail উন্নত করে।

50 / 60 Cycles

ফ্রিকোয়েন্সির উপর নির্ভর করছে এই সাইকেল।

Shutter

সাধারণত CCD ক্যামেরাতে এই Shutter System দেখা যায়। Active field থেকে Storage area-তে ট্রান্সফার টাইম যদি পরিবর্তন করতে হয় তবে এই Shutter প্রয়োজন। Shutter টাইম যদি কমানো যায় তবে দৃশ্যের শার্পনেস অনেকটা বেড়ে যায়। Shutter Speed সাধারণত ১/৬০ সেকেণ্ড, ১/১২৫ সেকেণ্ড, ১/২৫০ সেকেণ্ড, ১/৫০০ সেকেণ্ড, ১/১০০০ সেকেণ্ড এবং ১/২০০০ সেকেণ্ড হয়। যদি রেকর্ড করা দৃশ্য স্লো মোশনে চালানো হয় তবে সমগ্র দৃশ্যের শার্পনেস স্পষ্ট দেখা যায়। HMI, Computer, Monitor অথবা রেকর্ড করা দৃশ্য পুনরায় রেকর্ড করতে গেলে Shutter Speed-কে নির্দিষ্ট জায়গায় আনতে হবে নয়তো flickering অর্থাৎ কাঁপাকাঁপা ছবি থেকে যাবে।

Gain

স্বল্প আলোয় যখন রেকর্ডিং করা সম্ভব হচ্ছে না সেই সময় এই Gain সুইচ অন করলে পুরো দৃশ্য amplify হয়। এই Gain Signal কয়েকটা ধাপে পাওয়া যায়। যেমন— –6 db, –3 db, 3 db, 6 db, 9 db, 12 db এবং 18 db। Gain বাড়ালে সাধারণত ছবির মান (Quality) অনেকটা খর্ব হয়। কারণ এই amplify করার দরুন ছবিতে grain পরিলক্ষিত হয়। এই grain বা noise সাধারণত dark portion বা ছায়া অংশে বোঝা যায়। 6db বাড়ালে সাধারণত ১

স্টপ exposure বেড়ে যায়। News Coverage-এ স্বল্প আলোয় এই Gain ব্যবহার করা যায়। কারণ Gain হ'ল multiplying factor. এটা পজিটিভ Gain-এর ব্যাপারে, পুরো সিগনাল দৃশ্যকে amplify করছে।

নেগেটিভ Gain-এর ব্যাপারে exposure যেখানে দৃশ্যে অনেক bright light রয়েছে তাকে নীচের দিকে কমিয়ে আনে—এতে grain বা noise অনেক কমে আসে এবং depth of field-কে আয়ত্তে আনা যায়।

Auto Gain

কিছু কিছু ক্যামেরাতে Auto Gain-এর ব্যবস্থা থাকে। 18 db পর্যন্ত gain উঠতে পারে।

Turbo Gain

এই Turbo Gain-এ আমরা সাধারণত 24db পেয়ে থাকি।

S-C. Phase

একটা ভিডিও আউটপুট থেকে ভিশন মিক্সার (vision mixer)-এর মধ্য দিয়ে একের বেশী ক্যামেরাতে যখন কোন দৃশ্য রেকর্ড করা হয় তখন সব ক্যামেরার রং এই Sub-Carrier phase সমান রক্ষা করে। যদি Sub-Carrier phase ক্যামেরাগুলোকে এক করতে না পারে তবে এক একটা ক্যামেরাতে এক এক রং দেখা দেবে।

H. Phase

এক বা বহু ক্যামেরা নিয়ে রেকর্ড করতে গেলে এই H. Phase-এর সুইচ অন করে Horizontal phase ঠিক থাকে অর্থাৎ দৃশ্য কখনও বাঁ বা ডান দিকে সরে যাবে না।

Gen Lock

একের বেশী Camera নিয়ে দৃশ্য রেকর্ড করতে গেলে কিছু কিছু অসুবিধা হয়। S-C Phase-এ যেমন রং-এর সমস্যা হয় তেমনি এখানে Scanning-এর সমস্যা। Gen Lock না হলে দৃশ্যের প্রতিটা frame লাফাতে থাকবে। অর্থাৎ এক ক্যামেরা থেকে অন্য ক্যামেরাতে ভিশন মিক্সারের সাহায্যে edit করতে গেলে এ সমস্যা হবে। এখানেও কিন্তু ঐ একটা ভিডিও আউটপুট ব্যবহার করা হয়। Gen Lock-এর দ্বারা দুই ক্যামেরাকে Synchronize করা যাতে ঐ সমস্যা দেখা না দেয়।

Multi-Core Camera Cable

এই কেব্‌ল যখন ক্যামেরা ও ভিসিআর-এর সঙ্গে যুক্ত হয় তখন অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। নীচে সুবিধাগুলি দেওয়া হ'ল :

১. Remote-এর সাহায্যে ভিসিআর চালু করা যায়।

২. রেকর্ড করা দৃশ্য ভিসিআর থেকে ক্যামেরা ভিউফাইণ্ডারে দেখা সম্ভব।

৩. ক্যামেরার ভিউফাইণ্ডারে টেপ যদি শেষ হয়ে আসে তার সঙ্কেত মেলে।

৪. ভিসিআর-এর ব্যাটারির আয়ু শেষ হয়ে এলে তার সঙ্কেত ভিউফাইণ্ডারে ধরা পড়ে।

৫. এই Cable-এর সাহায্যে ক্যামেরাকে চালু রাখা যায় অর্থাৎ ভিসিআর থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব।

৬. মাইক যখন ক্যামেরাতে যুক্ত হয় তখন এই Cable-এর সাহায্যে ভিসিআর-এ শব্দ পৌঁছে যায়।

৭. ভিসিআর থেকে যখন ছবি চালানো হয় তখন ক্যামেরাতে earphone-এর সাহায্যে শব্দ শোনা যায়।

৮. ভিসিআর যদি কোন কারণে অচল হয় তবে ক্যামেরাতে তা ধরা পড়ে।

Lens Controls

Focusing Ring

ক্যামেরাতে যখন Zoom lens ব্যবহার করা হয় তখন তার ফোকাস ভীষণ প্রয়োজন। প্রথমে Zoom করে অর্থাৎ Tele অবস্থায় ফোকাস করে নিতে হয় ফোকাস রিং-এর সাহায্যে। এরপর Zoom যদি আগু পিছু করা হয় তাতে ফোকাস-এর কোন বিঘ্ন ঘটে না।

যদি উপরের প্রথায় ফোকাস না করা হয় তবে Zoom lens-কে এগিয়ে নিলে শার্প ফোকাস থাকবে না তবে Zoom পিছিয়ে নিলে অর্থাৎ wide angle পজিশনে এলে এর ফোকাস হের-ফের হয় না অর্থাৎ ফোকাস থাকে, তার কারণ depth of field-এর জন্য কিন্তু যেই মুহূর্তে Zoom-in হবে তখন ফোকাস থাকবে না।

Zoom

Zoom lens-এর সুবিধা হল দৃশ্যের Subject থেকে ক্যামেরার দূরত্ব পরিবর্তন না করে lens-কে আগুপিছু করে প্রয়োজন মত Image Size ছোট বড় করা যায়। এই Zoom-কে Servo motor-এর সাহায্যে সমান তালে চালনা করা যায় আবার motor ছাড়া হাতেও সুন্দর ভাবে একে ব্যবহার করা যায়।

IRIS

Lens-এর মধ্য দিয়ে যে আলো ক্যামেরাতে প্রবেশ করে তার একটা মাপ আছে। কম বেশী আলোর প্রবেশ পথ হ'ল iris.

Back Focus

Lens-এর শেষ অংশ এবং Focus Plane-এর দূরত্ব সেটাই হ'ল Back focus। যদি এই দূরত্বটা ঠিক মত না থাকে তবে ফোকাস থাকবে না। বিশেষ করে wide angle lens-এ। তবে narrow angle lens-এ অতটা ফোকাস ধরা পড়ে না। Zoom lens-এ যদি wide angle lens পজিশনে রাখা হয় তাতে এই ফোকাস যে ঠিক নেই তা ধরা পড়ে। এর কারণ হ'ল depth of focus এই wide angle lens-এ পাওয়া যায় না।

Back focus কি ভাবে করতে হয় তার কয়েকটা নিয়ম দেওয়া হ'ল—

১. ক্যামেরাকে এমন জায়গায় ব্যবহার করতে হবে যেখানে খুব ভালো ভিডিও level পাওয়া যায় এবং iris কার্যত একদম খোলা থাকবে।

২. Black and White balance করে নিতে হবে।

৩. সাদাকালো মনিটরে ক্যামেরার সাথে সংযোগ করতে হবে।

৪. High Contrast সমেত একটা object বেছে নিতে হবে যার শার্প লাইন পাওয়া যাবে এবং দূরত্ব ১০ ফিটের বেশী হবে না।

৫. Zoom-in করে ফোকাস করতে হবে সেই object-কে।

৬. এরপর Zoom-out করতে হবে যতটা wide করা যায় এবং তখন যদি ধরা পড়ে যে

Image বা Object ফোকাস পাওয়া যাচ্ছে না তখন back focus-এর ring আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে Image ফোকাস করতে হবে।

৭. এরপর আবার Zoom-in করে আরো একবার দেখা দরকার যে ফোকাস ঠিক আছে কিনা। যদি ঠিক না হয় তবে ৬নং আবার ব্যবহার করতে হবে।

R-G-B

আলোর বিক্ষেপণের দরুন আকাশের রং নীল। সূর্যকিরণ যখন বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যায় তখন বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাসের অণু ছড়িয়ে পড়ে। বেগুনী আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (wave length) লাল আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ৭/৮ গুণ বেশী তার জন্য লাল আলোর বিক্ষেপণ অপেক্ষা বেগুনী আলোর বিক্ষেপণ অনেক বেশী। সূর্য থেকে দূর আকাশের কোন অংশের দিকে তাকালে ঐ অংশ থেকে যে আলো আমাদের চোখে এসে পড়ে তাতে বেগুনী ও নীল রং-এর পরিমাণ অন্যান্য রং-এর তুলনায় অনেক বেশী থাকে। যার ফলে আকাশকে নীল দেখায়।

আলো কখনই চোখে দেখা যায় না। আমাদের পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলে অসংখ্য অণুর বিচরণ— এই সব অণুর সাহায্যে আলো বিক্ষিপ্ত হয়ে পৃথিবীতে আসে। সোজা কথায় বলতে গেলে যে কোন জিনিষে এই আলো যখন বাধা পায় তখন ঐ বাধার ফলে ঐ বস্তু আমরা আলোর সাহায্যে দেখতে সমর্থ হই। আলো সঞ্চালিত হয় অসংখ্য ধূলিকণার মাধ্যমে। ঐ প্রতি ধূলিকণায় বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় আমরা আলোকে দেখতে পাই।

রঙ্গীন টেলিভিশনে সাধারণত রেড, গ্রীণ ও ব্লু এই তিনটি প্রাথমিক রং-এর মিশ্রণ থাকে TV Camera Tube-এ। সূর্যের আলোতে সাধারণত ৭টা রং মিশ্রিত থাকে। সূর্যের সাদা রং থেকে এক একটা রং আমরা আলাদা করে দেখতে পারি। যেমন সর্যের আলোর সামনে যদি একটা Prism রাখা যায় তবে ঐ আলো Prism-এর মধ্য দিয়ে অপর প্রান্তে প্রতিফলিত হয় তখন ৭টা রং আমরা দেখতে পাই— যেভাবে রামধনুর ৭টা রং আমরা আকাশের গায়ে দেখতে পাই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এক একটা রংকে আমরা কী ভাবে দেখবো—যেমন ধরা যাক সবুজ রং-এর কোন জিনিষ যখন আমরা দেখতে পাই তার মানে সবুজ রং ছাড়া আর কোন রং আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কেন অন্য রং দেখতে পাই না? সবুজ রং তখনই দেখতে পাবো যখন বস্তু সাদা আলোর সব রং শোষণ করেছে শুধু সবুজ রং ছাড়া অর্থাৎ সবুজ রং শোষণ করতে পারে নি। শুধুমাত্র এই সবুজ রং তখন আমাদের চোখে প্রতিফলিত হয়। তাই সবুজ রং-এর জিনিষ আমরা দেখে থাকি। এই ভাবেই বাকী সব রং লাল, নীল, হলুদ, বেগুনি ইত্যাদি আমরা দেখতে পাই।

Studio ক্যামেরাতে যে ৩টি টিউব আছে—তার প্রত্যেকটি একটি করে প্রাথমিক রঙের টিউব। এই রঙ্গীন টিউব হল—লাল, সবুজ এবং নীল—আমাদের কাছে খুব পরিচিত শব্দ RGB। এই তিন রং-এর সংমিশ্রণে Signal উদ্ভূত হয়—কিন্তু সাদাকালো টিভিতে আমরা যে দৃশ্য পাই তা সাধারণত এই রঙ্গীন Signal—grey scale-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সাদাকালোতে দৃশ্যমান। এই উদ্ভূত Signal-কে সাধারণত বলা হয় Y Signal বা ল্যুমিন্যান্স সিগন্যাল। সাধারণত আমাদের চোখে আলোর যে উজ্জ্বলতা ধরা পড়ে তাকেই আমরা আলোর ল্যুমিন্যান্স বলে থাকি। এই উজ্জ্বলতা বা ব্রাইটনেস বাদ দিয়ে বর্ণের অন্য সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় ক্রমিন্যান্স সিগন্যাল থেকে।

ল্যুমিন্যান্স সিগন্যাল Y = 30% Red + 59% Green + 11% Blue। হলুদ এবং সবুজ

wave length আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় সবার আগে। যার জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সবুজ Signal-ই ব্যবহার করা হয়। এই Signal কিন্তু সাদাকালো টিভি সেটে grey scale তৈরি করে। অর্থাৎ রঙ্গীন দৃশ্য সাদাকালোতে নানান tone-এ পাওয়া যাবে।

ছবি তোলার ক্ষেত্রে সাধারণত দু রকম পদ্ধতিতে রং উৎপন্ন হয়। একটা হ'ল Subtractive mixing এবং অন্যটা হ'ল Additive mixing.

Subtractive mixing :

লাল, নীল ও সবুজ ছাড়া বাকী তিনটে রং হ'ল এই রং-এর Complement. যদি নীল রং সাদা রং থেকে তুলে নেওয়া হয় তবে আমরা হলুদ রং পাবো অর্থাৎ লাল ও সবুজের মিশ্রণ। এই ভাবে magenta (লাল ও নীলের মিশ্রণ) অর্থাৎ Complement of Green এবং cyan (নীল ও সবুজের মিশ্রণ) অর্থাৎ Complement of Red.

এই yellow, magenta এবং cyan এই তিনটে রংকে বলা হ'ল Secondary or Subtractive primary mixing.

Additive mixing :

লাল, নীল ও সবুজ এই তিনটি রং-এর আলো যখন মিশ্রিত হয় তখন উৎপন্ন হয় সাদা আলো। এই রং অর্থাৎ নীল, সবুজ ও লালকে মুখ্য বা primary বা additive colour primaries বলা হয়। কারণ এই সাদা রং উৎপন্ন হচ্ছে এক একটা রং-এর সংমিশ্রণে। তাই একে বলা হয় Additive colour mixing.

সাধারণত রঙ্গীন টেলিভিশনে এই additive mixing প্রচলিত। এই additive প্রথার প্রাথমিক বা মুখ্য রং হ'ল—লাল, সবুজ ও নীল। গৌণ রং হ'ল Yellow, Magenta এবং Cyan। এই তিনটে রং মুখ্য রং থেকেই উৎপন্ন হয়। মুখ্য রং Red, Green এবং Blue-র মিশ্রণে যেমন সাদা (white) রং উৎপন্ন হয় সেই রকম yellow magenta ও cyan-এর একত্রে মিশ্রণ হ'লে কালো রং উৎপন্ন হয়।

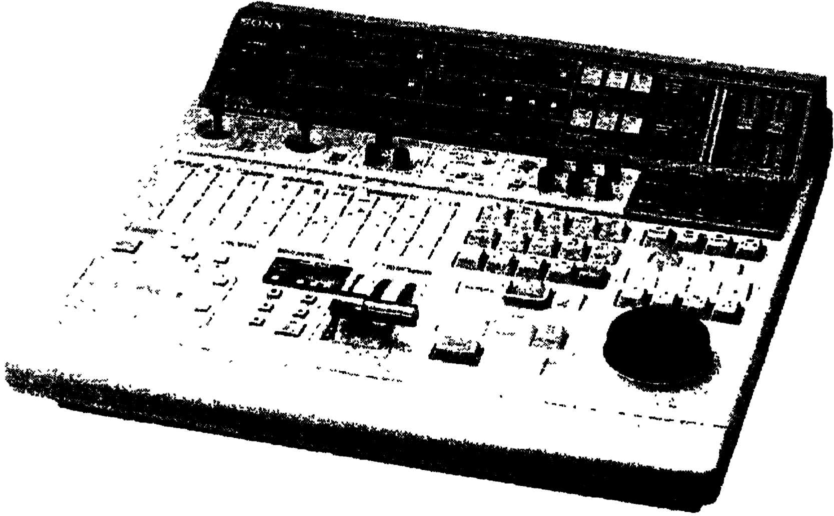
প্রত্যেক রঙ্গীন আলোর মান শতকরা কত ভাগ তা নির্ণয় করা হয় Colour Temperature-এর মাধ্যমে।

সাদা আলোর মান 100%; Red 30%; Green 59%; Blue 11%; Yellow 89%; Magenta 41%; Cyan 70% এবং Black 0%।

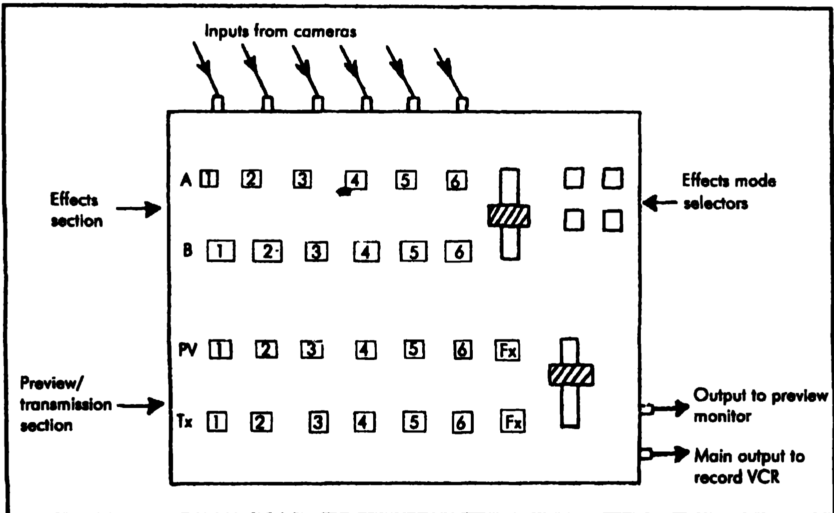
Colour Temperature

যখন কোন কৃষ্ণ পদার্থ যার কোন রশ্মি বিকিরণ করার ক্ষমতা থাকে না অথচ সেই পদার্থকে যদি উত্তপ্ত করা হয় তবে বিভিন্ন তাপমাত্রার সাথে নানান ধরনের রং পরিলক্ষিত হয়। তাপমাত্রা যখন উঁচু পর্যায়ে ওঠে তখন নীল বর্ণ দেখা দেয়—ঠিক সেই ভাবেই যখন তাপমাত্রা নীচের দিকে নেমে আসে তখন লাল বর্ণ উৎপন্ন হয়। এই পর্যায় ক্রমে তাপমানের সাথে 273^0C যোগ করতে হবে। এক একটা পর্যায়ের তাপমান 273^0C যোগফলে যে নতুন তাপমান উৎপন্ন করে—একেই আমরা Colour Temperature বলি এবং এই Temperature-কে degree Kelvin বলা হয়। White Balance করার আগে Black Balance করে নিতে হবে তবে এখানে অবশ্য কালো কার্ডের প্রয়োজন নেই। Lens-এ Cover লাগিয়ে সুইচ অন করলেই নিজে থেকে Pick up tube বা CCD চিপসে ডার্ক কারেন্ট প্রবাহিত হয়। এতে Image Plate বা ছবি (দৃশ্য) উৎপন্নের প্লেটে কোন রকম পূর্বের দৃশ্য থাকবে না এবং CCD-এর ক্ষেত্রে দৃশ্য প্লেট ও স্টোরেজ সেক্শনে ঐ একই কাজ হবে। যদি রেকর্ড করার পর দেখা যায় কোন রং-এর অল্প অল্প ছোপ

ছোপ রং থেকে যাচ্ছে নতুন তোলা দৃশ্যের মধ্যে বিশেষ করে shadow area-তে তাহ'লে বুঝতে হবে Black Balance ঠিকমত হয় নি। সাধারণত Black Balance-এর জন্য Image Plate-এ কোন রকম পুরনো রং থাকবে না। এই Plate সম্পূর্ণ পরিষ্কার হ'লে তবেই White Balance করে নতুন রং বসবে নতুন ছবি বা দৃশ্যের সাথে।



ভিশন মিক্সার : ছবি



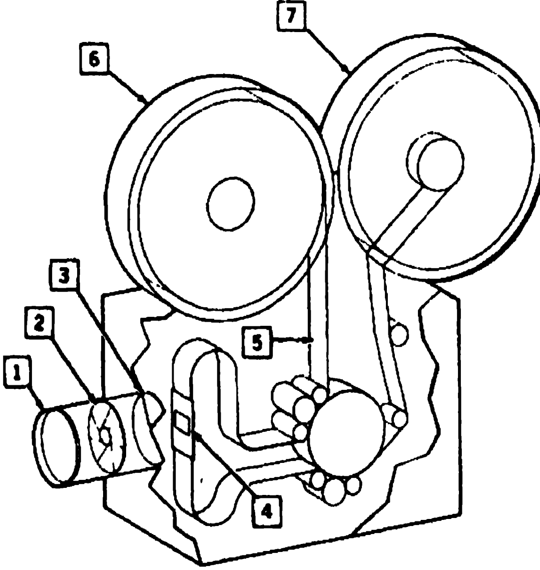
ভিশন মিক্সার : নকশা

মুভি ফোটোগ্রাফির কলাকৌশল

আইর কনিগ্‌স্‌বার্গ

চলচ্চিত্রের ভাষা ক্যামেরা-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে এবং ক্যামেরা-পদ্ধতি ফোটোগ্রাফির কলাকৌশলের মধ্য দিয়ে রূপ পায়। অর্থাৎ মুভি ফোটোগ্রাফির প্রয়োগকলা থেকে আসতে হয় ক্যামেরাশৈলীতে এবং তা থেকে চিত্রভাষায়। প্রারম্ভিক সূচনাটা ফোটোগ্রাফির মূল কলাকৌশল দিয়ে এবং সেটাই ও সেইটুকুই এই প্রবন্ধে আমাদের বিবেচ্য।

চলচ্চিত্র বা সিনেমার এবং সিনেমাটোগ্রাফি বা মুভি ফোটোগ্রাফির মূল যন্ত্র বা হাতিয়ার হল ক্যামেরা।



camera (simplified): 1. lens 2. diaphragm
3. variable shutter 4. aperture plate 5. film
6. feed reel 7. take-up reel

ছবিটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে-কোনো যন্ত্রের মতো ক্যামেরারও একটা নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি রয়েছে। এই কর্মপদ্ধতি রূপ পায় কিছু বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট টেকনিক বা কলাকৌশলের প্রয়োগের

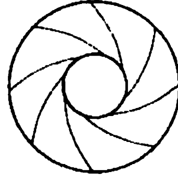
মধ্য দিয়ে। সেই কলাকৌশলগুলির প্রতি আমরা পৃথক্-পৃথক দৃষ্টিনিবেশ করব। বলে রাখা ভালো, ক্যামেরাশৈলী এইসব আলাদা-আলাদা কলাকৌশলের কোনো নিছক বা সাধারণ যোগফল নয়, তা সমস্ত বা বিভিন্ন কলাকৌশলের এক অখণ্ড সমন্বিত সমীকরণ।

এইসব কলাকৌশল ও প্রয়োগকলার মধ্যে পড়ছে—

১. অ্যাপারচার নির্বাচন ২. এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণ ৩. ফোকাসিং-এর নিয়ম-কানুন ৪. ডেপ্থ্ অব ফিল্ড ৫. ক্যামেরা-লেন্স ও লেন্সের ব্যবহার ৬. ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল ৭. ক্যামেরা হাইট/ডিসট্যান্স ৮. ফ্রেমিং ও কম্পোজিশন ৯. ক্যামেরা মুভমেণ্ট ১০. লাইটিং ১১. ফিলটার। ইত্যাদি।

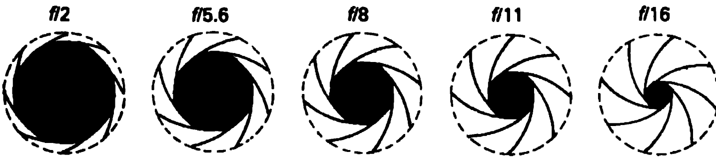
অ্যাপারচার

১. লেন্স অ্যাপারচার : লেন্সের উন্মুক্তি, যা সাধারণত ডায়াফ্রামের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, কী পরিমাণ আলো লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে ক্যামেরা অভ্যন্তরস্থ ফিল্মের ওপর গিয়ে পড়বে তা এর দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে।



২. ক্যামেরা অ্যাপারচার : কোনো ফ্রেমের কতটা অংশ এক্সপোজ করা হবে তা যার দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে সেই উন্মুক্তিকে বলা হয় ক্যামেরা অ্যাপারচার। এছাড়াও আছে প্রজেক্টর অ্যাপারচার ও প্রিণ্টার অ্যাপারচার—যথাক্রমে পর্দায় ফিল্ম প্রক্ষেপণের সময় প্রজেক্টরের এবং মুদ্রণের সময় প্রিণ্টারের উন্মুক্তি। লেন্সের অ্যাপারচার যেমন ডায়াফ্রামের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, ক্যামেরা, প্রজেক্টর ও প্রিণ্টারের অ্যাপারচার তেমনি নিয়ন্ত্রিত হয় অ্যাপারচার প্লেটের দ্বারা।

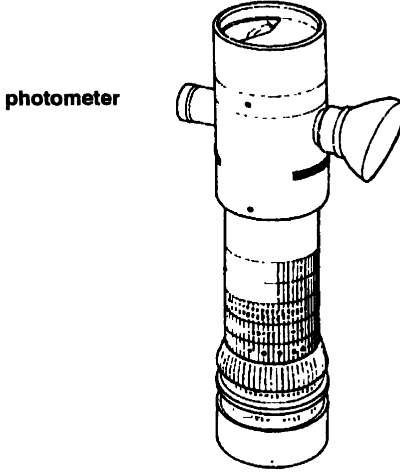
লেন্স অ্যাপারচারের ক্ষেত্রে, ডায়াফ্রামের আকারকে নিয়ন্ত্রিত করে যে পাতলা ধাতব চাকতি তাকে বলা যায় f-stop বলয়—এফ-স্টপ সংখ্যা যত কম, উন্মুক্তি তত বেশি। এফ-স্টপ কম হলে ফোকাসিং-এর মান ও ডেপ্থ্ অব ফিল্ড বাড়ে অর্থাৎ গভীর চিত্রগ্রাহ্যতা অর্জন করা যায়।



এক্সপোজার

এক্সপোজার হল ক্যামেরা বা প্রিণ্টার মধ্যস্থ ফিল্মকে আলোকের সামনে যথাযথ ভাবে উন্মুক্ত করা যাতে অবদ্রবের ভিতর লীন প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হতে পারে। ক্যামেরায় এক্সপোজারের মান নির্ভর করে দৃশ্যের আলোকসম্পাত, যতক্ষণ ধরে ফিল্ম আলোকের সামনে উন্মুক্ত থেকেছে সেই সময় এবং ক্যামেরা-লেন্সের উন্মুক্তির উপর। ওভার-এক্সপোজড ফিল্ম হালকা প্রতিরূপের সৃষ্টি

করে যা থেকে সূক্ষ্ম অনুপুঙ্খ সব হারিয়ে যায়। তেমনি আণ্ডার-এক্সপোজড ফিল্ম গাঢ় ও ঘন প্রতিরূপ সৃষ্টি করে। এগুলো বেঠিক এক্সপোজার। অনেক সময়ে ইচ্ছে করেই এ-রকম বেঠিক এক্সপোজার দেওয়া হয়। যেমন প্রথম ক্ষেত্রে অবাস্তব বা স্বপ্নসদৃশ প্রতিমা এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিষণ্ণ বা রহস্যময় প্রতিমা ও ভারী চিত্ররূপ সৃষ্টি করার জন্য। সাধারণ ও স্বাভাবিক ভাবে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার প্রতিমা সৃষ্টির জন্য, যাতে চিত্ররূপে বর্ণের নিখুঁত প্রতিরূপ পাওয়া যাবে এবং প্রতিমা থেকে প্রতিমায় দৃশ্যগত সঙ্গতি থাকবে, এক্সপোজার সঠিক হওয়া জরুরি। লাইট মিটারের সাহায্যে বস্তুর উপর পতিত আলো বা বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলো পরিমাপ করে প্রয়োজনীয় এফ-স্টপ সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। উন্নত এক্সপোজার মিটার ফোটোমিটার নামে পরিচিত।



এক্সপোজার ক্যালকুলেটর বা এক্সপোজার টেবলের সাহায্যেও এক্সপোজার সেটিং নির্ধারণ করা যায় যা থেকে নির্দিষ্ট আলোকাবস্থায় প্রয়োজনীয় এফ-স্টপ সংখ্যা গণনা করা সম্ভব। যেহেতু এফ-স্টপ সংখ্যা লেন্স কর্তৃক আলোর বিশোষণ ও প্রতিফলনকে হিশেবের মধ্যে ধরে না, তাই পেশাদার চিত্রগ্রহণের ক্ষেত্রে এফ-স্টপ সংখ্যাকে অনেক সময়ে যথেষ্ট নিখুঁত ধরা হয় না। পরিবর্তে টি-স্টপ সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। ডেপ্‌থ্‌ অব ফিল্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য অবশ্য এফ-স্টপ সংখ্যাই বিবেচ্য। ক্যামেরা দ্রুতি ও ফিল্ম অবদ্রবের সংবেদনশীলতার উপরও এক্সপোজার নির্ভর করে কিন্তু যেহেতু অধিকাংশ উন্নত মানের ক্যামেরাই সেকেণ্ডে চব্বিশটি ফ্রেমের দ্রুতিতে ক্রিয়াশীল এবং একটি দৃশ্যে একই ব্যাচের কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়, ফলে কোনো দৃশ্যের শট থেকে শটে ক্যামেরা দ্রুতি ও অবদ্রবের সংবেদনশীলতা এক্সপোজার পরিবর্তনের কারণ হয় না। প্রিণ্টারের এক্সপোজার নির্ধারিত হয় ফিল্ম অবদ্রবের সংবেদনশীলতা, আলোর তীব্রতা এবং আলোকপাতের সময়কাল অনুসারে।

ফোকাসিং

ফোকাসিং হল ক্যামেরাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে লেন্স ও ফিল্মের মধ্যবর্তী দূরত্বকে পরিবর্তিত করে চিত্ররূপে সর্বাধিক তীক্ষ্ণতা ও স্পষ্টতা অর্জন করা যায়। লেন্সের মাধ্যমে

প্রতিসরিত আলোকরশ্মিগুলি যে নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হয়ে স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে লেন্সের পশ্চাদ্‌বর্তী সেই বিন্দুই ফোকাস। ফিল্মের উপর সৃষ্ট প্রতিচ্ছবির স্পষ্টতা ও তীক্ষ্ণতা সন্তোষজনক ভাবে গ্রহণযোগ্য হলে সেই প্রতিমা ফোকাসে আছে বলা যাবে। এই ফোকাস হতে পারে 'ডিপ ফোকাস' যেখানে পুরোভূমি থেকে মধ্যভূমি হয়ে পশ্চাদ্‌ভূমি পর্যন্ত সবটাই যথেষ্ট তীক্ষ্ণ, অথবা 'শ্যালো ফোকাস' যেখানে শুধু একটা মাত্র ভূমি বা তলই তীক্ষ্ণ বা সম্পূর্ণ স্পষ্ট।

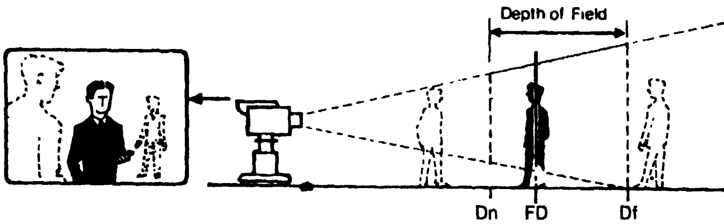
ফোকাস বলতে প্রতিমার তীক্ষ্ণতা ও স্পষ্টতার হারকেও বোঝানো হয়। তীক্ষ্ণতা ও স্পষ্টতার হার সর্বোচ্চ হলে বলা যাবে প্রতিমা 'শার্প ফোকাস'-এ আছে। কখনো কখনো প্রতিমাকে বা প্রতিমার অংশবিশেষকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে অল্পবিস্তর অস্পষ্ট করা হয়ে থাকে, এই অবস্থাকে বলা হয় 'সফ্‌ট ফোকাস'।

অসীম দূরত্বে ফোকাস করা লেন্সের পিছনের নোডাল পয়েন্ট (আলোকরশ্মিগুলি যে কাল্পনিক বিন্দু থেকে একই লক্ষ্যে নির্গত হয়ে কোনো যৌগিক লেন্স থেকে বেরিয়ে আসছে বলে মনে হয় তা ওই লেন্সের পশ্চাদ্‌-নোডাল পয়েন্ট) থেকে ফোকাস তল পর্যন্ত যে দূরত্ব তা ওই লেন্সের ফোকাল লেংথ। ক্যামেরায় ফোকাস রিং-এর সাহায্যে লেন্সের ফোকাল লেংথে অদল-বদল ঘটিয়ে সর্বাধিক তীক্ষ্ণতা ও স্পষ্টতা অর্জন করতে হয়। ফোকাস রিংকে চালনা করা হয় হাত দিয়ে ঘুরিয়ে, হ্যাণ্ডেল বা কেব্‌লের সাহায্যে, এবং গতিশীল ক্যামেরার ক্ষেত্রে রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে।

ফোকাসিং-এর সঙ্গে কম্পোজিশন মিলিয়ে বিবেচনা করলে আসে ডেপ্‌থ্‌ অব ফিল্ডের কথা।

ডেপ্‌থ্‌ অব ফিল্ড

কোনো নির্দিষ্ট বস্তুকে ক্যামেরায় ফোকাস করার পর বস্তুর সম্মুখ থেকে পশ্চাৎ পর্যন্ত যতটুকু ক্ষেত্র গ্রহণযোগ্য ও সন্তোষজনক ভাবে ফোকাসের মধ্যে থাকে তাকে ডেপ্‌থ্‌ অব ফিল্ড বা ক্ষেত্রগভীরতা বলে। সাধারণত ফোকাস করা বস্তুর সামনে এক-তৃতীয়াংশ ও পিছনে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত স্থান ক্ষেত্রগভীরতার অন্তর্গত।



ডেপ্‌থ্‌ অব ফিল্ড নির্ভর করে লেন্সের অ্যাপারচার ও ফোকাল লেংথের উপর। লেন্সের অ্যাপারচার যত বাড়ে এবং ফোকাল লেংথ যত বেশি হয় ডেপ্‌থ্‌ অব ফিল্ড তত কমে।
ডেপ্‌থ্‌ অব ফিল্ড প্রভাবিত হয়—

১. ফোকাস দূরত্বের দ্বারা—অর্থাৎ কত দূরে ফোকাস দেয়া হয়েছে ২. লেন্সের ফোকাল লেংথের দ্বারা—অর্থাৎ লেন্স অ্যাঙ্গেল কী বা কত ৩. লেন্স অ্যাপারচারের দ্বারা—অর্থাৎ এফ-স্টপ সংখ্যা কত। এই তিনের যে-কোনো একটিকে পাল্টে দিলেই তীক্ষ্ণতার অঞ্চল বেড়ে বা কমে যাবে। ক্ষেত্রগভীরতা প্রসঙ্গে ডিপ ফোকাস এবং ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সের কথা আসে। দুই থেকে দু'শ ফুট দূরে অবস্থিত বস্তু বা ব্যক্তি থেকে স্পষ্ট ফোকাস উৎপাদনক্ষম যে চূড়ান্ত পদ্ধতি গ্রেগ টোলাণ্ড

ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স দ্বারা সম্ভব করেছিলেন কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে তার বিস্ময়কর ফল বর্তমানে সুপরিচিত। এই রীতির ফোটোগ্রাফি ডিপ ফোকাস ফোটোগ্রাফি নামে পরিচিত হয়েছে।

লেন্স

লেন্স হল ক্যামেরার চোখ। আলোককে প্রতিসরিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন স্বচ্ছ কাঁচের একাধিক এলিমেণ্ট যুক্ত করে লেন্স তৈরি করা হয়। বিভিন্ন বর্ণের আলোকরশ্মির ফোকাস বিন্দু বিভিন্ন বলে একটি মাত্র এলিমেণ্টের সাহায্যে উন্নত লেন্স নির্মাণ করা যায় না। অভিসারী ও অপসারী দু-ধরনের লেন্স সহযোগে উন্নত যৌগিক লেন্স প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। লেন্স যত উন্নত হবে তার ফোকাসিং-এর ক্ষমতা হবে তত বেশি।

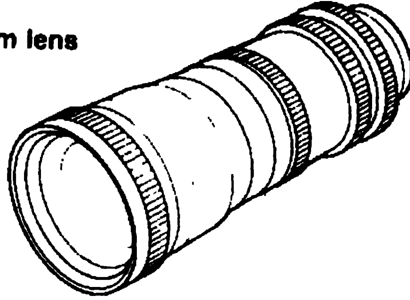
যে-কোনো লেন্সকে চিহ্নিত করা হয় তার ফোকাল লেংথের দ্বারা। আগেই বলেছি, ফোকাল লেংথ হল লেন্সের কেন্দ্রবিন্দু থেকে প্রধান ফোকাসের দূরত্ব। লেন্সের প্রধান অক্ষরেখার সমান্তরালে আসা আলোকরশ্মিগুলি লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে অভিসারী লেন্সের ক্ষেত্রে অক্ষরেখার যে বিন্দুতে মিলিত হয় আর অপসারী লেন্সের ক্ষেত্রে যে বিন্দু থেকে বহির্মুখী হয় অর্থাৎ বহির্মুখী রশ্মিগুলিকে সরলরেখা বরাবর পিছিয়ে আনলে অক্ষরেখার যে বিন্দুতে মিলিত হয় তাকে প্রধান ফোকাস বলে। ফ্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে ইমেজ বা প্রতিমার আনুপাতিক আকার ক্যামেরা-লেন্সের ফোকাল লেংথের ওপর নির্ভরশীল ও তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফোকাল লেংথের তারতম্য অনুসারে লেন্সকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—নর্মাল, ওয়াইড অ্যাঙ্গেল, টেলি-ফোটো। নর্মাল লেন্সে গঠিত ইমেজের, ফ্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে আনুপাতিক আকার, মানুষের স্বাভাবিক চোখ সাধারণ বস্তুকে যে রকম ভাবে দেখে সেই রকম হয়ে থাকে। নর্মাল লেন্সের ফোকাল লেংথ ফ্রেমের কর্ণের প্রায় দ্বিগুণ হয়ে থাকে। ৩৫ মিমি ফিল্মের ক্ষেত্রে এই প্রকার নর্মাল লেন্সের ফোকাল লেংথ হয় সাধারণত ৫০ মিমি ও তার অনুভূমিক দৃষ্টিকোণ আনুমানিক ২৫°। ১৬ মিমি ফিল্মের ক্ষেত্রে এই একই দৃষ্টিকোণ পাওয়া যায় ২৫ মিমি ফোকাল লেংথ বিশিষ্ট লেন্সের সাহায্যে এবং ৬৫ মিমি ফিল্মের ক্ষেত্রে ১২৫ মিমি ফোকাল লেংথ বিশিষ্ট লেন্সের সাহায্যে। অর্থাৎ ফিল্ম ফর্ম্যাট এবং লেন্সের ফোকাল লেংথ ও কৌণিকতার মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। যেমন— ফিল্ম ফর্ম্যাট : ৩৫ মিলিমিটার

ফোকাল লেংথ	অনুভূমিক কৌণিকতা	ফোকাল লেংথ	অনুভূমিক কৌণিকতা
৫০ মিমি	২৫°	১০০ মিমি	১২.৫°
২৮ মিমি	৪৩°	১৩৫ মিমি	৯.৫°
২৫ মিমি	৪৭.৫°	ইত্যাদি	

অনুভূমিক কৌণিকতার পাশাপাশি উল্লম্ব কৌণিকতারও একটা মাপ থাকে যা ফিল্ম ফ্রেমের অনুপাতের উপর নির্ভরশীল।

ফোকাল লেংথ অনুসারে ৩৫ মিমি মুভি ক্যামেরার লেন্স ১৪ মিমি, ১৮ মিমি, ২৫ মিমি, ২৮ মিমি, ৩৫ মিমি, ৪০ মিমি, ৫০ মিমি, ৭৫ মিমি, ১০০ মিমি, ১৫০ মিমি ইত্যাদি হয়ে থাকে। এর মধ্যে ৩৫, ৪০ ও ৫০-কে সাধারণত নর্মাল, ১৪, ১৮ ও ২৫-কে (২৮ কেও) ওয়াইড অ্যাঙ্গেল, আর ১০০, ১৫০ ও তারও অধিককে (এমনকি ১০০০ পর্যন্ত) টেলিফোটো লেন্স বলা হয় (এর মধ্যে ৭৫ মিমি ও ১০০ মিমি লেন্স ক্লোজ-আপের ক্ষেত্রে খুব কার্যকারী)। ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সে দৃষ্টিক্ষেত্রের প্রসার অনেক বেড়ে যায় কিন্তু ফ্রেমের অন্তর্গত দৃশ্যবস্তুসমূহকে তুলনামূলক ভাবে আকারে ছোট দেখায়। টেলিফোটো লেন্সের দৃষ্টিক্ষেত্র সীমিত কিন্তু ইমেজকে

তুলনামূলক ভাবে তা বর্ধিত করে দেখায়। জুম লেন্সে এই তিন প্রকার লেন্সের সুযোগ সুবিধাই কিছু কিছু করে সমন্বিত হয়েছে। এই লেন্স ইমেজকে ধারাবাহিক ভাবে ফোকাসে রেখে নিজের ফোকাল লেংথের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। লেন্সের জুম প্রক্রিয়ায় কটি কম্‌পোনেন্ট রয়েছে তার ওপর নির্ভর করে ইমেজকে স্থানান্তরিত না করে ফোকাল লেংথের কটি পরিবর্তন সম্ভব। জুম লেন্সে ১৮ থেকে এমনকি ২৫০ পর্যন্ত লেন্সের সমন্বয় ঘটে। প্রথম দিকের জুম লেন্সে সর্বোচ্চ ফোকাল লেংথের সঙ্গে সর্বনিম্ন ফোকাল লেংথের অনুপাত ছিল সাধারণত ৩ : ১, কিন্তু বর্তমানে ৩৫ মিমি ক্যামেরায় ১০ : ১ অনুপাতেও জুম লেন্স ব্যবহার করা হচ্ছে। স্ট্যানলি কুব্রিক তাঁর ব্যারি লিণ্ডন (১৯৭৫) ছবিতে ২০ : ১ অনুপাতের জুম লেন্স ব্যবহার করে চমকপ্রদ ফল পেয়েছেন। বিচিত্র দৃশ্যময়তা অর্জিত হয়েছে এর ফলে।



জুম লেন্সের সাহায্যে নানা ধরনের শট তোলা যায় এবং এই সমস্ত শটকে জুম শট বলা হয়।

ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল

ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল হল যে বস্তুর চিত্ররূপ তোলা হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ক্যামেরার অবস্থান। ক্যামেরার স্বাভাবিক উচ্চতা হল আমাদের চোখের উচ্চতা, আই লেভেল, মাটি থেকে মোটামুটি ৫-৬ ফুট উঁচুতে। এই অবস্থায় ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল নগণ্য। যখন ক্যামেরাকে চোখের উচ্চতার নিচে নামিয়ে আনা হয়, যেন ক্যামেরা বস্তুর দিকে মুখ তুলে দেখছে, তখন যে শট পাওয়া যায় তা হল লো-অ্যাঙ্গেল শট। যখন ক্যামেরা অনেকটা নিচে নেমে যায় তা এক্সট্রিম লো অ্যাঙ্গেল শট। ক্যামেরা যখন বস্তুর উপরে অবস্থান করে, তখন যে শট পাওয়া যায় তাকে হাই-অ্যাঙ্গেল শট বলা হয়। ক্যামেরা যদি বস্তুর তুলনায় অনেক উঁচুতে উঠে যায় তবে তা এক্সট্রিম হাই অ্যাঙ্গেল শট। ক্যামেরা বামদিকে বা ডানদিকে টিল্ট করলে তা অব্‌লিক অ্যাঙ্গেল এবং অনুভূমিক ও উল্লম্ব অক্ষ বরাবর হেলে পড়লে তা ডাচ্‌ অ্যাঙ্গেল।

চোখের স্বাভাবিক উচ্চতার বাইরে যে-কোনো অবস্থানে ক্যামেরা রেখে ছবি নিলে পর্দায় যে চিত্ররূপ ধরা পড়বে তার প্রতি দর্শকের সবিশেষ প্রতিবেদন হবে। হাই-অ্যাঙ্গেল শট বস্তুকে যেন একটু ক্ষুদ্র করে দেখায়, চরিত্রকে দুর্বল ও ন্যূন মনে হয় এর ফলে। যেমন লো-অ্যাঙ্গেল শট বস্তুকে বলিষ্ঠ ও উন্নীত করে দেখায়, চরিত্রকে শক্তিশালী ও মহিমান্বিত মনে হয় এর ফলে। অব্‌লিক অ্যাঙ্গেল বিচ্ছিন্নতা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, এবং বিপদাসন্ন ও ভীতিকর গতি বা ক্রিয়া তুলে ধরে; অব্‌লিক ও ডাচ-অ্যাঙ্গেল উভয় ধরনের শটই চরিত্রের মনের চরম অবস্থাকে সাবজেক্টিভ ভাবে প্রকাশ করার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। অবশ্য ক্যামেরা-অ্যাঙ্গেল দৃশ্য গঠনের

বিবিধ উপাদানের একটি মাত্র। ফলে একই ক্যামেরা-অ্যাঙ্গেল বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ভাবার্থ বা ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারে : যেমন, জেমস হোয়েলের 'দ্য ব্রাইড অব ফ্রাংকেনস্টাইন' (১৯৩৫) ছবিতে প্রাণসৃষ্টির দৃশ্যে দুই বিজ্ঞানীর যে হাই-অ্যাঙ্গেল শটগুলি মিডিয়াম ক্লোজ-আপ, বটম লাইটিং ও র‍্যাপিড কাটিং সহযোগে ব্যবহার করা হয়েছে তাতে মুখ দুটির কল্পমূর্তি হয়ে উঠেছে আতঙ্কদায়ক ও অভিঘাতী। প্রাণসৃষ্টির সমগ্র দৃশ্যটিই অত্যন্ত সার্থকভাবে হাই, লো, অব্লিক, ডাচ ও টপ অ্যাঙ্গেলের বিভিন্ন ও বিচিত্র সব শট ব্যবহার করে পর্দায় তুলে ধরে অদ্ভুত, আশ্চর্য ও ভীতিপ্রদ এক জগৎকে।

ক্যামেরা-অ্যাঙ্গেলের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর সাব্জেক্টিভ প্রয়োগের সুযোগ। এই প্রকার প্রয়োগ কোনো নির্দিষ্ট চরিত্রের দৃষ্টিকোণ নির্দেশ করে। যেমন এক্সট্রিম হাই অ্যাঙ্গেল শট যেন বোঝায় উঁচু বাড়ির ওপর থেকে চরিত্রের দৃষ্টিপাত। ক্যামেরার এই কৌণিক পরিপ্রেক্ষিত সাব্জেক্টিভ ক্যামেরা-ভাষার অঙ্গ। ক্যামেরাকোণ অবশ্যই শুধু পারস্পেক্টিভ নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। ক্যামেরাভাষার অংশ হিশেবে ক্যামেরা-অ্যাঙ্গেলকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—অব্জেক্টিভ, সাব্জেক্টিভ, এবং পয়েণ্ট অব ভিউ।

ক্যামেরা হাইট/ডিসট্যান্স

লো-অ্যাঙ্গেল, হাই-অ্যাঙ্গেল, অব্লিক অ্যাঙ্গেল, ডাচ অ্যাঙ্গেল, টপ অ্যাঙ্গেল—ক্যামেরার এই সমস্ত কৌণিক প্রয়োগ যুক্ত ক্যামেরা হাইটের সঙ্গে। এর পাশাপাশি আসে স্বাভাবিক উচ্চতায় ক্যামেরার অবস্থান জনিত ক্যামেরা ডিসট্যান্সের কথা।

দৃশ্যবস্তু থেকে দর্শকের দূরত্ব সিনেমাটোগ্রাফির ক্ষেত্রে একটা প্রধান বিবেচ্য বিষয়। ক্যামেরা দূরত্বের তারতম্য অনুসারে দৃশ্যের তথ্যমূলকতার তারতম্য হয় এবং দর্শকের প্রতিক্রিয়ারও তারতম্য হয়ে থাকে। চলচ্চিত্র স্থানকে সংকুচিত ও প্রসারিত করতে পারে, দর্শকের জন্য বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতকে সমন্বিত করতে পারে, যার ফলে বাস্তবের চাইতে অনেক বেশি প্রাণবন্ত সম্পর্ক স্থাপিত হয় চরিত্র ও পরিবেশের সঙ্গে। ভৌত বাস্তব আরও নমনীয় ও প্রকাশময় হয়ে ওঠে। ক্যামেরা-দূরত্ব বস্তু থেকে ক্যামেরার প্রকৃত দূরত্ব এবং ব্যবহৃত লেন্সের দরুন প্রাপ্ত আপাত দূরত্ব উভয়ের ফল।

ক্যামেরা ও বস্তুর মধ্যকার আপাত দূরত্বকে তিনটি মূল ভাগে ভাগ করা হয়েছে—লং শট, মিডিয়াম শট, ও ক্লোজ-আপ—প্রতিটি ভাগেরই আবার সহবিভাজন আছে—যেমন এক্সট্রিম লং শট, মিডিয়াম লং শট, বিগ ক্লোজ-আপ, ইত্যাদি। লং শট সাধারণত একজন পুরো ব্যক্তি বা চারপাশের কিছুটা সহ একটা গোটা বাড়িকে ধরে। মিডিয়াম শট ব্যক্তির মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত অথবা কোনো বস্তু বা স্থানের অর্ধাংশকে দেখায়। আর ক্লোজ-আপে ধরা পড়ে কোনো ক্ষুদ্রাকৃতি বস্তু, বা কোনো স্থানের অল্প একটু অংশ, বা ব্যক্তির মাথা ও মুখের অন্তরঙ্গ চিত্ররূপ।

অবশ্যই, দূরত্ব-নির্দেশক এই পরিভাষাগুলি সমস্তই আপেক্ষিক, প্রদর্শিত বস্তুর আকারের উপর নির্ভরশীল। কোনো বাড়ির লং শট পর্দায় যতটা স্থান তুলে ধরবে তার চাইতে অনেক কম স্থান ধরা পড়বে কোনো ব্যক্তির লংশটে। কোনো স্থান বা পরিবেশকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে, গোটা অ্যাকশনটাকে একসঙ্গে দেখানোর জন্য, এবং সাধারণভাবে দর্শককে পর্যাপ্ত তথ্য ও অপেক্ষাকৃত নৈর্ব্যক্তিক এক পরিপ্রেক্ষিত সরবরাহে লং শট খুবই উপযোগী। যেমন মিডিয়াম শট কার্যকর কর্মরত কোনো ব্যক্তিকে অথবা কাজে বা কথোপকথনে নিয়োজিত একাধিক ব্যক্তিকে উপস্থাপিত করার সময়ে, এই শটে পরিপ্রেক্ষিত ও ঘনিষ্ঠতা দুটিই কিছু-কিছু মেলে। ক্লোজ-আপে

ঘনিষ্ঠতা আরও বেশি, তা চরিত্রের আবেগ ও অনুভূতিকে অন্তরঙ্গভাবে তুলে ধরে।

দৃশ্যরূপের কতটা অংশকে ফোকাসে রাখা হচ্ছে তার সাহায্যেও দূরত্বকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। শ্যালো ফোকাস মাত্র একটি তলকে স্পষ্ট করে দৃশ্যের সেই অংশ থেকে আমাদের দূরত্বকে চিহ্নিত করে এবং অন্য তলগুলিকে অস্পষ্ট রেখে দেয়, যার ফলে দৃশ্যের মধ্যে কোনো গভীরতা বা দূরত্বের ধারণা তৈরি হয় না। কিন্তু ডিপ ফোকাস গভীর চিত্রগ্রাহ্যতা বা দৃশ্যের মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ দূরত্বের ধারণা সৃষ্টি করে, যার ফলে দৃশ্যের বিভিন্ন তলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিষয়ে আমরা সচেতন হই। পর্দা অনুভূমিক এক দূরত্বকেও প্রকাশ করে থাকে, যা নির্ধারিত হয় ফ্রেমের প্রসার, ব্যবহৃত লেন্সের ধরন এবং ক্যামেরা থেকে বস্তুর দূরত্বের (যত লং শট, পর্দার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তত বেশি দূরত্ব প্রদর্শিত) দ্বারা। ১৯৫০ দশক থেকে ওয়াইড-স্ক্রিন ফোটোগ্রাফি ও প্রজেকশনের বিকাশের ফলে ফ্রেমের প্রসার বেড়ে গেল, যার ফলে আরও বেশি করে অনুভূমিক দূরত্ব ধরা পড়তে লাগল পর্দায়। আউটডোর লোকেশন ও গতিশীল অ্যাকশন প্রধান ছবিতে প্রসারিত পর্দা বিশেষ ফলপ্রদ হয়েছে। ক্যামেরা নিজেও প্যানিং ও ট্র্যাকিং জাতীয় অনুভূমিক গতিময়তার মধ্য দিয়ে দর্শকের জন্য অনুভূমিক দূরত্বের একটা ধারণা তৈরি করে থাকে। অ্যাকশন অনুসরণের কাজে এই জাতীয় শট খুবই কার্যকর।

ফ্রেমিং ও কম্পোজিশন

পারিভাষিক ভাবে দেখলে ফ্রেমিং হল ফ্রেমের মধ্যে দৃশ্যবস্তুকে যথাযথভাবে স্থাপন করে চিত্রগ্রহণের জন্য প্রতিমা সংরচন। প্রতিমার মধ্যে দৃশ্যবস্তুকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হয় যাতে তার রূপরেখাটি সুনির্দিষ্ট হতে পারে এবং পুরোভূমির বস্তুরাজির দ্বারা তার গুরুত্ব সূচিত হয়। ফ্রেমই প্রতিমাকে পর্দার বাইরের জগৎ থেকে আলাদা করে দেয়, কিন্তু এমনভাবে প্রতিমা সংরচন করা সম্ভব যাতে ফ্রেমের বাইরেও চিত্রবাস্তবের অস্তিত্ব বহমান থাকে। প্রসারিত পর্দার দরুন এই প্রবণতা আরও জোরদার হয়েছে। তবু অনেক সময়ই চিত্রপরিচালক তাঁর ফ্রেমের অন্তর্গত স্থানকে প্রাধান্য দিয়ে এমন ভাবে প্রতিমা সংরচন করেন যে তা যেন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা, পর্দার জগৎ এক আপন জগৎ।

ফ্রেমিং প্রসঙ্গে অপরিহার্য ভাবেই আসে কম্পোজিশন বা সংরচনের কথা। দৃশ্যের মধ্যে সমস্ত দৃশ্যোপাদানের সমবায় ও বিন্যাসই হল কম্পোজিশন। এই সমস্ত উপাদানের মধ্যে সেটিং, প্রপ, লাইটিং, ক্যামেরা মুভমেণ্ট ও চরিত্র-সমূহের অ্যাকশনও পড়ছে। প্রতিটি শটের ফ্রেমকে বিচার করতে হয় দুভাবে—প্রথমত স্বতন্ত্র কম্পোজিশনগত একক হিশেবে এবং দ্বিতীয়ত আগের ও পরের বিভিন্ন শটের সাংগঠনিক পরিপ্রেক্ষিতে। কম্পোজিশন প্রভাবিত করে পর্দায় উত্থাপিত জগৎকে দর্শক কীভাবে গ্রহণ করছে—তাকে, বিভিন্ন প্রতিমা কোন্ অর্থে ও ব্যঞ্জনায় প্রতিভাত হচ্ছে তাদের কাছে—তাকে, চরিত্র ও অ্যাকশনের প্রতি তাদের আবেগগত প্রতিক্রিয়াকে, এবং সাধারণভাবেই ছবিটি সম্পর্কে দর্শকের আগ্রহকে। চিত্রকলার কম্পোজিশনের মতো চলচ্চিত্রের কম্পোজিশনকেও আদতে বিচার করতে হবে রেখা, ভর, আকার, ভারসাম্য, ছন্দ, রঙ, গ্রথন, আলো ও অন্ধকারের প্রেক্ষিতে। চিত্রকলার মতো চলচ্চিত্রের কম্পোজিশনকেও তার সমতল দ্বিমাত্রিকতা অতিক্রম করে গভীরতার বিভ্রম তথা ত্রিমাত্রিকতা অর্জন করতে হয়। পুরোভূমি, মধ্যভূমি ও পৃষ্ঠভূমির মধ্যে কম্পোজিশনকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হয় যাতে দর্শকের দৃষ্টিকে সুনির্দিষ্টভাবে চালনা করা সম্ভব। কিন্তু চিত্রকলার বিপরীতে চলচ্চিত্রের প্রতিমা সবসময়ই পরিবর্তনমান, ধারাবাহিক গতিময়তার দ্বারা চালিত— প্রতিটি শটের মধ্যে রয়েছে গতিশীলতা,

শট থেকে শটের মধ্যেও রয়েছে গতিময়তা। পাত্রপাত্রীর মুভমেন্ট (চলাফেরা ইত্যাদি) এবং ক্যামেরা মুভমেণ্ট গভীরতার ধারণাকে আরও জোরালো করে, দর্শককে চিত্রজগতের ভিতর টেনে নেয়। ফ্রেমের স্থানিক কম্পোজিশন অধিক গুরুত্বপূর্ণ আকার ও এককের দিকে দর্শকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করার কাজেও সহায়ক—আলো ও অন্ধকারের হাইলাইট ও হাইডের মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে কাজ করা হয়ে থাকে। উপাদানগুলির সমবায় প্রধান কয়েকটি ছান্দিক রেখার জন্ম দেয় যা থেকে সৃষ্টি হয় সুনির্দিষ্ট নকশার, যেমন বৃত্তাকৃতি বা ত্রিভুজাকার নকশার, এইসব নকশাই চিত্রগত সম্পর্ক ও ভাবগত প্রসঙ্গ তুলে ধরে। জাক রিভেতের দ্য নান (১৯৬৫)-র মতো ছবিকে তার কম্পোজিশনগত আঙ্গিকের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। দেখানো কীভাবে ভাবার্থ, ব্যঞ্জনা ও আবেগানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে শটের স্থানিক বিন্যাস, আলোকসম্পাত, গ্রথন ও গতিময়তার দ্বারা, কম্পোজিশনের সঙ্গে কম্পোজিশনের মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে। কম্পোজিশন মিজ-অঁ-সেনের বা চলচ্চিত্রীকরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ক্যামেরা মুভমেণ্ট

ক্যামেরার যে-কোনো গতি যার ফলে মনে হয় দৃশ্যপ্রতিমা নড়ল, সরল, বা পরিপ্রেক্ষিত পাল্টাল, তা ক্যামেরা মুভমেণ্ট নামে পরিচিত। কোনো চরিত্র যখন হাঁটাচলা করছে ক্যামেরার গতিশীলতাই তখন তাকে ফ্রেমের মধ্যে অর্থাৎ দর্শকের চোখের সামনে রেখে দেয়, কোনো গতিশীল যানবাহন বা চলমান বস্তুর গতিকে অনুসরণ করে, বা চলমান চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে উত্থাপিত করে দৃশ্যকে। ক্যামেরা মুভমেণ্টই দৃশ্যের ভিন্ন একটি অংশে দর্শকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে নিয়ে যায় বা একই অ্যাকশনকে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখার সুযোগ করে দেয় দর্শককে। মূল ক্যামেরা হয়ত একই জায়গায় অবস্থান করে অনুভূমিক অক্ষ বরাবর প্যান করে বা উল্লম্ব অক্ষ বরাবর টিল্ট আপ বা ডাউন করে, কিংবা ক্যামেরাকে হয়ত তার স্ট্যাণ্ড বা সাপোর্ট সহ ট্র্যাকের ওপর দিয়ে ঠেলে, চলমান ডলিতে চালিয়ে বা চলন্ত গাড়িতে ছুটিয়ে ট্র্যাকিং, ডলি বা ট্রাকিং শট নেওয়া হয়। ট্রাকিং শট দ্রুত গতিশীল অ্যাকশন অনুসরণের কাজে সহায়ক। আরও দ্রুত ও ব্যাপক অ্যাকশন অনুসরণের কাজে হেলিকপ্টার থেকেও শট নেওয়া যায়। ক্রেন শট অনুভূমিক ও উল্লম্ব উভয় অভিমুখেই পর্যাপ্ত ও বিচিত্র গতিময়তার সুযোগ দেয়। হালকা পোর্টেব্‌ল্ ক্যামেরার প্রচলনের ফলে এখন প্রায় যে-কোনো স্থানেই অ্যাকশনের দৃশ্য তোলা সম্ভব হচ্ছে এবং হ্যাণ্ড-হেল্ড শটের সাহায্যে বিচিত্র সব গতিময়তা অর্জন করা যাচ্ছে। স্টেডিক্যাম (Steadicam) পদ্ধতি জটিল মোবাইল শটের ক্ষেত্রেও ক্যামেরাকে ঝাঁকুনির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

নির্বাক যুগে, গ্রিফিথ প্রথম শটের মধ্যে ক্যামেরাকে স্থানান্তরিত করেন, কিন্তু সে ছিল সামান্য মুভমেণ্ট। জর্মন এক্সপ্রেশনিস্ট চলচ্চিত্রকাররা, অবশ্য, চলন্ত ক্যামেরাকে নাটকীয় ভাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন, মুরনাউ-এর 'লাস্ট লাফ' (১৯২৪) ছবিতে এরকম প্রয়োগের চমকপ্রদ উদাহরণ আছে, বিশেষত শুরুর বিখ্যাত শটটিতে যেখানে ক্যামেরা এলিভেটর বেয়ে নেমে এসে লবির ওপর দিয়ে ছুটে যায় ঘুরন্ত দরজার দিকে। এই পদ্ধতির বিপরীতে, বিখ্যাত রুশ চিত্রনির্মাতা পুদভকিন ও আইজেনস্টাইন তাঁদের মনতাজ তত্ত্বের প্রয়োগের জন্য অধিক নির্ভর করেছিলেন কাটিং বা সম্পাদনার পদ্ধতির ওপর। সবাক যুগে এসে, জর্মন এক্সপ্রেশনিস্ট ছবির প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা গেল তিরিশের দশকের মার্কিন হর্‌র্ ছবিতে, যা মোবাইল ক্যামেরার সঙ্গে হলিউডের কাটিং পদ্ধতির মিলন ঘটাল। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের হলিউডে স্টুডিও ফিল্মগুলির প্রধান শৈলী ছিল কন্‌টিনিউইটি ও ট্র্যান্‌জিশনের জন্য এমন কাটিং ব্যবহার করা যা দর্শকের পারতপক্ষে

নজরে আসবে না। এর জন্য প্রায়ই বিভিন্ন কৌশল একসঙ্গে ব্যবহার করা হত। যেমন, হিচকক এমন একজন চিত্রনির্মাতা যিনি কাটিং-এর উপর মূলত নির্ভর করলেও, বিচিত্র প্রভাব সৃষ্টির জন্য মোবাইল ক্যামেরারও সার্থক ব্যবহার ঘটিয়েছেন।

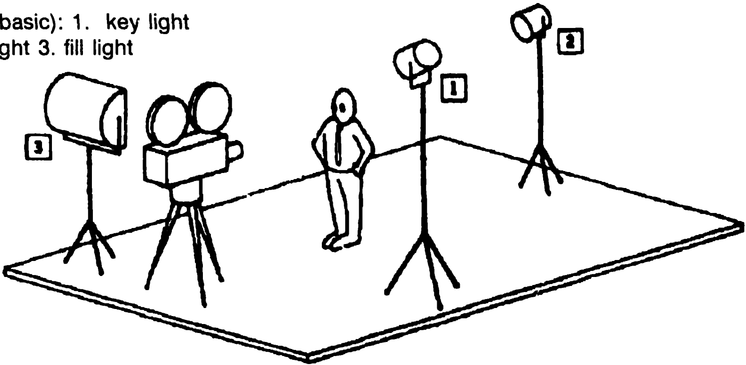
ক্যামেরা মুভমেন্ট যেন দৃশ্যের মধ্যে ঢুকে গিয়ে সমতল প্রতিমাকে দেয় বেধ ও গভীরতা, স্থাপত্য ও সেট-সেটিংকে দেয় নাট্যগুণ ও গতিময়তা, আর পর্দার জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দর্শককে। মোবাইল ক্যামেরা পর্দায় একটা স্বচ্ছন্দ চিত্রগতিও সৃষ্টি করে যার ফলে প্রতিটি দৃশ্যের ও গোটা ছবির প্রধান ছন্দবন্ধও প্রতিষ্ঠিত হয়।

লাইটিং

চলচ্চিত্রায়ণের জন্য সেট-সেটিং, অভিনেতা-অভিনেত্রী ও অ্যাকশনকে কৃত্রিমভাবে আলোকিত করার পদ্ধতি লাইটিং নামে পরিচিত। চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান সাংগঠনিক উপাদান এই লাইটিং, পর্দায় আমরা যে আদৌ কোনো দৃশ্য দেখতে পাই তার জন্য মূলগত অবদান আলোকসম্পাতের। এই ভৌত অবদানের বাইরেও, দৃশ্যরূপের শিল্পগত সমৃদ্ধি এবং ছবির নাট্যগুণের জন্যও লাইটিং দায়ি।

আলোকসম্পাতের পদ্ধতি, ফলাফল ও প্রভাব স্বয়ংসম্পূর্ণ এক প্রবন্ধ দাবি করে। প্রতিটি দৃশ্যের চিত্ররূপ, নাট্যগুণ ও নান্দনিক ব্যঞ্জনা অনেকটা লাইটিং-এর উপর নির্ভরশীল। এইভাবে লাইটিং মিজ-অঁ-সেন বা চলচ্চিত্রীকরণেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাধারণভাবে শ্যুটিংয়ের সময় যেসব আলোক-উৎস ব্যবহার করা হয় তাদের দুভাগে ভাগ করা যায়—ফ্লাডলাইট ও স্পটলাইট। দৃশ্যে আলোকসম্পাতের মুখ্য শৈলীকে বর্ণনা করার জন্য সাধারণত দুটি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়—হাই কি ও লো কি। আলোক-উৎসের অবস্থান অনুসারে আলোগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে—কি লাইট, ব্যাক লাইট ও ফিল লাইট। মুভি ফোটোগ্রাফির ক্ষেত্রে আলোকসম্পাতের প্রধান দুটি ঘরানা বা ধরন হল—স্বাভাবিকবাদ (naturalism) ও চিত্রগুণবাদ (pictorialism)। প্রথম ক্ষেত্রে, দৃশ্যের অন্তর্গত কোনো উৎস থেকেই বা দৃশ্যের বাইরের কোনো স্বাভাবিক উৎস থেকে আলো আসছে—এইভাবে কি লাইটকে স্থাপন করা হয় আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কি লাইটকে যেখানে বসালে সবচেয়ে জোরালো চিত্রপ্রতিমা মিলবে সেখানেই বসানো হয়। এগুলি সবই মোটের উপর সাধারণীকরণ, এদের বিশেষায়িত আলোচনা এই প্রবন্ধের আওতার বাইরে।

lighting (basic): 1. key light
2. back light 3. fill light



ফিলটার

ফিলটার হল রঙিন গ্লাস বা জিলেটিনের এক স্বচ্ছ শিট যাকে ক্যামেরা লেন্সের সামনে বা পিছনে

স্থাপন করে দৃশ্যবস্তু থেকে নির্গত বর্ণালীর অংশবিশেষকে প্রয়োজনমতো নিয়ন্ত্রণ করা যায়। নিউট্রাল ডেনসিটি ফিলটার সাধারণভাবেই সমস্ত আলোক তরঙ্গের পরিমাণ ও তীব্রতা কমিয়ে দেয়, শাদা-কালো ও রঙিন উভয় ফিল্মের ক্ষেত্রে। ডাইযুক্ত ফিলটারের রঙ যা, সেই রঙের আলোর পরিমাণ কমে এবং পরিপূরক রঙের অংশবিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হয়, যার ফলে দৃশ্যের বর্ণবৈষম্য ও আলো-ছায়ার বিভাজন পাল্টে যায়। কোনো কোনো রঙিন ফিলটার, যেমন হলুদ ফিলটার, আকাশকে গাঢ় করে এবং শাদা-কালো ছবিতে মেঘকে স্পষ্টতর করে দেয়। কনভার্সন ফিলটার ব্যবহার করে দিনের-আলোয়-ব্যবহারযোগ্য ফিল্মকে কৃত্রিম আলোয় ব্যবহারের উপযোগী এবং কৃত্রিম-আলোয়-ব্যবহারযোগ্য ফিল্মকে দিনের আলোয় ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা যায়। বিশেষ রঙিন ফিলটারের সাহায্যে শ্যুটিং করে দিনের বেলার দৃশ্যকে রাতের দৃশ্য হিশেবে উপস্থাপিত করাও সম্ভব, একে বলে ডে-ফর-নাইট শ্যুটিং। শাদা-কালো ও রঙিন উভয় ফিল্মের ক্ষেত্রে ডিফিউশন ফিলটার ব্যবহার করে সফ্‌ট্‌ ফোকাসের কমনীয়তা, ফগ ফিলটার ব্যবহার করে কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব ও স্টার ফিলটার ব্যবহার করে রঙিন আলোর ঝলকানি সৃষ্টি করা যায়। পোলারাইজড ফিলটার ব্যবহার করা হয় ইমেজকে সমাবর্তিত আলোর প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য। বায়ুমণ্ডলে ও দূর দিগন্তে অতিবেগনি রশ্মিজনিত নীল আভা ও অস্পষ্টতা দূর করে ইমেজে অধিকতর বৈষম্য আনার জন্য বহির্দৃশ্যে, উঁচু পাহাড়ের উপর ও মেঘলা আবহাওয়ায় আলট্রাভায়োলেট ফিলটার ব্যবহার করা প্রয়োজন। সমস্ত ফিলটারই ইমেজের সমস্ত অংশকেই প্রভাবিত করে কিন্তু গ্র্যাজুয়েটেড ফিলটার ইমেজের একটি মাত্র বিশেষ অংশেই পরিবর্তন সাধন করে থাকে। ফিলটার ফিল্মের ওপর গিয়ে পড়া আলোর পরিমাণ কমিয়ে দেয় বলে ফিলটার ব্যবহার করা হলে আলোকপাতও আনুপাতিক হারে বাড়াতে হয়, কতটা বাড়াতে হবে তা নির্ভর করে ব্যবহৃত ফিলটারের ফিলটার ফ্যাক্টর-এর ওপর।

এই যে এত কলাকৌশলের কথা বলা হল, সিনেমাটোগ্রাফি—আগেই বলেছি—তাদের কোনো সহজ যোগফল নয়, এক সূক্ষ্ম-জটিল সমীকরণ। সেই বিষয়ে সামান্য কিছু কথা বলে এই নিবন্ধ শেষ করব।

ক্যামেরাম্যান, মুভি ফোটোগ্রাফার, বা ডিরেক্টর অব ফোটোগ্রাফি শুধুই ক্যামেরা নামক যন্ত্রটির ভারপ্রাপ্ত বা আলো নিয়ে খেলা করার এক খেলোয়াড় নন। তিনি হলেন দৃশ্যকে ফিল্ম-বন্দী করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। ফলে সেট ও লোকেশনের লাইটিং, দৃশ্যের সার্বিক কম্পোজিশন, ইমেজের বর্ণবিন্যাস, ক্যামেরা লেন্স ফিলটার ও ফিল্ম স্টকের নির্বাচন, ক্যামেরার সেটিং, সেট-আপ ও মুভমেন্ট নির্ধারণ, এবং যে-কোনো স্পেশাল ইফেক্টের অন্তর্ভুক্তি : সমস্ত কিছুর জন্যই তিনি দায়ী। প্রিন্ট তৈরির সময়ে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় তাতেও তাঁর বিশেষ ভূমিকা আছে। ছবির দৃশ্য থেকে দৃশ্যে একটা সার্বিক শৈলী বজায় রাখার এবং বর্ণ ও আলোর দিক থেকে প্রতিটি দৃশ্যের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করার দায়িত্বও তাঁর। যেহেতু শ্যুটিং চলাকালীন এই সমস্ত কিছুই তাঁকে মাথায় রাখতে হয়, তাই অনেক সময়ে ক্যামেরা চালনার কাজটি করেন সেকেণ্ড ক্যামেরাম্যান বা ক্যামেরা অপারেটর। ক্যামেরা অপারেটর ছাড়াও ডিরেক্টর অব ফোটোগ্রাফির থাকে একাধিক সহকারী ক্যামেরাম্যান। চিফ ইলেকট্রিসিয়ানও কাজ করেন তাঁরই তত্ত্বাবধানে। কোনো ছবির পরিকল্পনার স্তর থেকেই প্রধান চিত্রগ্রাহক ছবির কাজে অংশগ্রহণ শুরু করে দেন, প্রতিমার ধরন ও দৃশ্যশৈলী নিয়ে পরিচালকের সঙ্গে আলোচনা করেন,

ছবির দৃশ্যগত সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান কী হবে ও কীভাবে তা ব্যাখ্যা করেন। শিল্প-নির্দেশকের সঙ্গেও তাঁকে পরামর্শ করতে হয় সেট তৈরি (ক্যামেরা মুভমেণ্ট যাতে ব্যাহত না হয়), কম্পোজিশন, বর্ণ-বিন্যাস ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে। স্পেশাল-ইফেক্ট টিমের সঙ্গেও তাঁকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে কাজ করতে হয়। যদিও চিত্রপরিচালকই হচ্ছেন ছবির প্রধান নির্দেশক ও প্রয়োগপ্রধান, তবু পর্দায় প্রদর্শিত চিত্ররূপের গুণগত মান শেষ-পর্যন্ত নির্ভর করে ডিরেক্টর অব ফোটোগ্রাফির ওপরই। পরিচালক অনুসারে, ছবি থেকে ছবিতে, সিনেমাটোগ্রাফারের স্টাইল পাল্টায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও, শ্রেষ্ঠ সিনেমাটোগ্রাফারদের একটা নিজস্ব স্টাইল থাকেই, আলাদা-আলাদা ছবির সীমারেখার মধ্যেও একটা নিজস্ব সৃজনশীলতা, যা একজন চিত্রগ্রাহকের সমস্ত ছবিতেই লভ্য।

চলচ্চিত্রের প্রথম যুগে চিত্রগ্রহণের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলা হত নিছক ক্যামেরাম্যান, কেননা তাঁর কাজ ছিল শুধুই ক্যামেরা চালানো, পরে আলোকসম্পাতের প্রচলন ও বিকাশ হতে তাঁকে বলা হল লাইটিং ক্যামেরাম্যান। অবশেষে তিনি অভিহিত হলেন সিনেমাটোগ্রাফার নামে, এটা একদিকে তাঁর শৈল্পিক গুরুত্বের স্বীকৃতি, অন্যদিকে ফোটোগ্রাফার থেকে যে তিনি স্বতন্ত্র তার নির্দেশক। শব্দের আবির্ভাব হতে যখন আরও প্রাযুক্তিক জ্ঞানের প্রয়োজন হল ও শুরু হল একের বেশি ক্যামেরার ব্যবহার, তখন তাঁর নাম হল ডিরেক্টর অব ফোটোগ্রাফি। ডি. ডবলিউ. গ্রিফিথের ক্যামেরাম্যান বিলি বিটজারকে প্রথম উল্লেখযোগ্য চিত্রগ্রাহক রূপে ধরা হয়ে থাকে। ক্যামেরা সেট-আপ ও মুভমেণ্ট, আলোকসম্পাত এবং কাটিং-এর ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ-কৌশল আবিষ্কারে তাঁর অবদান আছে। প্যানক্রোমাটিক ফিল্মের প্রচলনের ফলে, John F. Seitz, James Wong Howe ও Karl Struss-এর মতো চিত্রগ্রাহকেরা প্রথাগত রোমাণ্টিক শৈলী থেকে সরে এসে নিজস্ব শৈলীর স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে লাগলেন। শব্দগ্রহণের জটিল ব্যবস্থার দরুন ক্যামেরা মুভমেণ্ট প্রথমে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু পরে সেই বাধা অপসারিত হতে, Karl Freund, Stanley Cortez ও Gregg Toland-এর মতো চিত্রগ্রাহকদের কাজের মধ্য দিয়ে সিনেমাটোগ্রাফির ক্রমবিকাশ হতে থাকল। ওয়াইড-স্ক্রিন সিনেমাটোগ্রাফির প্রবর্তন ও উন্নত কালার ফিল্মের প্রচলন হতে পঞ্চাশের দশকে ও ষাটের দশকের প্রথম দিকে চিত্রগ্রাহকরা নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলেন। যার বিভিন্ন শৈল্পিক সমাধান মিলল Leon Shamroy বা Lee Garmes-এর মতো চিত্রগ্রাহকদের আলোকচিত্রণকর্মে। বর্তমানে সিনেমাটোগ্রাফিতে আরও কাব্যিক ও আরও ব্যক্তিগত সব শৈলীর দেখা মিলছে, যা একদিকে উন্নত প্রযুক্তিকে সৃজনশীল ভাবে কাজে লাগাচ্ছে, অন্যদিকে রঙের ব্যবহারে, আলোকসম্পাতে ও ক্যামেরার বিভিন্ন কলাকৌশলের প্রয়োগে নানান মৌলিকত্ব ও সূক্ষ্মতা নিয়ে আসছে। যে সমস্ত ডিরেক্টর অব ফোটোগ্রাফির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য তাঁরা হলেন William Fraker, Haskell Wexler, John Alcott, Nestor Almendros, Sven Nykvist প্রমুখ। চিত্রগ্রাহক, চলচ্চিত্রের জন্মলগ্নে যেমন, আজও তেমনি, পরিচালকের ডান হাত।

চলচ্চিত্রে কম্পোজিশন

গ্রেগ টোলাণ্ড

চলচ্চিত্রে কম্পোজিশন সম্পর্কে, কম্পোজিশনে যথাযথ বিন্যাসের মনোযোগ আকর্ষণ করার ক্ষমতা, টোনগত বৈপরীত্য, আলোকসম্পাতের ভূমিকা ও গতিশীল কম্পোজিশন সম্পর্কে, পৃথক পৃথক উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। এই প্রবন্ধে তা করা হল।

স্থিরচিত্রের কম্পোজিশন থেকে চলচ্চিত্রের কম্পোজিশনের মূল পার্থক্য গতিতে। আলোকচিত্রের কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে যে-সমস্ত রীতিনীতি প্রচলিত তা চলচ্চিত্রের কম্পোজিশনের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু তার সঙ্গে অবশ্যই জড়িয়ে থাকা চাই গতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা, গতির ব্যবহার কীভাবে কম্পোজিশনের কাজে সাহায্য করে ও কীভাবে কম্পোজিশন গঠনে বাধাবিপত্তি হয়ে দেখা দেয় সে-সম্পর্কে সঠিক ধারণা।

যেমন ধরা যাক, একজন স্থির চিত্রগ্রাহক ও একজন চলচ্চিত্র গ্রাহক দুজনেই একই বিষয়ের ছবি তুলছেন—ওয়েস্টার্ন ল্যাণ্ডস্কেপের ছবি। দৃশ্যের পৃষ্ঠভূমিতে রয়েছে মেঘ ও সমতল প্রান্তর, মধ্যভূমিতে একপাল চারণরত পশু, পুরোভূমিতে ডানদিক ঘেঁষে এক কাউবয় আলস্যভরে মাটিতে শুয়ে আছে, তার চোখ পশুগুলোর দিকে, আর তার ঘোড়াটা শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে।

স্থিরচিত্রে কাউবয় ও ঘোড়ার অলস মূর্তির পৃষ্ঠভূমি হিশেবে মেঘ, প্রান্তর ও গবাদি পশুগুলি প্রায় একই ভাবে কাজ করে। এই কম্পোজিশনের কেন্দ্রীয় বস্তু অবশ্যই কাউবয় ও তার ঘোড়া, যাদের ঘিরে সমস্ত কিছু প্রকাশ পাচ্ছে স্থির শান্ততায়।

এই প্রায়-স্থির শটটি তুলতে গেলেও চলচ্চিত্র গ্রাহক কিন্তু সমস্যায় পড়বেন। কেননা এই দৃশ্যে সমগ্র কম্পোজিশনের ওপর সম্ভাব্য সমস্ত গতির কী প্রভাব তা তাঁকে আগে থেকেই ভেবে নিতে হবে। যেমন, মধ্যভূমিতে চারণরত পশুগুলির স্বাভাবিক নড়াচড়ার ফলে কি সম্পূর্ণ স্থির কিন্তু অধিক গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যবস্তু কাউবয় ও তার ঘোড়ার ওপর থেকে মনোযোগ পশুগুলোর দিকে সরে যাবে? যেতে পারে! ঘোড়াটার স্বাভাবিক নড়াচড়ার—মাথা ঝাঁকানো, লেজ নাড়া বা পা ঠোকার—ফলে কি কাউবয়ের ওপর থেকে মনোযোগ সরে যেতে পারে? পারে! উপরন্তু, ধরা যাক দৃশ্যে এরপর দেখা যাবে, কাউবয় ঘোড়ায় উঠে ঘোড়া ছোটালো। সে কোন্ দিকে ঘোড়া ছোটাবে? কম্পোজিশনের ওপর এই গতির কী প্রভাব পড়বে? সে কি ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসবে, না ক্যামেরা থেকে দূরে সরে যাবে, না ফ্রেমের ডানদিক বা বামদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে? সে কীভাবে ঘোড়াকে চালাবে—হাঁটাবে, ছোটাবে : দুলকি চালে না সবেগে? কেমন হবে

তার গতিপথটি— সরলরেখা, বক্ররেখা, না কোনাকুনি? ফ্রেমের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত কাউবয় ও ঘোড়ার ভারী গাঢ় ভর অপসৃত হওয়ার পর কম্পোজিশনের আর কী পড়ে থাকবে?

দৃশ্যগুণ সম্পর্কে সচেতন কোন চিত্রগ্রাহক যখনই কোন শটের ছবি তুলতে যান, তখনই এই ধরনের বহু প্রশ্ন এসে তাকে বিব্রত করে। স্বভাবতই সব সময়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করা যায় না। কিন্তু এই দিকগুলোর কথা কতটা ভাবা হয়েছিল, তাদের ফলাফল কতটা অনুমান করা গেছিল তার ওপরই নির্ভর করবে চূড়ান্ত দৃশ্যগ্রহণ চলচ্চিত্রসম্মত কম্পোজিশনের একটা ফলপ্রদ উদাহরণ হয়ে উঠতে পারছে কিনা। এখানে এ-কথাও স্পষ্ট করে বলার দরকার আছে যে, চলচ্চিত্রসম্মত কম্পোজিশনের কোনো নির্দিষ্ট ধরাবাঁধা নিয়ম নেই এবং এই বিষয়ে কোনো ব্যক্তিবিশেষের মতকে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করারও দরকার নেই। প্রকৃত বিশ্লেষণে, কম্পোজিশন হল ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার : একজনের কাছে যেটা ভালো কম্পোজিশন বলে মনে হচ্ছে অন্যের কাছে সেটা খারাপ লাগতে পারে। এবং দুজনেই নিজের মতো করে সঠিক হতে পারে।

জয় হেমব্রিজ যখন কম্পোজিশনের আলোচনায় গতিশীল ভারসাম্যের তত্ত্ব উত্থাপন করেছিলেন তখন থেকে সাম্প্রতিককালের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন রুশ চিত্রনির্মাতাদের আধুনিকতম বিশ্লেষণ পর্যন্ত, স্থিরচিত্র ও চলচ্চিত্রের কম্পোজিশন বিষয়ে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক আলোচনা প্রচুর হয়েছে, প্রয়োজনের চাইতে বেশিই হয়েছে। এর ফলে কম্পোজিশনের প্রকৃত সৃজনশীল ও শৈল্পিক দিকটি মার খেয়েছে। আজ এমন অনেক লোকের দেখা মিলবে যারা চিত্ররূপের যে-কোনো আলোচনায় বিজ্ঞের মতো টেনে আনে জ্যামিতিক রেখা, আকার, ভর ও নকশার প্রসঙ্গ, কিন্তু যাদের নিজেদের তোলা ছবি হচ্ছে ভীষণ আড়ষ্ট ও একঘেয়ে। আবার এমন লোকও আছে যারা ভাররেখা কী বা আলোছায়ার বিভাজন কাকে বলে কিছুই না জেনেও প্রকৃত চিত্তাকর্ষক ছবি তোলার অব্যর্থ ক্ষমতা রাখেন।

সেই কারণেই আমি আশা করবো, আমার মন্তব্যকে আপ্তবাক্য বলে ধরে না নিয়ে এবং তাকে অন্ধের মতো অনুসরণ না করে; আমার বক্তব্যকে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাধারণ পরামর্শ রূপে গ্রহণ করতে, যার ফলে চলচ্চিত্রসম্মত কম্পোজিশন গঠন করা সহজ হতে পারে এবং কম্পোজিশনগত বিভিন্ন বাধাবিপত্তি কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে।

চিত্রকলা বা আলোকচিত্র, স্থিরচিত্র বা চলচ্চিত্র—যে-কোনো ধরনের কম্পোজিশনেরই মূল কথা হল ছবির ফ্রেমের মধ্যে সমস্ত উপাদানকে এমন ভাবে সাজানো যাতে চিত্রগ্রাহক দর্শকের দৃষ্টিকে যেখানে কেন্দ্রীভূত করতে চাইছেন দর্শকের দৃষ্টি সেইভাবেই আকৃষ্ট হয়। সঠিক দৃষ্টি-আকর্ষণের দুটি পদ্ধতি হল যথাযথ অবস্থাপন ও টোনগত বৈপরীত্য, চলচ্চিত্রে, স্থিরচিত্রেও, তৃতীয় পদ্ধতিটি চলচ্চিত্রের নিজস্ব পদ্ধতি, তা হল গতিময়তা।

অবস্থাপন বা বিন্যাস

আমরা কম্পোজিশনের এই কলাকৌশলগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করে দেখছি। এদের প্রথমটি হল অবস্থাপন বা বিন্যাস। ছবির ফ্রেমের মধ্যে ছবির কেন্দ্রীয় বস্তুটিকে কোন্ অবস্থানে রাখা হবে এবং ছবির অন্যান্য অংশের সঙ্গে তার মধ্যবর্তী সম্পর্ক কী হবে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ছবির কেন্দ্রীয় বস্তুর সবচেয়ে স্বাভাবিক স্থান হওয়া উচিত ফ্রেমের মধ্যস্থল। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, তা একেবারে গাণিতিক ভাবে ফ্রেমের কেন্দ্রস্থল হওয়া চাই। অনেক সময়েই সামান্য বিচ্যুতি বিন্যাসকে আরো দৃষ্টিনন্দন ও চিত্তাকর্ষক করে তোলে, এবং এর ফলে দর্শকের দৃষ্টি-আকর্ষণ করার কাজও কোনোভাবে ব্যাহত হয় না। কেন্দ্রীয় বস্তুর

এই অবস্থান সাধারণত হয় ফ্রেমের নিম্ন প্রান্তের বামদিক থেকে ফ্রেমের ঊর্ধ্বপ্রান্তের ডানদিক পর্যন্ত যে কর্ণরেখা মোটামুটি তার ওপর ও ফ্রেমের ক্ষেত্রফলের যে এক-তৃতীয়াংশ ঊর্ধ্বপ্রান্তের ডানদিকের অংশ মোটামুটি সেই অংশে।

অবশ্যই যদি কেউ ফিল্ম স্টিলের অ্যালবামের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে যায়, তাহলে সুগঠিত এমন অনেক কম্পোজিশনের দেখা পাবে যেখানে উপরোক্ত নিয়ম মানা হয় নি। আর সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রায় সবক্ষেত্রে এও দেখা যাবে যে, ওই বিশেষ অবস্থানে রয়েছে যথেষ্ট গুরুত্বসম্পন্ন এমন কোনো স্পষ্ট রেখা, টোন বা ভর যা কম্পোজিশনের মধ্যে কেন্দ্রীয় বস্তুটি কোনো অচলিত স্থানে অবস্থান করলে দর্শকের দৃষ্টিকে সেই স্থানের দিকে চালিত করে নিয়ে আসে।

ছবির কেন্দ্রীয় বস্তুর দিকে দর্শকের দৃষ্টি কীভাবে আকৃষ্ট হবে তা সবিশেষ নির্ভর করে কেন্দ্রীয় বস্তুর চারপাশের অংশগুলির বিন্যাসের ওপর। এ-কথা লং শটের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যেমন, ১৬ মিমি বা ৮ মিমি-তে তোলা পারিবারিক ভ্রমণচিত্রে লং শটে যে প্রাকৃতিক দৃশ্য হরদম দেখা যায়, তাতে পারিপার্শ্বিকতা ও গভীরতার বোধ অনেক বেশি আসবে যদি কম্পোজিশন এমন ভাবে পরিকল্পিত হয় যাতে ছবির মধ্যে অন্তত দুটি স্পষ্ট তল থাকে— পুরোভূমি ও দূরভূমি। এটা সহজেই করা সম্ভব যদি দৃশ্যবস্তুগুলিকে এমনভাবে সাজানো যায় যাতে পুরোভূমি (সিলুয়েটে হলেই ভালো) দূর-ভূমির ফ্রেম হিশেবে কাজ করে এবং ছবির কেন্দ্রীয় বস্তুটি থাকে ওই দূরভূমিতে। এই ফ্রেম সম্পূর্ণ ফ্রেমও হতে পারে, আবার আংশিকও হতে পারে। খাদ বা উপত্যকার কোনো শট অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক হবে এবং আয়তন ও গভীরতার বোধ তাতে অনেক বেশি বাড়বে যদি পুরোভূমির দুটি পাথরের বা গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে দৃশ্যটি নেওয়া হয়, পুরোভূমি বাদ দিয়ে দৃশ্যটি তুললে তা ন্যাড়া দেখাবে।

এই কথা যে-কোনো লং শটের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সে স্টুডিওর ইনডোর দৃশ্য বা হোম মুভিতে ঘরের ভিতরকার দৃশ্য—যাই হোক না কেন। যদি পাশের কোনো ঘরের খিলানের মধ্য দিয়ে বা এমন কি টেবল ল্যাম্পের ফ্রেমের বা কোনো আসবাবের ফাঁকের ভিতর দিয়েও ছবি তোলা যায় তাহলে সোজাসুজি ছবি তোলার চাইতে তা অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক হবে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা যায়, বহু পেশাদার চিত্রগ্রাহক আউটডোর শ্যুটিংয়ের কাজে যাঁরা বিশেষজ্ঞ (যেমন যাঁরা ওয়েস্টার্ন ছবির চিত্রগ্রাহক, ইত্যাদি), তাঁরা ছবিতে এই ভাবে লংশট নেবেন বলে আগে থেকে লোকেশনে গিয়ে অনুরূপ ভাবে শট নেবার স্বাভাবিক ব্যবস্থা না থাকলে কৃত্রিম ব্যবস্থা করে আসেন : হয়তো তাঁরা গাছের গোটা দুই ডাল সঙ্গে নিয়ে যান, যাতে দরকারমতো অনুরূপ ফ্রেম তৈরি করে নেওয়া যায়।

টোনগত বৈপরীত্য এবং আলোকসম্পাত

দৃষ্টি-আকর্ষণ করার কম্পোজিশনগত দ্বিতীয় পদ্ধতি হল কম্পোজিশনে টোনগত বৈপরীত্য এবং আলোকসম্পাতের বিশেষ সাহায্য নেওয়া। অধিকাংশ ছবিতে সবচেয়ে হালকা টোনের অংশ বা বস্তুটিই দর্শকের দৃষ্টিকে প্রথমে আকৃষ্ট করে নেয়। তা ওই অংশ বা বস্তুর অবস্থান নিরপেক্ষে ঘটে থাকে। ফলে আমরা যদি ছবির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু, ব্যক্তি বা অংশটিকে সবচেয়ে হালকা টোনেও রাখতে পারি তাহলে অনায়াসেই দর্শকের দৃষ্টি সেই দিকে প্রথম আকৃষ্ট হবে। আর এর সঙ্গে যদি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের সুবিধাটিও যুক্ত করা যায় তাহলে তো আর কথাই নেই।

চলচ্চিত্রে এবং স্থিরচিত্রেও এটা করার দুটো প্রধান উপায় আছে। প্রথমত এবং সেটাই অধিক

প্রত্যক্ষ উপায়—প্রয়োজনীয় বস্তুটিকে নিজস্বতই সবচেয়ে হালকা টোনে রাখা। যেমন হালকা রঙের পোশাক পরা কোনো তরুণী ফ্রেমে অবশ্যই সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হবে যদি তার পৃষ্ঠভূমি হয় গাঢ় টোনের, তা সে ঘরের দেয়াল কি বাইরের ঝোপঝাড় যাই হোক না কেন। দৃশ্যে সে-ই সবচেয়ে হালকা টোনের বস্তু, ফলে দর্শকের দৃষ্টি আপনা থেকেই তার ওপর গিয়ে পড়ে।

এই কারণেই বহু ওয়েস্টার্ন ছবিতে কাউবয় নায়ক হালকা রঙের পোশাক পরে ও শাদা ঘোড়ায় চেপে ঘোরে। আর অপ্রধান চরিত্রগুলি, বিশেষত খল চরিত্রেরা উগ্র রঙের পোশাক পরে ও তাদের ঘোড়াগুলোর রঙও হয় গাঢ়তর। এই কারণেই আমাদের নায়িকাদের অনেকেরই চুল কালো না হয়ে সোনালি (সে স্বাভাবিক বা কৃত্রিমভাবে যাই হোক না কেন), কেননা এই হালকা চুল দর্শকের দৃষ্টিকে অধিক আকর্ষণ করে।

আমরা প্রায় অনুরূপ ফলাফল পেতে পারি, হয়তো কিছু বেশি করেই পেতে পারি আলোকসম্পাতের মাধ্যমে। যদি ফ্রেমের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি, বস্তু বা দৃশ্যটিকে পৃষ্ঠভূমি থেকে বা চারপাশের অন্যান্য বস্তু বা ব্যক্তি থেকে অধিক আলোকিত করা হয় তাহলে ছবিতে তাকে সবচেয়ে হালকা টোনের লাগবে ও তার ফলে তা হয়ে উঠবে কম্পোজিশনের সবচেয়ে জোরালো অংশ।

আপনি এরপর যখন ছবি দেখতে যাবেন তখন লক্ষ্য করে দেখবেন কীভাবে দৃশ্যের পর দৃশ্যে এই ব্যাপারগুলো ঘটছে। প্রয়োজনীয় অংশটি শুধু দৃশ্যত সবচেয়ে স্পষ্ট নয়, কার্যতও সবচেয়ে জোরালো হয়ে উঠছে।

এই প্রসঙ্গেই আসে চলচ্চিত্রের কম্পোজিশনের আর একটা বিশেষ সমস্যার কথা : আলোকসম্পাতের ধারাবাহিকতার কথা। যদি প্রতিটি দৃশ্যকে তার নিজস্ব কম্পোজিশনের প্রয়োজনে আলোকিত করলেই চলতো তাহলে ব্যাপারটা হতে পারতো অনেক সোজা। কিন্তু প্রতিটি দৃশ্যের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ করতে হয় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দৃশ্যগুলির কথা মাথায় রেখে। ফলে যদিও কোনো একটি দৃশ্যে কম্পোজিশনের একটি বিশেষ অংশকে চিহ্নিত করার জন্য হয়তো গাঢ় টোনের একটা অঞ্চল তৈরি করা দরকার, তবু এই প্রয়োজনকে বিচার করতে হবে ওই দৃশ্য-পর্যায়ের সমস্ত দৃশ্য ধরে আলোকসম্পাতের এই পদ্ধতি ধারাবাহিক ভাবে অনুসরণ করা যাবে কিনা তা দিয়ে।

গতির উপর জোর

তৃতীয় এবং কোনো কোনো দিক দিয়ে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ও চিত্তাকর্ষক পদ্ধতি হল গতির উপর জোর দিয়ে কম্পোজিশনকে জোরালো করা। বলা বাহুল্য, এটা একমাত্র চলচ্চিত্রের কম্পোজিশনেরই প্রসঙ্গ। চলচ্চিত্র গ্রাহকের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল এই গতি, এবং একই সঙ্গে সবচেয়ে বড় সমস্যা। স্থিরচিত্রে রঙ যেমন, এ ক্ষেত্রে গতিও তেমনি অনন্য সুন্দর বা ভীষণ ব্যাঘাতদায়ক, যে-কোনোটি হতে পারে। মূল বিষয় হল গতির প্রভাব ও ফলাফলকে বুঝতে পারা ও নিয়ন্ত্রণ করতে শেখা।

যে-কোনো গতিশীল বস্তু স্থির বস্তুর তুলনায় দৃষ্টিকে অধিক আকর্ষণ করে থাকে। একথা স্থির বস্তুর অবস্থান, টোনগত অবস্থা ও আলোকনের পরিমাণ নিরপেক্ষে সত্য। সুতরাং চলচ্চিত্র গ্রাহকের সমস্যা দ্বিমুখী : একদিকে তাঁর কেন্দ্রীয় বস্তুকে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি-আকর্ষক গতি দিতে হবে, অন্যদিকে দেখতে হবে যাতে ফ্রেমের অন্য কোথাও কোনো আনুষঙ্গিক কিন্তু অবাঞ্ছিত গতি দৃশ্যকে প্রকৃত বক্তব্য থেকে সরিয়ে আনতে না পারে।

অবাঞ্ছিত গতি : আমাদের হলিউডের অভিনেতারা এ-কথাটা বেশ ভালো ভাবেই জেনে গিয়েছেন। এদের কেউ কেউ এই শিক্ষাকে অত্যন্ত বিরক্তিকর ভাবে ব্যবহারও করেন। তাদের খুব সামান্য, আপাত স্বাভাবিক গতি চূড়ান্ত মুহূর্তে তাদের ওপর মনোযোগ কেড়ে এনেছে যখন কিনা ওই দৃশ্যে অন্য কোনো অভিনেতার নাটকীয় ও কম্পোজিশনগত প্রাধান্য পাবার কথা। এই ধরনের গতি অসামান্য না হলেও চলে। নিজের ওপর মনোযোগ কেড়ে আনার জন্য কোনো অভিনেতা হয়তো গা চুলকোন, কেউ হাই তোলেন, আর কেউ সহ অভিনেতার কথায় বা কাজে 'রিয়্যাক্ট' করেন সুতীব্রভাবে। এই রকম কয়েক শো আপাত স্বাভাবিক আচরণ রয়েছে যা দিয়ে সহ অভিনেতার ওপর থেকে নিজের ওপর মনোযোগ টেনে নেওয়া যায়।

যারা হোম মুভি বানান তাদের এই সমস্ত সমস্যায় পড়তে হয় না কিন্তু ফলপ্রদ কম্পোজিশনের জন্য তাদের সমস্ত সতর্ক পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে যদি কম্পোজিশনের বেঠিক জায়গায় কোনো-না-কোনো ভাবে অবাঞ্ছিত গতি দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, এই ধরনের ছবিতে বহু দৃশ্যই মার খায় পৃষ্ঠভূমিতে অপ্রাসঙ্গিক গতি দেখা দেয় বলে। যেমন, বাড়ির সামনের লনে একটা দৃশ্যের ছবি তোলার সময় তিন চারখানা বাড়ির দূরত্বে রাস্তার ওপর যে অবাঞ্ছিত গতিবিশিষ্ট কিছু একটা ঘটছে তা চূড়ান্ত প্রিন্ট না দেখা পর্যন্ত বোঝা যায় না। আমার এক বন্ধু বাড়ির লনে সুন্দর এক তরুণীকে নিয়ে ছবি তোলার সময় পৃষ্ঠভূমির ওপর নজর রাখতে ভুলে গেছিল। ফলে তার ছবিতে মেয়েটি যেই হাঁটতে শুরু করলো অমনি দূরের গলি দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেল। পর্দায় দেখে ঠিক মনে হয় মেয়েটি যেন গাড়িটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে!

ক্ষুদ্রতর, কম প্রত্যক্ষ আরো অনেক গতি কম্পোজিশনে অনুপ্রবেশ করতে পারে। ঘোড়ার পাশে থাকা কোনো লোকের ক্লোজ শট নেওয়ার সময় তাই খেয়াল রাখতে হবে ঘোড়ার মাথা আর লেজের নড়াচড়ায় লোকটার ওপর থেকে নজর যেন সরে না যায়। সমুদ্র তীরবর্তী দৃশ্যের ছবি তোলার সময় জলপৃষ্ঠে শাদা কালো রেখার ছান্দিক গতি তীরের উপরস্থ মানুষের ওপর থেকে (কম্পোজিশন যতই সুগঠিত হোক না কেন) দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারে। এমন কি ইনডোর দৃশ্যেও অবাঞ্ছিত আনুষঙ্গিক গতির দিকে কড়া নজর রাখা দরকার। অনেক সময়ই ঘড়ির পেণ্ডুলামের দোলন বা ছোট্ট কোনো মোমবাতির শিখার কাঁপন, ছবি তোলার সময় চোখে না পড়লেও, চূড়ান্ত কম্পোজিশনে খুবই অস্বস্তিকর মনে হতে পারে।

পরিকল্পিত গতি : চলচ্চিত্রের কম্পোজিশনে গতির ব্যবহার সদর্থক ও নঞর্থক দুইই হতে পারে। যেমন কোনো একটা নির্দিষ্ট রেখা বরাবর গতিময়তা দর্শকের দৃষ্টিকে যেন সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে চলে বা দর্শকের দৃষ্টি যেন সেই গতিপথের আগে আগেই চলে। এক্ষেত্রে গতি হল কম্পোজিশনের পরিলেখের এক প্রকার নির্দেশক। নিউইংলণ্ডের একটা প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা কল্পনা করুন, সুগঠিত এক কম্পোজিশনে সামনে পুরোভূমিতে গাছপালা, এক ফালি শাদা রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে দূরের গ্রামের দিকে। সাধারণত, রাস্তার শাদা রেখাটাই কম্পোজিশনে সবচেয়ে জোরালো উপাদান হওয়া উচিত। কিন্তু যদি রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি গ্রামের দিকে এগিয়ে চলে তাহলে গাড়ির এই গতির দরুন দর্শকের দৃষ্টি রাস্তা বরাবর গাড়ির আগে আগে গ্রামের উপর গিয়ে বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত হবে। এর ফলে মানসিক যুক্তিক্রম অনুসারে দর্শক পরবর্তী দৃশ্য গ্রামে ঘটবে বলে প্রস্তুত হয়ে থাকে। এটা ঘটবে গাড়িটাকে গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছতে না দেখালেও, গাড়িটা রাস্তা ধরে গ্রামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে শুধু এটুকু দেখালেও। মনে আছে, 'স্টেজকোচ' ছবিতে আরিজোনার মরুভূমির ওপর দিয়ে ওয়াগনের সশব্দে এগিয়ে আসার অপূর্ব সুন্দর লং শটে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিশাল বিপুলতা ও সুগম্ভীর রাজকীয়তা এবং চমৎকার মেঘরাশির

চিত্রসুলভ সৌন্দর্য সত্ত্বেও ক্ষুদ্রাকার ওয়াগনটির সচল মূর্তিই কম্পোজিশনে সবসময়ে সবচেয়ে জোরালো উপাদান হয়ে থেকেছে। ওয়াগনটার গতি সম্পর্কে দর্শক সর্বদাই সচেতন থেকেছে, যদিও কোনো লং শটই পর্দায় এতক্ষণ ধরে দেখানো হয়নি যাতে ওয়াগনটাকে ফ্রেমের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত রাস্তা পুরোটা যেতে দেখা যায়।

পর পর দৃশ্যে বিভিন্ন চরিত্র বা বস্তুকে পর্দায় বিপরীত অভিমুখে গতিশীল দেখা গেলে সেই গতি ও কম্পোজিশনের ব্যবহার এই ধারণা তৈরি করতে পারে যে ব্যক্তিদ্বয় বা বস্তুদুটি পরস্পরের দিকে এগিয়ে চলেছে, সম্ভবত দ্বন্দ্ব বা বিবাদের জন্য। দুটি ট্রেনকে পর পর দৃশ্যে এইভাবে পরস্পরের দিকে এগিয়ে যেতে দেখলে দর্শকের ধারণা হবে—এইবার মুখোমুখি একটা সঙ্ঘর্ষ ঘটবে। দুটি মানুষকেও পর পর দৃশ্যে এইভাবে পরস্পরের দিকে এগোতে দেখলে একটা চরম সাক্ষাৎ ও সঙ্ঘাতের দৃশ্যের জন্য মন প্রস্তুত হয়ে ওঠে, অসংখ্য ওয়েস্টার্ন ছবির চূড়ান্ত দৃশ্যে যে রকম ঘটে।

একই দৃশ্যের মধ্যে বিপরীত গতি, তা সে সরল, বক্র বা কর্ণ যে-অভিমুখেই হোক না কেন তা কম্পোজিশনকে এইভাবে সমৃদ্ধ করে যে দর্শকের চোখ এই দুই গতির মধ্যে যে মিলনবিন্দু রয়েছে তার দিকে চালিত হয়। জলের মধ্যে কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে ছড়িয়ে যাওয়া তিরতিরে ঢেউ চোখকে টেনে ধরে বিপরীত অভিমুখে সেই কেন্দ্রবিন্দুর দিকে যেখানে ঢিলটি পড়েছিল। এইভাবে কেন্দ্র থেকে পরিধি অভিমুখে বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়া গতিরেখা কেন্দ্রবিন্দুর প্রতি দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে। স্পষ্ট গতিপথ ধরে এগিয়ে চলা দুটি কি তিনটি গতি, তা তারা অপসারী বা অভিসারী যাই হোক না কেন, দৃষ্টিকে চালিত করে গতিপথগুলির ছেদবিন্দুর দিকে।

গতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আর একটা জরুরি প্রসঙ্গ হল এই : একই কম্পোজিশনের মধ্যে একাধিক গতি থাকলে সবচেয়ে অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত গতিটিই দৃষ্টিকে সম্ভবত সর্বাধিক আকর্ষণ করবে। যেমন নায়াগ্রা জলপ্রপাতে জলধারার পতন : এই দৃশ্যটি চিত্রায়িত করতে গেলে স্বভাবতই মনে হয় জলরাশির সশব্দ নিম্নগামী গতিই এই শটে প্রধান গতিময়তা হতে বাধ্য। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, জলপ্রপাতের নিচ থেকে উঠে আসা ধোঁয়াশার ঊর্ধ্বগামী অপ্রত্যাশিত গতিই দৃষ্টিকে বেশি আকৃষ্ট করে নিচ্ছে।

এ-কথাও মনে রাখা দরকার, গতির হঠাৎ থেমে যাওয়া, বৃন্দবাদনের মধ্যে আকস্মিক বিরতি যেমন, পর্দায় কোনো দৃশ্যের দৃশ্যগুণকে আরো জোরদার করে তুলতে পারে। ধরা যাক, কোনো স্ত্রৈণ স্বামীকে নিয়ে একটা কমিক দৃশ্য তোলা হচ্ছে। দৃশ্যে স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পেয়ে গেছে বাড়ির কাছের দোকানে সেলস বয়দের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলার জন্য, আর তখন তাকে খুঁজতে খুঁজতে স্ত্রী এসে হঠাৎ হাজির সেখানে। আমাদের দৃশ্যের কম্পোজিশন স্বাভাবিক ভাবেই হবে এইরকম : কথোপকথনরত দলটির মাঝখানে স্বামী। এখন স্ত্রীর আকস্মিক আবির্ভাবকে আরো জোরদার করে তোলার জন্য আমরা ফ্রেমের পুরোভূমিতে তাকে আনবো, কেননা দৃশ্যবস্তু ক্যামেরার নিকটে অবস্থান করলে তা প্রায়ই জোরালো রূপ পায়। তারপর স্ত্রী যেই ফ্রেমের মধ্যে কিছুটা ঢুকে গিয়েছে কিন্তু স্বামী তখনও তাকে দেখতে পায় নি, তখন স্ত্রীর ওপর ক্যামেরা বিশদ দৃষ্টি দেবে। ফ্রেমের মধ্যে ছুটে ঢুকে গিয়ে স্ত্রী থমকে দাঁড়াবে, এতক্ষণে স্বামীকে খুঁজে পেয়েছে, যেন এক দমবন্ধ অবস্থা, তারপর—গতিভঙ্গির আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে যখন তার ওপর দর্শকের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয়েছে—ফের ছুটে গিয়ে চকিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে স্বামীর ওপর।

ফিল্ম-ফ্রেমের অনুপাত

চলচ্চিত্রের কম্পোজিশনের আলোচনা ফিল্ম-ফ্রেমের অনুপাতের উল্লেখ ব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ থাকে। ফিল্ম-ফ্রেমের অনুপাত নির্দিষ্ট তথা নিয়ত-পরিবর্তনশীল। স্থিরচিত্রে আমরা, ক্যামেরাকে ঘুরিয়ে ব্যবহার করে, ক্যামেরার পেছনের অংশকে আগুপিছু করে, বা ক্রপিং ও ট্রিমিং-এর মাধ্যমে, ফ্রেমের আকারকে কম্পোজিশনের প্রয়োজনমতো অদল-বদল করতে পারি। ফ্রেমকে আমরা যেমন দরকার—বর্গাকার, আয়তাকার, ডিম্বাকার, অনুভূমিক, উল্লম্ব—সমস্ত রকম করতে পারি। কিন্তু চলচ্চিত্রে, ৩৫ মিমি, ১৬ মিমি, ৮ মিমি, যাই হোক না কেন, ফ্রেমের আকার সুনির্দিষ্ট—তা ৩ : ৪ অনুপাতের এক অনুভূমিক আয়তক্ষেত্র। আমরা কম্পোজিশনে এই অনুপাতের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য উপরের, নিচের ও দুই ধারের কিছু কিছু অঞ্চল আলোকসম্পাতের কায়দায় ছায়াচ্ছন্ন করে দিতে পারি, কিন্তু চলচ্চিত্রের সমস্ত কম্পোজিশনের মূল ফর্ম্যাট হিশেবে ওই ৩ : ৪ অনুপাত থেকে যায়।

সুতরাং চলচ্চিত্র গ্রাহককে একদিকে গোটা ফ্রেমের (অনুপাত ও ক্ষেত্রফলের) পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কম্পোজিশনকে পরিকল্পিত করতে হবে, আবার অন্যদিকে এমনভাবে সেই কম্পোজিশনের বিন্যাস ঘটাতে হবে যাতে ফ্রেমের অংশবিশেষকে মূল কম্পোজিশনের বাইরে রাখলেও খারাপ না দেখায়। সত্যি, এটা করা কঠিন, কিন্তু করা সম্ভব এবং চলচ্চিত্রের কম্পোজিশনকে সার্থক করে তুলতে হলে তা করতে হবে। নির্দিষ্ট মাপের ফ্রেম ও গতিজনিত সমস্যার ফলে চলচ্চিত্রের কম্পোজিশনের জটিলতা অনেক, কিন্তু সেই জটিলতা এমন দুর্লঙ্ঘ্য নয়, যে চলচ্চিত্র গ্রাহক রুচি ও বুদ্ধি দিয়ে তার সমাধান করতে পারবেন না।



হলিউডের ক্যামেরাশৈলী—একটি নান্দনিক বিচার

বীরেন দাশশর্মা

হেনরি ফক্স ট্যালবট, ফোটোগ্রাফির অন্যতম স্রষ্টা, আঠারোশো উনচল্লিশ সালে তাঁর নোটবুকে বাস্তবের প্রতিচ্ছবি গ্রহণের এই অসাধারণ প্রযুক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ফোটোগ্রাফিকে 'words of light' বলে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে ফোটোগ্রাফি আসলে আলোর সাহায্যে লেখা— আর ক্যামেরা 'pencil of nature' মাত্র। ট্যালবটের নোটবুক প্রমাণ করে যে ফোটোগ্রাফি নামক নতুন মাধ্যমটি নিছক কারিগরি প্রযুক্তি নয়, ক্যামেরা শুধুমাত্র এক বিশেষ 'যন্ত্র' নয়— এখানে প্রযুক্তি, ছবি, ভাষা ও মানুষের সহজাত প্রকাশভঙ্গির এক অনন্যসাধারণ সমন্বয় ঘটেছে। পরবর্তীকালে, ওয়াল্টার বেঞ্জামিন ফোটোগ্রাফিকে যখন 'first truly revolutionary means of reproduction' বলেন, তখন তিনিও ফোটোগ্রাফির ভাষাগত বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে নেন। ক্যামেরার মধ্যে দিয়ে শুধু চিত্রগ্রহণ নয়, 'রচনা' করার বিষয়টিকে বেঞ্জামিন যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে দেখান যে চিত্রভাষার সঙ্গে মতাদর্শের এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। একথা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে ফোটোগ্রাফি থেকে সিনেমাটোগ্রাফি, অর্থাৎ চিত্র থেকে চলচ্চিত্রের বিবর্তন একভাবে দেখলে বস্তুত আলোর বর্ণমালা থেকে আলোর চিত্রনাট্যেরও বিবর্তনের ইতিহাস। এই বিবর্তনের ইতিহাসে হলিউড এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে সন্দেহ নেই। নির্বাক যুগের অসংগঠিত চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাসকে যদি আমরা মূলতঃ মাধ্যমটির প্রকরণগত ও প্রযুক্তিগত পরীক্ষা নিরীক্ষার সাহায্যে এই দৃশ্য-ভাষা সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে সবাক যুগে সেই ভাষা যে এক সংগঠিত রূপ পেয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ক্যামেরা নামক 'প্রকৃতির পেনসিল' হলিউডে ব্যবহৃত হয়েছে এক নিজস্ব ধারায়, সৃষ্টি করেছে এক নিজস্ব বাচনভঙ্গি এবং এক নিজস্ব ভাষা।

চলচ্চিত্র ভাষার অন্যতম স্রষ্টা ডি. ডাব্লিউ. গ্রিফিথ তাঁর নিজস্ব বাচনভঙ্গি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে তিনি শুধু মাত্র 'দেখাতে' চেয়েছেন— এখানে 'দেখানো' অর্থে গ্রিফিথ চলচ্চিত্র-ভাষাকে ব্যবহার করার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিকে, ক্যামেরাকে অভিনবভাবে প্রয়োগ করার যথার্থতাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। প্রাত্যহিক জীবনের 'দেখা' এবং চলচ্চিত্রায়িত জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখার মধ্যে যে গুণগত, প্রকরণগত, ভাষাগত পার্থক্য রয়েছে গ্রিফিথ নানাভাবে তা তাঁর ছবির মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন বারংবার। গ্রিফিথের হাত ধরেই হলিউডের চিত্রভাষার সৃষ্টি, দৃশ্য রচনার নির্দিষ্ট ব্যাকরণের উদ্ভব।



চিত্রগ্রহণের ক্ষেত্রে চিত্রগ্রাহক কিভাবে কাজ করবেন, কিভাবে দৃশ্য রচনা করবেন, আলো এবং রঙের ব্যবহার করবেন, শট ও কম্পোজিশন সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেবেন তা অনেকটাই কারিগরি প্রকরণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ক্যামেরার মডেল, ব্যবহৃত ফিল্মের মান, প্রাপ্তব্য লেন্স, আলো— ইত্যাদি নানা প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা অথবা সম্ভাবনা চিত্রগ্রাহককে প্রভাবিত করে একটি ছবির নান্দনিক রূপ ঠিক করতে সাহায্য করে। চলচ্চিত্র প্রযুক্তির সঙ্গে চিত্রায়িত ছবির নান্দনিক রূপের সম্পর্কটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাক যুগের গোড়া থেকে যদি ধারাবাহিক ভাবে দৃশ্যগ্রহণের কৌশল এবং শিল্পী হিসাবে ক্যামেরাম্যানদের বিশিষ্ট হয়ে ওঠার বিবর্তনকে পর্যালোচনা করা যায় তাহলে আমরা দেখতে পাব কিভাবে চিত্রগ্রাহকরা প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছবির পর ছবিতে নান্দনিক মাত্রা যুক্ত করবার ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। নির্বাক যুগের হাতে ঘোরানো ক্যামেরা ছিল হালকা এবং বহনযোগ্য। ব্যবহৃত ফিল্মের দৈর্ঘ্য ছিল ছোট, এবং ফিল্ম যথেষ্ট আলোক-সংবেদনশীল ছিল না। এর ফলে ক্যামেরা ছিল প্রচণ্ড রকমের সর্বত্রগামী, প্রতিটি শটের দৈর্ঘ্য হত ছোট, হাতে ঘোরানোর ফলে এক্সপোজারের তারতম্য হতো এবং চলমান বস্তু বা মানুষের গতি বাস্তবানুগ হত না। কাঁচা ফিল্মের গুণগত মান উন্নত না হওয়ায় সমস্ত রঙ ঠিকভাবে ধরা পড়তো না সাদা কালো ছবিতে। এর ফলে প্রায়ই দরকার হতো চড়া মেক-আপের। সব মিলিয়ে গৃহীত ছবি যথার্থ বাস্তবানুগ হয়ে উঠতে পারতো না। নির্বাক যুগের কমেডি ছবিতে দেখা যায় কিভাবে সমকালীন ক্যামেরাম্যান এবং পরিচালকরা ক্যামেরার প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতাকে ব্যবহার করে এক অসাধারণ চলচ্চিত্র ধারার (Genre) সৃষ্টি করেছেন। নির্বাক যুগের কমেডি ছবির প্রচণ্ড গতিশীল, ঘটনাবহুল, 'নৈরাজ্যময়' জগৎ— যেখানে আধুনিক, সভ্য সমাজকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের কঠোর শরাঘাতে জর্জরিত করা হচ্ছে— নির্মিত

হয়েছে চলচ্চিত্র প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতার মধ্যেই একটি বিশিষ্ট চলচ্চিত্র-ভাষা তৈরি করার প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে। একই প্রকরণগত, প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করে গ্রিফিথ ও তাঁর ক্যামেরাম্যান বিলি বিৎজার চলে গেছেন কমেডি ছবির সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। গ্রিফিথের সুচারু শট-ডিভিশন এক অর্থে পাশ্চাত্যের সামাজিক জীবনের মধ্যে থেকেই উঠে আসা, পাশ্চাত্য সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের ধারণার মধ্যে মিডশট, ক্লোজ-আপ ও বিগ ক্লোজ-আপের অদৃশ্য বিভাজন সামাজিকভাবে স্বীকৃত। শট ডিভিশন বস্তুত দূরত্ব ও নৈকট্যকে চিহ্নিত করে— ব্যক্তির (দর্শক) সঙ্গে ব্যক্তির (ছবির চরিত্র) সম্পর্ক তৈরি করে। গ্রিফিথ যে ভাবে মেরি পিকফোর্ডের বিগ ক্লোজ-আপ ব্যবহার করেন 'ব্রোকেন ব্লসমস্' ছবিতে সেখানে দর্শক সামাজিকতার দূরত্ব ঘুচিয়ে মেরি পিকফোর্ডের অত্যন্ত কাছে চলে আসেন, তাঁর যন্ত্রণার শরিক হয়ে যান। দৃশ্য বিন্যাসের নন্দনতত্ত্বের মধ্যে নিহিত এই সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ চলচ্চিত্রের আলোচনায় এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

চলচ্চিত্রে প্রযুক্তির সঙ্গে নান্দনিকতার যোগসূত্র নিয়ে অসাধারণ মন্তব্য রয়েছে বাস্টার কিটনের নির্বাক ছবি 'দ্য ক্যামেরাম্যান'-এ। এ ছবির নায়ক কিটন এক অশিক্ষিত ক্যামেরাম্যান যে এই বিশেষ প্রযুক্তি সম্পর্কে সঠিক ধারণা ছাড়াই ছবি তোলার কাজে নিযুক্ত হয়। কিটন চমৎকার হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে দেখান যে কিভাবে এক অনভিজ্ঞ ক্যামেরাম্যান ঘটনাক্রমে নিজের অজান্তেই, কোনো তাত্ত্বিক ধারণা ব্যতিরেকে জিগা ভের্তভের সমতুল্য হয়ে ওঠেন। ছবিতে একই ফিল্মে একাধিক দৃশ্যধারণের 'দুর্ঘটনা' থেকে উদ্ভূত যে নান্দনিক সম্ভাবনাকে স্টুডিওর কর্তারা 'অপচয়' বলে বাতিল করে দেন, অন্য দেশে, অন্য সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তা এক বিশিষ্ট নান্দনিক আন্দোলনের সূচনা করে। কমেডি ছবির ক্ষেত্রে ক্যামেরাম্যানের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্যামেরার ফোকাস হওয়া দরকার প্রচণ্ড নিখুঁত— কেননা অভিনেতাদের আচরণের খুঁটিনাটি পর্যন্ত দর্শকের কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরা ছিল প্রাথমিক দায়িত্ব। ফ্রেম সম্পর্কে ক্যামেরাম্যানকে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হতো—কেননা ফ্রেমের ভেতরে ও বাইরের স্থান কমেডির অভিনয় ও নির্দেশনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সর্বোপরি, ক্যামেরাম্যানদের সর্বদাই ক্যামেরার বিশেষ কলাকৌশল সম্পর্কে অবহিত থাকতে হতো কেননা ক্যামেরা ট্রিকস্ এবং কমিক অভিনয় ও স্টাণ্ট-এর মেলবন্ধন ঘটেছিল কমেডি ছবিতে। কিটনের ক্যামেরাম্যান এলগিন লেসলি হাতে ঘোরানো ক্যামেরায় অবিশ্বাস্য নৈপুণ্যে বাস্টার কিটনের একই সঙ্গে ন'টি চরিত্র সেজে অভিনয় করাকে ধরেন 'প্লে হাউস' ছবিতে যা সকলকে অবাক করে দিয়েছিল। 'শার্লক জুনিয়র' ছবিতে লেসলি চলচ্চিত্র-স্বপ্ন-বাস্তবকে যেভাবে রূপ দিয়েছিলেন তা এক কথায় ছিল অবিশ্বাস্য। কমেডি ছবির ক্যামেরাম্যানদের উদ্ভাবনী শক্তি, ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল সম্পর্কে চমৎকার ধারণা, 'ট্রিক শট' তৈরির ক্ষমতা কমেডি ছবিকে এক নতুন ভাষা দিয়েছিল সন্দেহ নেই। পরিচালক ও অভিনেতা বিশেষে বিভিন্ন ঘরানাও তৈরি হয়েছিল।

অন্যদিকে, কাহিনীচিত্রের ক্ষেত্রে গ্রিফিথের অনুপ্রেরণায় হলিউড চলচ্চিত্রভাষাকে এক সার্বজনীন ভাষা হিশেবে তৈরির ক্ষেত্রে ক্যামেরার নিজস্বতাকে ব্যবহার করেছিল। শট ডিভিশনের, ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলের, আলোর প্রয়োগের এবং সম্পাদনার প্রাথমিক শর্তগুলো, প্রাথমিক নিয়মগুলো স্বীকৃত হয়ে যায় নির্বাক যুগেই। কাহিনীর প্রেক্ষিত, বিষয়বস্তু, চরিত্রের মানসিকতা, নাটকীয়তা তৈরির ক্ষেত্রে কতগুলো সুনির্দিষ্ট প্রথা বা রীতির প্রায়োগিক সাফল্য এক ধরনের অনুকরণপ্রিয়তার জন্ম দিল। এরই ফলে দেখা গেল চলচ্চিত্র কাহিনীর নির্বাচনে এবং তার চলচ্চিত্রায়ণে এক ধরনের ফর্মুলা নির্ভরতা। প্রতিটি নির্দিষ্ট ধারার (genre) ছবি নির্দিষ্ট দৃশ্যকলার নিয়ম মেনেই তৈরি হতে

শুরু করে। কমেডি ছবি, সামাজিক ছবি, অপরাধমূলক ছবি, ওয়েস্টার্ণ বা হরর ছবির নিজস্ব চিত্র-ভাষা (Visual Language) এবং ভাষা-রীতি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের হাতে ক্রমেই পরিশীলিত হয়ে উঠতে থাকে। সুচারু কাহিনী বিন্যাসের দাবিতেই ক্যামেরাম্যানদের পরিচালকের দাবি মতো প্রতিটি দৃশ্যকে একাধিক শটে বিভাজিত করে পৃথক পৃথক ভাবে রচনা করতে হয়। একটি শটের সঙ্গে অন্য শটের সম্পর্ক, এক দৃষ্টিকোণ থেকে অন্য দৃষ্টিকোণে ক্যামেরার অবস্থান পরিবর্তন, সহজ থেকে জটিলতম গতিমান শট—ইত্যাদির সাহায্যে চিত্রভাষাকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলা, ফোটোগ্রাফিক কম্পোজিশনে সাধারণ নিয়মগুলোকে সৃজন মূলক ভাবে চলচ্চিত্রে প্রয়োগ, আলো ও রং-এর নানা প্রয়োগ রীতি— সবই ধীরে ধীরে হলিউডের চিত্রভাষায় এক সুনির্দিষ্ট রূপ পেতে থাকে।

উনিশশো কুড়ি সালের পূর্ব পর্যন্ত ফোটোগ্রাফির সীমাবদ্ধতার প্রধান কারণ ছিল প্রযুক্তিগত। অনুন্নত যন্ত্রপাতির পাশাপাশি ব্যবহৃত হত 'অর্থক্রোম্যাটিক ফিল্ম' যা সমস্ত রং-এর বিভাজনকে সঠিকভাবে এবং সম্পূর্ণ রূপে ধরতে পারত না। এরই সঙ্গে ছিল আলো ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব। চলচ্চিত্রের প্রথম যুগে ক্যামেরাম্যানদের প্রধান কাজ ছিল মোটামুটি উজ্জ্বল ভাবে ক্যামেরার সামনে ঘটমান দৃশ্যকে রেকর্ড করা। এজন্য বিষয়বস্তুর উপরে সরাসরি আলোকপাত করা হত এবং শুধুমাত্র যথেষ্ট আলোকিত ব্যক্তি ও বস্তুই দৃশ্যমান হত। আধো আলো আধো অন্ধকার বা অন্ধকারের ধারণাকে ফুটিয়ে তোলা ছিল অত্যন্ত কঠিন। বহির্দৃশ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক আলোকে সঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা ছিল প্রায় অসম্ভব। এ সমস্ত কারণেই সে যুগের ছবি ছিল অনিবার্যভাবেই সাদামাটা। আলো এবং অন্ধকারের বৈপরীত্য ছাড়া সে যুগের ছবিতে সাদা-কালোর অন্য কোনো ক্রমপর্যায় ধরা পড়ত না। এই প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার সঙ্গে কিছুটা যেন খাপ খাইয়েই সে যুগের ছবি হত সহজ সরল।

১৯২০ সালের পর থেকে অপেক্ষাকৃত উন্নততর ফিল্ম এবং ক্যামেরা আসার পরে আমেরিকা ও ইউরোপের ছবিতে পোষাক পরিচ্ছদ, সেট এবং নাটকীয়তার উপর ঝোঁক বাড়তে থাকে। এই সময়ের ছবিতে শরীর এবং মুখাবয়ব, চরিত্রের আবেগ, অনুভূতি ফুটিয়ে তোলার জন্য আলোর নাটকীয় ব্যবহার লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। যদিও রূপসজ্জা ছিল অপেক্ষাকৃত চড়া মাত্রার এবং 'অর্থক্রোম্যাটিক ফিল্ম' যদিও লাল রং-কে কালো করে ফেলত তবু ফোটোগ্রাফি যে এক বিশেষ ভাষা তৈরি করতে পারে তা এই সময়েই সর্বজনস্বীকৃত হয়ে ওঠে।

চলচ্চিত্রে শব্দ যোগ হবার আগে থেকেই চলচ্চিত্রের এক সার্বজনীন ভাষা এবং ব্যাকরণ তৈরি করার স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। চলচ্চিত্র নির্মাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন লেখায় এবং বইপত্রে কিভাবে ছবি তুলতে হয়, কিভাবে শট ডিভিশন করতে হয়, সম্পাদনার কলাকৌশল এবং আলোর ব্যবহার সম্পর্কে নানা পাঠ দেওয়া হতে থাকে। চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মের সঙ্গে যুক্ত মানুষরাও নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বিনিময় করতে থাকেন। ভাষা হিশাবে এই মাধ্যমটি এক ধরনের স্বীকৃতি পেলেও এর ব্যাকরণ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। হলিউড এবং ইউরোপের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছে সুচারুভাবে গল্প বলাই ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। হলিউড ও ইউরোপে ধারাবাহিক ভাবে চলচ্চিত্র চর্চার মধ্য দিয়ে চিত্রভাষা-র বেশ কিছু রীতি নীতি সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। দেখা যায় যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় সকলেই গল্প বলার ক্ষেত্রে সচেতন বা অসচেতন ভাবে এই রীতি নীতিকে অনুকরণ করতে শুরু করেছে। চলচ্চিত্রের অন্য বিভাগের মতই চিত্রগ্রহণের ক্ষেত্রে, দৃশ্যকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে একইভাবে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট প্রথা তৈরি হয়ে গেল। শট ডিভিশনের ক্ষেত্রে ছবির শুরুতে এবং নতুন দৃশ্যের শুরুতে কাহিনীর কাল্পনিক জগতে

দর্শককে প্রবেশ করতে সাহায্য করার জন্য বিশেষ শট (establishing shot) ব্যবহার করা নিয়ম মাফিক হয়ে ওঠে। লং শট, মিডিয়ম শট, ক্লোজ আপের ব্যবহারের ক্ষেত্রে তৈরি হলো নির্দিষ্ট প্রথা। ক্লোজ আপের ব্যবহার প্রচলিত হলো ছবিতে বিশেষ নাটকীয় মাত্রা যোগ করার জন্যে। ক্যামেরার বিশেষ বিশেষ কৌণিক অবস্থান (high angle, low angle) অথবা ক্যামেরার গতিময়তা কাহিনী বিন্যাসে এবং চরিত্র চিত্রণে যে অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করতে পারে সে সম্পর্কেও চলচ্চিত্রকার এবং চিত্রগ্রাহকেরা বিশেষ রকম সচেতন হয়ে ওঠেন। এরই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের লেন্স এবং তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতনতাও চিত্রগ্রহণের ক্ষেত্রে এক বিশেষ মর্যাদা পায়। ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধারার কাহিনীচিত্রের জন্য নির্দিষ্ট রচনাশৈলী সংগঠিত হতে থাকে। ওয়েস্টার্ন, মিউজিক্যাল, ফিল্ম নোয়া (Noir), হরর্ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ধারা (genre)-র ছবি দৃশ্যগতভাবে পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। হরর্ ছবির আধি-ভৌতিক, অলৌকিক জগৎ যে ধরনের চিত্রভাষা এবং দৃশ্য রচনা শৈলী তৈরি করে তা অন্য সকলের থেকে আলাদা। একইভাবে ফিল্ম নোয়া (Noir)-তে আলো এবং ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলের ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট রচনাশৈলীর ছাপ পাওয়া যায়। হরর্, ওয়েস্টার্ন এবং ফিল্ম নোয়া-র মতো ধারাগুলি আলো ও ক্যামেরার ব্যবহারের ক্ষেত্রে হলিউডের পরিকাঠামোর মধ্যেই এক নিজস্বতা সৃষ্টি করে।

ফিল্ম নোয়া-র "লো-কি" (Low-Key) এবং "হাই-কি"(High-Key) আলো, লম্বা ছায়া, সিলুয়েট ইত্যাদি অজানা, বিপদসঙ্কুল, অপরাধ জগতের ছবি ফুটিয়ে তোলে। এই জগৎ দৃশ্যতই সভ্য, সামাজিক জগৎ থেকে আলাদা। এজন্য এ ধরনের ছবিতে চরিত্রদের মুখ স্বল্পালোকিত, ক্যামেরার অস্বাভাবিক অবস্থানের কারণে চরিত্রদের অন্তর্নিহিত অন্ধকার দিকটি বিশেষভাবে চিত্রিত হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে লেন্সের সাহায্যে দৃশ্য বিকৃতি (image distortion) অনেক সময়েই অপরাধী চরিত্রের আসল রূপটিকে ফুটিয়ে তোলে। ডিপ্ ফোকাস ব্যবহার করার ফলে অন্ধকারময় অপরাধ জগতে আটকে পড়া সাধারণ মানুষের অসহায়তা যেন অনেক তীব্র হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ওয়েস্টার্ন ছবিতে রুক্ষ, বিপদসঙ্কুল, বিস্তীর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সভ্যতার বিকাশ এবং আইনের প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নায়কের অসাধারণ পৌরুষের "মিথ্" তৈরির জন্য চিত্রভাষা হয়ে ওঠে ভিন্ন ধরনের। উন্মুক্ত পরিবেশে নায়কের একাকিত্ব, স্বাধীনতা এবং মুক্তি ওয়েস্টার্ন ছবিতে বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে। ন্যায় অন্যায়, শুভ অশুভের দ্বন্দ্বে ভরা ওয়েস্টার্ন ছবিতে চলচ্চিত্রের সমস্ত প্রকরণই ব্যবহৃত হয় এই দ্বন্দ্বকে চিত্রভাষায় রূপান্তরিত করতে।

মিউজিক্যাল ছবিতে গ্ল্যামার, রঙ ও বৈভবের ছড়াছড়ি। সঙ্গীতের ছন্দ, নৃত্যের লাস্য এবং কাহিনীর রোমান্টিকতার জন্য এই ধারার ছবিতে কোরিওগ্রাফি এবং ক্যামেরার কাজের বিশেষ মেলবন্ধন অনিবার্য হয়ে ওঠে। হরর সহ অন্য সমস্ত ধারার ছবির জন্যই হলিউড এবং হলিউড-অনুসারী ইউরোপের জনপ্রিয় চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়ার স্বীকৃত রচনাশৈলী রয়েছে। এই রচনাশৈলী বা স্টাইল এমনই বিশিষ্ট যে একে আলাদা করে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। অন্যদিকে আধুনিক জীবনের জটিলতার ছায়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর হলিউডেও পড়েছিল। এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ হলিউডেও অন্যধারার, অন্য দর্শনের ছবি তৈরি শুরু হয়। অরসন ওয়েলস্-এর 'সিটিজেন কেন্' প্রথাগত চলচ্চিত্রায়ণের সমস্ত রীতিনীতিকে ভেঙে এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। চিত্রভাষা এবং দৃশ্য রচনার ক্ষেত্রে অসামান্য অভিনবত্বের প্রমাণ এ ছবির প্রতিটি ফ্রেমে।

ওয়েলস 'কেন্' নামক একজন ধনী সংবাদপত্র ব্যবসায়ীর জীবনকে ব্যবচ্ছেদ করেন চলচ্চিত্রের ভাষায়। 'কেন্'-এর জীবনের অকথিত দিকগুলো চিত্রিত করতে ওয়েলস আলো ও অন্ধকারের বৈপরীত্যকে ব্যবহার করেন চরিত্রটিকে ঘিরে যে রহস্যময়তা রয়েছে সেদিকে



ইঙ্গিত করতে। 'ডিপ-ফোকাস' অনেক দৃশ্যেই বিভিন্ন চরিত্রদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দূরত্বকে এমনভাবে সূচিত করে যা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রয়োগরীতির দিক থেকে অনন্য। কম্পোজিশন এবং ক্যামেরার ব্যবহারও এ ছবির কাহিনী বিন্যাসকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। সর্বোপরি কেন্দ্রীয় চরিত্রের মানসিক অবস্থাকে প্রকাশ করবার জন্য বিশেষ বিশেষ দৃশ্যে ওয়েলস শব্দ ও ছবির প্রকাশভঙ্গি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন।

'সিটিজেন কেন্'-এর পর হলিউডের চিত্রভাষা স্টুডিও-নির্দিষ্ট ভাষারীতি থেকে ক্রমশঃ স্বাধীন হয়ে উঠতে থাকে। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন—ইতালির নববাস্তবতা, ফরাসী নবতরঙ্গ এবং 'ডাইরেক্ট সিনেমা'—হলিউডের চিত্রভাষাকেও প্রভাবিত করতে থাকে। স্টুডিও প্রথার অবসানের পর চলচ্চিত্র পরিচালকের স্বাধীনতা ও শিল্পী হিশাবে পরিচালকের স্থান তর্কাতীত হয়ে ওঠে। হলিউডের ক্যামেরাম্যানরাও তাঁদের নিজস্বতার জন্য চিহ্নিত হতে থাকেন। একই সঙ্গে ক্যামেরা প্রযুক্তি ও কাঁচা ফিল্ম বিশেষভাবে উন্নত হয়ে ওঠার ফলে পঞ্চাশের দশকের পর থেকে ক্যামেরাম্যানরা আলোর ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিরায়ত প্রতিবন্ধকতা অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন। ইতালির 'নববাস্তবতা' আন্দোলনটি হলিউডের ক্যামেরাম্যান এবং পরিচালকদের বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং চলচ্চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে 'বাস্তবতার' ধারণা ফুটিয়ে তুলতে ক্রমশঃ ক্যামেরাকে বাস্তব জীবনের কাছাকাছি আনতে থাকে। অন্যদিকে 'ডাইরেক্ট সিনেমা' নামক তথ্যচিত্রের গুরুত্বপূর্ণ ধারাটি হাতে ধরা ক্যামেরার সাহায্যে আপাত-অমসৃণ বাস্তব জীবনের সাবলীল ছবির মধ্যেও জীবনের সুষমা আবিষ্কার করে। আবার, জটিল 'টেকনিকালার' পদ্ধতির বদলে আধুনিক রঙীন নেগেটিভ ক্যামেরাম্যানকে 'টেকনিকালার' পদ্ধতির যাবতীয় বিধিনিষেধ থেকে মুক্তি দেয়—রঙের বাস্তবানুগ প্রয়োগের পাশাপাশি রঙের মনস্তত্ত্ব নিয়েও চিন্তাভাবনা শুরু করেন হলিউডের ক্যামেরাম্যানরা। 'ত্রি-মাত্রিক' ছবি, সিনেমাস্কোপ ও সত্তর মিলিমিটার ছবি পরিচালক ও ক্যামেরাম্যানকে সাহায্য করে চিত্রভাষাকে আরো সমৃদ্ধ করতে। তবে, আধুনিক চিত্রভাষায় সত্যিকারের বিপ্লব এনেছে সাম্প্রতিক 'ডিজিটাল টেকনোলজি'। চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাস একশো বছর অতিক্রান্ত করার সময়ে হলিউডের ক্যামেরাম্যানরা তাই সদম্ভে ঘোষণা করেন, 'কল্পনা যতোই অসম্ভব হোক না কেন, আমরা তাকে রূপ দিতে পারি। যা কল্পনা করা সম্ভব—তা চলচ্চিত্রায়িত করাও সম্ভব।' আজকের হলিউডের ক্যামেরাশৈলী তাই রুক্ষ, কঠোর বাস্তবকে যেমন রূপ দিতে পারে তেমনই পারে মানুষের অসম্ভব কল্পনাকেও দৃশ্যমান করে তুলতে।

ক্যামেরার দিব্যদৃষ্টি : ইওরোপীয় চলচ্চিত্রের শিল্পনিরিখ

সোমেন ঘোষ

চলচ্চিত্রের নন্দনতাত্ত্বিক আন্দ্রে বাজাঁ তাঁর সাড়া জাগানো গ্রন্থে বলেছিলেন "All the arts depend on the presence of man; only photography lets us delight in his absence".[১] চলচ্চিত্র যা কিনা যন্ত্রের মাধ্যমে আলোকচিত্রের প্রকৃতির স্বীকরণ ও প্রসারণ ঘটিয়ে সময়ের প্রতিভাস গড়ে তোলে, তার নান্দনিক আবেদনের শিকড়টিও নিহিত ঐ একই উৎসে—বাস্তবের প্রকাশ।

অপর বিখ্যাত চলচ্চিত্রবিদ সিনেমার আলোকচিত্র সম্পর্কে বলেছিলেন "Film is essentially an extension of photography and therefore shares with this medium a mark of affinity for the visible world around us."[২] আমাদের চারপাশের বস্তুবিশ্বের ফোটোগ্রাফিক প্রতিফলন সিনেমার মূল বাসনা হলেও এই প্রতিফলনের ভঙ্গি ও অভিপ্রায় থেকেই বিশ্বের নানা দেশের চলচ্চিত্রের রূপ ও নন্দন স্ব স্ব রীতিতে বিবর্তিত হয়েছে। চলচ্চিত্র মাধ্যমের জন্মের পরবর্তী প্রথম পনের বিশ বছর সিনেমার নির্মাণপদ্ধতির প্রাথমিক পর্যায়গুলো সমধর্মী ছিল। পরে ক্যামেরা ও তার আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের নিত্যনোতুন আবিষ্কারের ফলে চলচ্চিত্রের ক্যামেরা, তার প্রয়োগ পদ্ধতি, নিয়ন্ত্রণ ও স্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্বে সিনেমার ক্যামেরা সঞ্চালন রূপে স্বতন্ত্রভাবে শিল্পরূপ নিল। তখন ফোটোগ্রাফি কেবল বস্তুবিশ্বের হুবহু প্রতিফলনেই সীমাবদ্ধ রইল না, তা স্রষ্টার অন্তর্মুখী ভাবনার অভিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত হ'তে শুরু করল। তখন থেকেই সিনে-ফোটোগ্রাফির স্বতন্ত্র চরিত্র গড়ে উঠল।

আর একটু এগিয়ে তাত্ত্বিক বাজাঁ ক্যামেরার মৌল উপকরণের ব্যাখ্যা করে সিনেমার প্রাণের সন্ধান দিলেন—"Only the impartiality of the lens can clear the object of habit and prejudice, of all mental fog with which our perception blurs it, and present it afresh for our attention and thereby for our affection. In a photograph, the natural image of a world we do not know how to see, nature finally imitates not just art, but the artist himself."[৩] ফরাসী সমালোচক লুই ডেলুক বলেছিলেন—'Cinema is the painting in motion.' পাশাপাশি বিখ্যাত চলচ্চিত্রস্রষ্টা আবেল গাঁসের দৃষ্টিতে 'Cinema is the music of light.' আসলে এ মাধ্যমটির জন্মলগ্ন থেকেই ক্যামেরার মৌলিক চরিত্র, তার প্রয়োগ পরিকল্পনা এবং সর্বোপরি স্রষ্টার মানসিকতা ঘিরে চলচ্চিত্রের ক্যামেরার নন্দনতত্ত্ব কাল থেকে কালে নোতুন চেহারা নিয়েছে।

মনে রাখতে হবে, সিনেমার আদিতে ক্যামেরার নানা ধরনের লেন্স ছিল না, স্বাভাবিকভাবে যে গুটিকয়েক লেন্স প্রাপ্তিসাধ্য ছিল, তাদের গভীর ডেপথ্ অফ ফোকাসের জন্য সম্পাদনার ক্ষেত্রে মানিয়ে গিয়েছিল কিংবা বলা যেতে পারে ন্যূনতম সম্পাদনা উপযোগী ছিল। সেকালের ছবিগুলো দেখলেই বিষয়টি বোঝা যায়। ধীরে ধীরে আলোকবিজ্ঞান তথা লেন্সগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পাদনা পদ্ধতির যেমন ঐতিহাসিক বিবর্তন ঘটে তেমনি এর কার্যকারণ ও প্রভাবও চলচ্চিত্রের শিল্পশরীরে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হ'তে শুরু করে।

সিনেমার ক্যামেরার চরিত্র ও মৌল উদ্দেশ্য সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছেন সমালোচক—"Since the camera has no brain, it has the vision but not perception. It is the film maker's task to restore selectivity of the cinematic eye. In this process he may control our perception so that his vision and emphases dominate our response to the created world."[8]

চলচ্চিত্র যেহেতু প্রাথমিক শর্তে একটি দৃশ্যগ্রাহ্য শিল্প তাই দৃশ্যের স্থান কাল ও বস্তুর প্রতিভাস সম্পর্কিত চেতনা ও ব্যবহারগত পরীক্ষা নিরীক্ষাই এই মাধ্যমের শিল্পসম্ভাবনাকে বিভিন্ন যুগে প্রসারিত করে দিয়েছে। সিনেমায় শব্দ যুক্ত হবার আগে পর্যন্ত কেবল দৃশ্যশিল্পের অনুষঙ্গে চলচ্চিত্র দর্শকের চিত্তবিনোদন করেছে। যদিও সেই আদিতে নির্বাক ছবি প্রদর্শনের অনেক সময়ে ছবি চলাকালীন যন্ত্রশিল্পীরা পর্দায় প্রতিফলিত দৃশ্যসজ্জার অনুকূলে শব্দ সঙ্গীত গড়ে তুলতেন বাস্তব অনুভূতির আবেদন দিতে। সেইদিনই বোঝা গিয়েছিল যে নির্বাক চলচ্চিত্র সবাক হবে একদিন। সিনেমার নিজস্ব তাগিদেই চলচ্চিত্রে শব্দযোজনা, পুনর্যোজনা, স্থানিক শব্দ ও কৃত্রিমভাবে তৈরি শব্দ ও নেপথ্য সংগীত যুক্ত হয়ে আধুনিক সিনেমার শিল্পশরীর পুষ্ট হয়েছে। প্রত্যেকটি দৃশ্যশিল্পের দুটি উৎস। তার একদিকে রয়েছে বস্তুবিশ্বের প্রতিফলন ঘটানোর ইচ্ছা, অপরটি হ'ল দৃশ্যকল্পকে সুন্দর ও সুশোভিত করা। চলচ্চিত্র মাধ্যম প্রকৃতির সঙ্গে তার সাদৃশ্যের সাহায্যে প্রথম ইচ্ছা পূরণ করেছিল। তাই চলচ্চিত্রকারের আবিষ্কার প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের ক্ষমতায় দর্শককুলকে বিমূঢ় করেছিল। প্রথমদিকে চলচ্চিত্র নির্মাতার ক্ষমতা কেবল প্রতিকৃত বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্র নির্মাতারা এই মাধ্যমের যান্ত্রিক ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করার পরবর্তী পর্যায়ে, একে নানা শৈল্পিক দৃশ্য ও ভাবগত ব্যঞ্জনার সমন্বয়ে তাঁদের স্বকীয় শিল্পচিন্তার অনুকূলে ব্যবহার করতে শুরু করেন। এক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের প্রকরণ কৌশলের ক্রমবিবর্তনই এই মাধ্যমের প্রযুক্তিবিদ্যার নোতুন নোতুন দিক খুলে দিয়েছে। আর সেই সংস্থান থেকেই বিভিন্ন স্রষ্টারা এর শরীর সত্তা নিয়ে নিজেদের মতো ভাবনা চিন্তা করেছেন, যার প্রথম ও প্রধান হাতিয়ারই হ'ল ক্যামেরা। বেলা বালাজ তাই সঙ্গত কারণেই বলেছিলেন—'Technique is the most fertile source of inspiration; the muse is the camera.'

যান্ত্রিক প্রয়োগ পদ্ধতির ক্ষেত্রে চিত্রগ্রহণের রীতিও বিবর্তিত হয়েছে আশ্চর্যভাবে। সিনেমার আদিযুগে চলচ্চিত্রের ক্যামেরা ছিল অনেকাংশে অনড়, স্থানু একটা অস্বস্তিকর ভারী যন্ত্রবিশেষ, একে স্বচ্ছন্দভাবে নানা স্থানে বিচরণ করানো প্রায় দুরূহ ছিল। ফলে তখনকার ক্যামেরার গতিময়তা একেবারেই ছিল না। সেটা ছিল সিনেমার 'ফোটোগ্রাফড্' থিয়েটার পর্ব। আরভিং পিচেল ক্যামেরার দিব্যদৃষ্টির কথা বলেছিলেন। চলচ্চিত্র হ'ল গতির শিল্প। এই গতি ক্যামেরায় গৃহীত বস্তুবিশ্বের বাস্তব অধ্যাস পর্দায় গড়ে তুলতে পারে। চলচ্চিত্রের উন্নতির ধাপে ধাপে এই গতির নানা রূপান্তর ঘটতে শুরু করে; যেমন সংক্ষিপ্ত গতি, অর্থাৎ লঙ থেকে মিডিয়াম এবং

তারপরে আরো কাছে—ক্লোজ শট; আবার কোনো বিশেষ চরিত্র বা বস্তুর সংস্থান থেকে অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুতে কিংবা দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে ছবির দৃষ্টিকোণ (Point of view) সরিয়ে নেওয়া। ক্যামেরা মূলতঃ একটা চোখ। অণুবীক্ষণ বা দূরবীণ যন্ত্রের মতো তা মানুষের দৃষ্টির পরিধিকে বাড়িয়ে দেয়। এ চোখের ব্যবহার বিশেষ উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ ভাবে ঘটে।

সিনেমায় ক্যামেরার নান্দনিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যার আগে প্রাসঙ্গিকভাবে প্রথম যুগের ও পরবর্তীকালের কয়েকটি বিখ্যাত ক্যামেরার কথা বলা যেতে পারে যেগুলি সারা বিশ্ব চলচ্চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। ১৯২৩ সালে ইষ্টম্যান কোডাক কোম্পানি ১৬ মিলিমিটারের ক্যামেরা বাজারে ছেড়েছিলেন। বেল ও হাওয়েল কোম্পানির উদ্যোগে বেরুল 'ফিল্ম ক্যামেরা'। এরই অনুষঙ্গে বেরুল 'ইয়ামো ক্যামেরা'। খুব অল্প সময়ে ইয়ামো ক্যামেরা জনপ্রিয় হয়ে উঠল। যুদ্ধক্ষেত্রে শ্যুটিংয়ের জন্য এটা অপরিহার্য হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল। ইয়োরিস ইভান্স গৃহযুদ্ধের ওপর তাঁর বিখ্যাত Spanish Earth তোলেন এই ক্যামেরা দিয়ে। এই শতকের প্রথম পঁচিশ বছর সিনেমার আলোকচিত্রীদের যন্ত্র উপযোগিতা দেবার জন্য ফ্রান্সের দুটি প্রতিষ্ঠানের অবদান অনেকটা। প্রথমটা হ'ল 'এক্লেয়ার ক্যামেরা'। ১৯২৮ সালে 'এল' মডেল 'ডেবার পারভো' ক্যামেরা জনপ্রিয় হয়। ফরাসীদের আবিষ্কার স্বরূপ 'পারভো' বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। আমেরিকা ছাড়াও ইওরোপের নানা দেশে, জাপান ও দক্ষিণ আমেরিকার চলচ্চিত্র নির্মাণে এই ক্যামেরা বহুল ব্যবহৃত হয়। চলচ্চিত্রের বিশ্ববরেণ্য স্রষ্টা রাশিয়ার আচার্য আইজেনষ্টাইন তাঁর প্রধানতম ছবিগুলো তুলেছিলেন এই ক্যামেরাতেই। ইটালীয়ান পরিচালকেরা তাঁদের বিখ্যাত ছবিগুলোর চিত্রায়ণে এই ক্যামেরার কুশলতাকে দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন। আজও সমানভাবে ছবির টাইটেল দৃশ্যায়ণে এবং ট্রিক ফোটোগ্রাফির জন্য এই ক্যামেরার ব্যবহার হচ্ছে। এর পাশাপাশি পারভো ইওরোপীয় ফিল্ম প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই ধরনের ক্যামেরা উদ্ভাবনে উৎসাহ দিয়েছিল। ফলস্বরূপ ইটালীতে 'প্রিভেস্ট ক্যামেরা', জার্মানীতে 'এনারমেন ক্যামেরা'র আগমন ঘটে।

একটা ক্যামেরা তৈরি হয়ে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে, কয়েকবছরের মধ্যেই আবার একটা নতুন ক্যামেরা নবসংস্করণে হাজির হচ্ছে। কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রয়োগবিদরা সিনে-ক্যামেরার আরো স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গির জন্য উন্মুখ হয়ে থাকছেন। মিচেল ক্যামেরা যখন তৈরি হ'ল তখন চলচ্চিত্র নির্মাণের আধুনিকীকরণ ঘটলো আর এক বিন্যাসে। যদিও এই ক্যামেরার প্রথম প্রচলন ঘটে ১৯২২-২৩ নাগাদ। কিন্তু এতে আরো কিছু সংস্কার ঘটিয়ে ১৯৩৪ সালে এর 'বি.এন.সি মডেল' বেরুল। এতে ক্যামেরা চলাকালীন অবাঞ্ছিত শব্দ বন্ধ করার সমস্ত ব্যবস্থা ছিল। এরপরে মিচেল কোম্পানি আর একটি ৩৫ মি. মিটার মডেল বার করে। এতে অনেক আধুনিকীকরণ ঘটেছিল যা এর ব্যবহারিক দিকটাকে আরো সহজ ও স্বচ্ছন্দ করে দেয়। ডকুমেণ্টারী অর্থাৎ প্রামাণিক চিত্র নির্মাণে 'নিউম্যান সিনক্লেয়ার অটোজাইন' ক্যামেরা অসীম গুরুত্ব পেল। বেসিল রাইট এবং ফ্লাহার্টি তাঁদের দুটি অনবদ্য ছবি 'সঙ অফ সিলোন' (১৯৩৫) আর 'ম্যান অফ আরান' (১৯৩৩) নির্মাণ করেন এই ক্যামেরায়। সেদিনই এই ক্যামেরা প্রযুক্তিগত কুশলতায় তথ্যচিত্র নির্মাণে একটা রীতির জন্ম দিয়েছিল। পরবর্তীকালে ব্রিটেনের তথ্যচিত্র নির্মাতারা এই ক্যামেরাকে তাঁদের কাজে লাগিয়েছিলেন।

জার্মানী বহুদিন ধরেই ক্যামেরা তৈরির কেন্দ্রভূমি ছিল। ১৯৩৩ সালে জার্মানী একটা আধুনিক ক্যামেরা তৈরি করে 'এ্যারিফ্লেক্স' নামে। স্মরণ রাখা যেতে পারে যে ১৯৪৫ সালে হলিউডে এই ক্যামেরার সাহায্যে প্রথম কাহিনীচিত্র তৈরি হয়েছিল। ১৯৪৮-এ তৈরি ফ্লাহার্টির অনবদ্য

ছবি 'লুসিয়ানা স্টোরী' তৈরি হয় এই ক্যামেরাতেই।

সে সময়ে ফ্রান্সও ক্যামেরা নির্মাণে পিছিয়ে থাকে নি। চলচ্চিত্রে শব্দ আসার আগে এক্লেয়ার কোম্পানি একটা ক্যামেরা বের করেছিল 'ক্যামেরা এক্লেয়ার' নাম দিয়ে। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় মহাসমরের সময় জার্মান অধিকৃত প্যারিসে গোপনে একটা নতুন মডেল তৈরি করতে শুরু করে এক্লেয়ার কোম্পানি। এর দুই ইঞ্জিনীয়ার আন্দ্রে কোটেন্ট এবং চার্লস মেনটর-এর অবদানে নোতুন মডেলের ক্যামেরায় যুগান্ত সৃষ্টি হ'ল। ১৯৪৮-এ বেরুল এক নোতুন মডেল 'ক্যামেফ্লেক্স'। এই ক্যামেরাতে প্রায় কুড়ি রকমের যন্ত্রপাতি বদলানো হয়েছিল যা অন্যান্য ক্যামেরার পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এর অগ্রগণ্যতা প্রতিষ্ঠা করলো। অ্যারিফ্লেক্সের পাশাপাশি এই ক্যামেরা অতি উচ্চমানের ক্যামেরা। কিছুদিন পরে এর আর একটা মডেল বেরুল যাতে ১৬ এবং ৩৫ মি. মিটার দু'রকমের কাজই করা যায়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ফরাসী 'নুভেল ভাগের' বেশিরভাগ ছবিই এই ক্যামেরায় সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যেতে পারে যে, প্রযুক্তিবিদ্যার নিত্য নোতুন কৌশলের ফলে সিনে-ক্যামেরার ক্রমাগত আধুনিকীকরণ ঘটলেও চলচ্চিত্রায়ণের মূল ব্যাপারটা নিহিত থাকে পরিচালকের বোধ, মনন ও সামগ্রিক শিল্প অভিপ্রায়ের মধ্যে। বিষয়বস্তু নির্বাচনে, তার সিনেম্যাটিক বিন্যাসে ক্যামেরার গতিময়তা কোন পারম্পর্যে ব্যবহৃত হবে সেটা নিরূপণ করবেন স্বয়ং চলচ্চিত্রস্রষ্টা। ছবির ক্যামেরাম্যান সেক্ষেত্রে তাঁকে চিত্র পরিস্ফুটনে সাহায্য করবেন। বর্তমান বিশ্ব চলচ্চিত্রের প্রথম সারির ক্যামেরাম্যান একটি ছবির স্টাইল গঠনে চিত্রপরিচালকের পাশাপাশি একজন আলোকচিত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য কতোটা সে বিষয়ে সুন্দর কথা বলেছিলেন—"Though the cinematographer may pride himself on having his own style, he must not try to impose it. He must do his best to understand the director's style, see as many of the director's films as possible (if there are any), and immerse himself in the director's 'manner'. It is not 'our' film but 'his' film".[৫] বস্তুতঃ চিত্রপরিচালকের শিল্পশৈলীর সঙ্গে এই গভীর সম্পৃক্তিই একটা ছবির সার্বিক স্টাইলে ক্যামেরাম্যানের নৈপুণ্যকে স্মরণীয় করে তোলে। গ্রেগ টোল্যাণ্ড, জেমস ওয়াং হো, নিক্‌ভিস্ট, রাউল কুতার প্রমুখ ডাকসাইটে ক্যামেরাম্যানদের সৃজনশীলতাও আবর্তিত হয়েছিল এই অবধারণা থেকেই।

নানা ক্যামেরার আবিষ্কার, চলচ্চিত্রের গতিময়তা, এ শিল্পের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন, এ মাধ্যমের শরীর ও আত্মার এবম্বিধ প্রস্তাবনার পরে আমরা নিবন্ধের কেন্দ্রীয় বিষয়টিতে আসতে পারি। এখানে প্রথমেই যেটা উল্লেখ্য, তা হ'ল চলচ্চিত্র নির্মাণের সেই আদি থেকেই হলিউডী সিনেমা বহু বছর ধরে গোটা বিশ্বের দর্শককে আপ্লুত করে রেখেছিল। মূলতঃ আবেগময় এবং জাঁকজমকপূর্ণ কাহিনীচিত্রের নানামুখী বিন্যাসে হলিউডের ছবি গোটা পৃথিবীতে আদৃত ছিল। এটাও মনে রাখা কর্তব্য যে, চলচ্চিত্র মাধ্যমের ভাষা ও ব্যাকরণের সৃষ্টি হয়েছিল আমেরিকাতেই, গ্রিফিথের অমর সৃষ্টি 'বার্থ অফ এ নেশন' এবং 'ইনটলারেন্স' ছবি দুটির মাধ্যমে। গ্রিফিথের সবচেয়ে বড় অবদান তাঁর ছবির মহত্ত্বে যতোটা, তার থেকে অনেক বেশি তাঁর আবিষ্কৃত এবং প্রযুক্ত সিনেমার টেকনিক সংক্রান্ত মহনীয়তায়। হিচকক একবার একটা অমোঘ উক্তি করেছিলেন—'Everytime you see a film today there's something in it that began with Griffith.' গ্রিফিথের সিনেমার কাটিং পদ্ধতি, প্যারালাল কাটিং এবং ক্রস কাটিং, মন্তাজ ইত্যাদি টেকনিকগুলোই পরবর্তীকালে দেশে বিদেশে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু চলচ্চিত্রভাষার ভিত্ গড়ে দিয়েছিলেন তিনিই। সিনেমার বিখ্যাত তাত্ত্বিকেরা গ্রিফিথের চলচ্চিত্র ভাষা ও ব্যাকরণের নানা ব্যাখ্যা

দিয়েছিলেন। সিনেমা নির্মাণে তাঁর রীতিকে নতুন ব্যঞ্জনায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রুশ চলচ্চিত্র স্রষ্টা আইজেনষ্টাইনের নাম সর্বাগ্রগণ্য। গ্রিফিথের ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ নির্বাচন, ক্লোজ আপ, মন্তাজ পদ্ধতিকে সিনেমার নতুন মাত্রায় দৃশ্যাবিভাজনে গ্রহণ করেন আইজেনষ্টাইন। হলিউডী সিনেমা তথা তাবৎ মার্কিন চলচ্চিত্রের নির্মাণ কৌশলে গ্রিফিথের প্রভাব অসামান্য। কিন্তু রুশ ও ইওরোপের অন্যান্য দেশের সৃজনশীল চলচ্চিত্রকারেরাও গ্রিফিথের দৃশ্যগ্রহণ টেকনিক, চলচ্চিত্র বিন্যাসের পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু অন্য ব্যঞ্জনায়। গ্রিফিথের শট বিভাজন, কাটিং, মন্তাজ ইত্যাদিকে আইজেনষ্টাইন প্রাপ্য মূল্য দিয়েও অন্য এক বৈপরীত্যে মহনীয় করে তুলেছিলেন তাঁর ছবিতে।

এমন কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, গোটা বিশ্বের চলচ্চিত্রায়ণের যদি কোনো বিশেষ স্টাইল থাকে, তা বিবর্তিত হয়েছে সিনেমার দুই মহারথীর টেকনিকের ক্রমবিবর্তনে। একজন হলেন লুমিয়ের, অপরজন মেলিস। লুমিয়েরের লক্ষ্য ছিল চোখের বস্তুসত্যে উদ্ভাসিত বাস্তবতার হুবহু প্রতিকৃতি পর্দায় গড়ে তোলা, তিনি লেন্সের কারিকুরিতে ততোটা নির্ভরশীল ছিলেন না। বিপরীতে মেলিস ক্যামেরার আশ্চর্য গুণপনাকে পর্দায় মায়াসৃষ্টির কাজে লাগিয়েছিলেন, যেখানে ফ্যান্টাসি ও কাহিনীবর্ণনার কৌশলের প্রতি তাঁর আগ্রহ চলচ্চিত্রের সম্ভাবনায় নন্দনতাত্ত্বিক দিক উন্মোচিত করেছিল।

অন্যান্য দেশের মতো নির্বাকযুগের জার্মান চলচ্চিত্রের স্টাইলেও এক স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ার মতো। ১৯১৫-২০-র মধ্যে তৈরি থ্রিলার ও সিরিয়াল দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ক্যামেরা রীতি, দৃশ্যগঠন এবং সামগ্রিক কম্পোজিশনে জার্মান ছবি বিশ্বের অপরাপর দেশের চলচ্চিত্র শৈলী থেকে কতোটা আলাদা। ইওরোপীয় চলচ্চিত্র জার্মান ছবির দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু জার্মান সিনেমারও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের কলাকৌশল থেকে দূরে সরে থাকা সম্ভব হয়নি। এই প্রসঙ্গে জার্মান সিনেমার স্মরণীয় স্রষ্টা সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছিলেন চলচ্চিত্র ঐতিহাসিক—"Murnau had hoped to save it thanks to immunizing injections from the mobile and subjective camera. And just as Hollywood cinema itself was capitulating before it, German cinema itself capitulated to naturalism."[৬]

চলচ্চিত্রে বাস্তবতা প্রতিফলনের নান্দনিক সূত্র ধরেই মূলতঃ ইওরোপীয় সিনেমার শিল্পাঙ্গিক, যা কিনা ক্যামেরা স্টাইলের রূপান্তর, তা বিবর্তিত হয়। হলিউডী প্রথার বাইরে বেরিয়ে এসে ইওরোপীয় চলচ্চিত্র স্রষ্টারা ক্যামেরার নতুন গতিময়তার সন্ধান করেছিলেন। তাঁদের অভিপ্রায় ছিল ক্যামেরা কেবল বস্তুবিশ্বের তথাকথিত বাস্তব অধ্যাসই রচনা করবে না, ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ নির্বাচন, দৃশ্যবিভাজন রীতি, সম্পাদনা, দৃশ্যের গতিময়তা বস্তুবিশ্বের ভেতরকার চরিত্র উন্মোচিত করবে। সেই সঙ্গে স্রষ্টার শিল্পমানসিকতাও ধরা দেবে ছবির ক্যামেরা স্টাইলকে আশ্রয় করে। এই উপলক্ষে ইওরোপীয় চলচ্চিত্রে, মূলতঃ ফ্রান্সে জন্ম নিয়েছিল কয়েকটি শিল্পতত্ত্ব যা সিনেমার আধুনিক আঙ্গিকের জন্ম দেয়। এ ছাড়াও, প্রাসঙ্গিকভাবে আমরা দেখবো যে, জার্মানী, হাঙ্গেরী, ইটালীয় চলচ্চিত্রে সেই নির্বাক যুগ থেকেই ক্যামেরা স্টাইলে হলিউডী স্টাইলের বিপরীত লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। এখানে জার্মান এক্সপ্রেসনিস্ট সিনেমা, ইটালীয় নিওরিয়ালিজম ও ফ্রান্সের সিনেমা ভেরিতে, নুভেল ভাগ ইত্যাদি পর্যায়ের ছবির কথা এসে পড়ে। এ কথা অবিসংবাদী যে, ফরাসী শিল্পতাত্ত্বিক ও চলচ্চিত্র স্রষ্টা আন্দ্রে বাজাঁর 'শিল্পে বাস্তবতা'র তত্ত্বই তাঁর মূল আলোচ্য বিষয় ছিল, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইওরোপীয় চলচ্চিত্র চর্চায় বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। সেই সঙ্গে ফরাসী নবতরঙ্গের উদ্গাতাও ছিলেন তিনি। তিনি নানা শ্রেণীর চলচ্চিত্রকারদের ছবির

আঙ্গিক থেকে আলোচনার উপাদান সংগ্রহ করলেও ক্যামেরার বাস্তবতার দার্শনিক দিক ব্যাখ্যায় নির্ভর করেছিলেন বিশেষ ভাবে যুদ্ধোত্তর ইটালীয় নিওরিয়ালিজম গোত্রের দাবির ওপর। এই নিওরিয়ালিজম বা নয়াবাস্তবধর্মী ছবির শিল্পধারাতেই ইওরোপীয় চলচ্চিত্র নির্মাণ রীতির অতীত ও ভবিষ্যৎ একীভূত হয় এবং এখান থেকেই তাঁদের স্টাইলের পৃথকীকরণ ঘটে। ইটালীর নয়াবাস্তবধর্মী যেকোনো প্রতিনিধি স্থানীয় ছবিতে দৃশ্যগ্রাহ্য স্টাইলের স্বাতন্ত্র্য সহজেই লক্ষণীয়। ফোটোগ্রাফির রুক্ষ ধূসরতা, শহরের পরিত্যক্ত পাংশুবর্ণের অঞ্চলের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ চরিত্রদের ফ্রেমিং, ধ্বংসপ্রাপ্ত বসতবাড়ী বা শহরের জনহীন পার্কে, ভাঙাচোরা দেওয়ালের প্রান্ত ধরে চরিত্রদের ভ্রাম্যমাণতা। ক্যামেরা কখনো স্থির কখনো তির্যক ভঙ্গিতে ট্রাকিং শটে চরিত্র ও পটভূমিকে মূর্ত করছে—এমনতর নানা দৃশ্য সংকেত অন্য সবকিছু ছাড়িয়ে নয়াবাস্তবধর্মী ছবির শরীর ও আত্মার সন্ধান দেয়। এক নতুন দৃশ্যকল্প নির্মাণ তথা কাহিনীবর্ণনায় শিল্পচেতনার জন্ম সূচিত হ'ল।

নিওরিয়ালিস্ট পরিচালকেরা ক্যামেরাকে জনতার মিছিলে উন্মুক্ত রাস্তায় বিচরণের ছাড়পত্র দেওয়ার পাশাপাশি অপেশাদার অভিনেতা আর শ্রমজীবী ও কৃষকশ্রেণীর মানুষদের জীবন জীবিকা ও প্রাত্যহিক বেঁচেবর্তে থাকার কাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে, তাঁদের জাতীয় সিনেমার ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব জ্ঞাপন করেছিলেন। গোটা পশ্চিমী সিনেমার শিল্প ঐতিহ্য যা হলিউডের মাটিতে পূর্ণতা পায় তার বিরুদ্ধে তাঁদের তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছিল। ইটালীয় নয়াবাস্তবতার বিশিষ্ট প্রতিভূ জাভাত্তিনী লিখেছিলেন—"The Americans continue to satisfy themselves with a sweetened version of truth produced through transposition." [৭] হলিউডী চিত্রনির্মাতারা বস্তুসত্যের এই রূপান্তরিত সৌন্দর্যেই তৃপ্ত ছিলেন। আর বিদ্যমান সত্যের কতোটা সিনেমার রূপাঙ্গিকে বিধৃত হবে এবং স্রষ্টার কোন্ শিল্প অভিপ্রায়ে, সেই সমস্যা মোকাবিলা থেকেই ইটালীয় নয়াবাস্তবধর্মী ছবির ক্যামেরা রীতির জন্ম হয়। বস্তুসত্যের সঠিক বিন্যাসের একান্ত চাওয়ায় যুদ্ধপরবর্তী ইটালীয়ান চলচ্চিত্রকারেরা স্বদেশের তিরিশ পূর্ববর্তী দশকের ছবিতে, যেখানে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবনবৃত্তান্ত অস্বীকৃত এবং উপেক্ষিত ছিল, সেখানে নয়াবাস্তববাদী পরিচালকেরা তাকেই ছবির মূল বিষয় ও বিন্যাস রীতির প্রধান অবলম্বন করে তুললেন। ফলে তাঁদের ছবির ক্যামেরার গতিময়তা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হ'ল। সিনেমার দৃশ্যগ্রহণের খুব সাধারণ প্রচলিত রীতিগুলো যেমন 'ওভার দ্য শোল্ডার শট', সংলাপ দৃশ্য গঠনের তথাকথিত 'পিংপং' পদ্ধতি ইত্যাদির কোনটাই ইওরোপীয় সিনেমায় অনুসৃত হয়নি। আইজেনষ্টাইনের চলচ্চিত্রকর্ম এবং নন্দনতাত্ত্বিক সমালোচনাই প্রথম এবং প্রধান এক বিকল্প চলচ্চিত্র রীতির প্রবর্তন করেছিল, যা ইওরোপীয় চলচ্চিত্র নির্মাণে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। অতি আধুনিক ইওরোপীয় চলচ্চিত্রের ক্যামেরা স্টাইলে কিছু কিছু ভিন্ন আঙ্গিক আমরা লক্ষ্য করি তা সেসব ছবির সৃজনশীল পরিচালকদের বিষয়বস্তু নির্বাচন ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে নব নিরীক্ষার প্রয়াসেই সাধিত হয়েছে।

সিনেমার উষালগ্নে লুমিয়ের ও মেলিসের উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত রীতি এই মাধ্যমের ভবিষ্যৎ জনপ্রিয়তা সুদৃঢ় করেছিল। এঁদের দু'জনের শিল্প উৎস থেকে জন্ম নিয়েছিল সিনেমার দুটি ধারা—তথ্যচিত্র ও কাহিনীচিত্র। পরে চলচ্চিত্রের স্বকীয় ধারায় বিবর্তিত হয়েছে নানা আঙ্গিক। মার্কিন চলচ্চিত্রকার পোর্টার কাহিনীচিত্রের শিল্পশর্তকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলেন একাধিক দৃশ্যক্রম বিভাজনের রীতিতে। গ্রিফিথ এনে দিয়েছিলেন ক্লোজ-আপের নতুন মাত্রা, প্যারালাল কাটিং ও মন্তাজ। ওয়েমারের সময়কার জার্মানীতে বিশেষ শৈলীর কৃত্রিম সেটে তৈরি 'এক্সপ্রেসনিস্ট'

সিনেমার গঠন ছবির চরিত্রদের মনস্তাত্ত্বিক পরিমণ্ডল ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে সূত্রবদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধোত্তর রাশিয়াতে কুলেশভ, আইজেনষ্টাইন, পুদভ্কিন, গ্রিফিথের মন্তাজ রীতির শক্তিকে সম্প্রসারিত করেন। যদিও, এঁদের বাইরে বিদেশের অন্য ভূখণ্ডে বেশ কিছু অগ্রগণ্য স্রষ্টা যেমন, রেনোয়ার মত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রকার থাকা সত্ত্বেও, তিরিশ দশকের ইওরোপীয় সিনেমার ঔজ্জ্বল্য খানিকটা ম্লান হয়ে পড়ে। ফ্যাসিবাদ এবং দ্বিতীয় মহাসমর সেখানকার সৃজনশীল চলচ্চিত্র নির্মাণে চল্লিশ দশকের মধ্যবর্তী সময়ের নিওরিয়ালিজম আসার আগে পর্যন্ত বাধার সৃষ্টি করে রেখেছিল। পঞ্চাশ দশকে মার্কিন স্টুডিওগুলোর প্রভুত্ব কমতে থাকে এবং পাশাপাশি প্রধান কয়েকজন ইওরোপীয় চলচিত্রকারের উত্থান লক্ষিত হয়, যাঁদের মধ্যে বার্গম্যান ও ফেলিনির নাম বিশেষ স্মরণযোগ্য। ফ্রান্স ও অন্যত্র নবতরঙ্গ রীতির চলচ্চিত্র আবির্ভাবের সঙ্গে ইওরোপীয় সিনেমা তাদের তিরিশ ও চল্লিশ দশকে হারিয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠা আবার পুনরুদ্ধার করে। সেইসঙ্গে তাদের নব্যধর্মী চলচ্চিত্র মার্কিন শিল্পরীতির বিকল্প স্বরূপ এক গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক হিসেবে প্রভাবশীল হয়ে ওঠে।

শিল্প অভিপ্রায় ও চিত্রনির্মাণের ক্ষেত্রে জার্মান এক্সপ্রেসনিজম আপাত দৃষ্টিতে ইটালীয় নয়াবাস্তবধর্মী ছবির একেবারে ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হলেও তা ছিল উল্লেখযোগ্য শিল্পরূপ। আইজেনষ্টাইন রীতির বিপরীত স্টাইল হিসেবে এক্সপ্রেসনিস্ট চলচ্চিত্রে Mise-en-Scene-এর অতিরঞ্জিত রূপ প্রকাশ পায়। মানুষের মনস্তাত্ত্বিক স্তরের নিবিড় ও বিমূর্ত রূপ তুলে ধরায় এক্সপ্রেসনিস্ট চলচ্চিত্রকারেরা আগ্রহী ছিলেন। "To the growing strength of Hollywood melodrama and its obsessive continuity, to Eisenstein's clash of image's history, Expressionism opposed a cinema legend and myth, presenting cultural archetypes and psychic struggle in the form of tableaux".[৮] রবার্ট ওয়াইনের 'দ্য ক্যাবিনেট অফ ডক্টর ক্যালিগরি', 'ডক্টর গোলেম', ফ্রিৎস্ ল্যাঙের নরডিক উপকথার চিত্রিতরূপ 'সিগফ্রেড' এবং 'ক্রিয়েমহিল্ডস্ রিভেঞ্জ', ফ্যাসিবাদী ভবিষ্যতের মীথের রূপকে তৈরি তাঁর 'মেট্রোপলিস', মুরনোর 'ফাউস্ট' এবং চলচ্চিত্রের প্রথম ড্রাকুলা ছবি 'নসফেরাতু'—এ সব ছবিতেই পাত্র পাত্রীদের শারীরিক গতিবিধি, কার্যকারণ ও সেটের রূপসজ্জা, আমাদের পরিচিত চিন্তাচেতনা রীতি থেকে বিচ্ছিন্ন, যার প্রতিরূপ জন্ম নিয়েছিল পরিচালকদের মনস্তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা থেকে। "The declared aim of the Expressionists was to eliminate nature and attain absolute abstraction."[৯] এই রীতি বিশেষ ভাবেই মার্কিনী ভঙ্গি ও আইজেনষ্টাইন পদ্ধতি—উভয় রীতি থেকেই আলাদা। কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার যে জার্মান এক্সপ্রেসনিজম পক্ষান্তরে হলিউড ছবি তৈরিতেও প্রভাব ফেলেছিল। এক্সপ্রেসনিস্ট চলচ্চিত্রকারদের অনেকেই পরবর্তীকালে হলিউডে গিয়ে ছবি করেন। 'ইউনিভার্সাল' কোম্পানির তিরিশ দশকের ভৌতিক ছবিতে (Horror film) এর ছাপ খুব স্পষ্ট। এই স্টাইলাইজেশনকে ওরসন ওয়েলস্ নিজস্ব ঢঙে তাঁর 'Citizen Kane' ছবিতে প্রয়োগ করেন, যা চল্লিশ দশকের film noir-কে প্রভাবিত করে। সত্তর দশকের জার্মান চলচ্চিত্র যখন অন্য ভাবনাচিন্তার অনুষঙ্গে পুনরুজ্জীবিত হয় তখন এক্সপ্রেসনিস্ট রীতির আধুনিকীকরণ সমস্যা সৃষ্টি করে। ওয়ার্নার হারজোগ মুরনোর 'নসফেরাতু' ছবির নোতুন সংস্করণ চিত্রায়িত করেন যেখানে পূর্বতন ছবির কিছু ঢঙ অনুসরণ করেও মুরনোর অনেক প্রয়োজনীয় প্রাকরণিক রীতি থেকে তিনি সরে এসেছিলেন। ফ্যাসবিণ্ডার এক্সপ্রেসনিস্ট আন্দোলনের তাগিদ অনুভব করেছিলেন কিন্তু তার স্টাইলকে অনুসরণ করেননি। অপর সমসাময়িক জার্মান পরিচালক উইম ওয়েণ্ডারের মতো ফ্যাসবিণ্ডারের মধ্যে যে পরিমাণে

আমেরিকান 'ফিল্ম নোয়া' ও এক্সপ্রেসনিস্ট প্রবণতা ছিল, ঠিক সমপরিমাণেই তাঁর স্বদেশী সিনেমার ঐতিহ্যের শিকড়ও তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল।

ইওরোপীয় ফিল্মে ভিন্নতর ক্যামেরার স্টাইল অর্থাৎ ভিস্যুয়ালের নবীকরণে ফরাসী চলচ্চিত্রস্রষ্টা জাঁ রেনোয়ার অবদান অসামান্য। ইটালীয় নয়াবাস্তবতা, ফরাসী নবতরঙ্গ ও সমধর্মী চলচ্চিত্র আন্দোলন দানা বাঁধবার আগেই তিনি মার্কিন স্টাইলের সম্পূর্ণ বিপরীত এক রীতির জন্ম দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর ক্যামেরার গতি এবং কাটিং পদ্ধতি পাত্র পাত্রীদের ক্রিয়াকলাপের সুযোগ বাড়িয়ে দেয়, অভিনেতা অভিনেত্রীদের চলাফেরা, মুখমণ্ডলের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, সর্বোপরি প্রাকৃতিক দৃশ্যগত সাযুজ্যকে সম্পৃক্ত করে ও বাড়িয়ে দেয়। রেনোয়ার ছবির এই ধরনের প্রকরণের ব্যাখ্যায় আন্দ্রে বাজাঁ লিখেছিলেন—"Renoir...understands that the screen is not simple rectangle. ...It is very opposite of a frame. The screen is a mask whose function is no less to hide reality than it is to reveal it. The significance of what the camera discloses is relative to what it leaves hidden."[১০] একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, রেনোয়াই প্রথম অগ্রগণ্য চলচ্চিত্র স্রষ্টা যিনি চলচ্চিত্রের পর্দায় কাহিনী বিন্যাসের জন্য অনেকটা জায়গা খোলা রাখেন, যাতে দর্শকেরা কাহিনীবিন্যাসের প্রবহমানতায় সক্রিয় অংশ নিতে পারেন। দৃশ্যগত ও আখ্যানগত স্থানের মহত্ত্ব ষাট দশকের নব্যধর্মী ছবির প্রধান উপকরণ হয়ে উঠেছিল আর এই প্রসঙ্গে রেনোয়া নেতৃস্থানীয় শিল্পব্যক্তিত্বে বিরাজ করেছেন। ক্রুফো প্রত্যক্ষভাবে রীতির দিক থেকে তাঁকে অতিক্রমের চেষ্টা করেছেন, গোদার রেনোয়ার অবাধ গতিময়তাকে গ্রহণ করেছিলেন। ষাট দশকের প্রায় সব উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রকারেরা ক্যামেরার ভাষা ও দৃশ্যপরম্পরার গতির জন্য অল্প বিস্তর রেনোয়ার কাছে ঋণী। ইটালীর নয়াবাস্তবতার পরিচালকেরা রেনোয়া ও তাঁদের মধ্যে একটা শিল্পসেতু আবিষ্কার করেছিলেন। ১৯৩৪ সালে তৈরি রেনোয়ার Toni ছবিটাকে ইটালীয় চলচ্চিত্রকারেরা তাঁদের শিল্পদর্শনের সমধর্মী হিসেবে প্রশংসা করেছিলেন। দশবছর পরে, যুদ্ধোত্তর ইটালীর প্রেক্ষাপটে যে নয়াবাস্তব রীতির সিনেমা সম্ভাবিত হয়, রেনোয়ার এই ছবিতে তার বীজ নিহিত ছিল। ছবিটি তৈরি হবার বিশ বছর পরে 'টোনি' ছবির নির্মাণশৈলীর ব্যাখ্যায় রেনোয়ার স্বগত সংলাপে নিওরিয়ালিস্ট পরিচালকদের কথা ধ্বনিত হয়েছিল—"Good photography...sees the world as it is, selects it, determines what merits being seen and seizes it as if by surprise, without change. ... At the time of Toni...my ambition was to integrate the non-natural elements of my film, the elements not dependent on chance encounter, into a style as close as possible to everyday life. The same thing for the sets. There is no studio used in Toni. The landscape, the houses are those we found. ...Our ambition was that the public would be able to imagine that an invisible camera had filmed the phases of a conflict without the characters unconsciously swept along by it being aware of its presence."[১১]

সিনেমা মাধ্যমের জন্মের অর্ধশতাব্দী পরে আগত নয়াবাস্তবধর্মী ছবির মৌলিক শিল্পতত্ত্বই মুখ্যতঃ বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ও জনপ্রিয় চলচ্চিত্র নির্মাণ পদ্ধতির বিপরীত এক স্বকীয় স্টাইলের সূচনা করে। গোটা ইওরোপীয় সিনেমায় এর প্রভাব বাস্তবধর্মী ছবি তৈরির অনুষঙ্গে আলোচিত হ'য়ে থাকে। ইটালীয় ক্যাথলিক সমালোচক ব্যাখ্যা করেছিলেন—"The Italian neo-realist school is based on a single thesis dramatically opposed to that thesis which

regards the cinema only in terms of lighting effects, worlds and purely imaginary situations. Neo-realism thesis is that the screen is a magic window which opens out into the 'real'; that cinematic art is the art of recreating, through the exercise of free choice upon material world, the most intense vision possible of the invisible reality inherent in the movement of the mind."[১২] ডি সিকার বিশ্ববিখ্যাত ছবি 'বাইসাইকেল থীভস্' আলোচনা প্রসঙ্গে বাজাঁ বলেছিলেন যে এটাই 'বিশুদ্ধ সিনেমা'র প্রথম নিদর্শন। এখানে অভিনেতা নেই, গল্প নেই, সিনেমার তথাকথিত সেট নেই। নিখুঁত নান্দনিক দৃশ্যমায়ায় তৈরি সিনেমা সেক্ষেত্রে চলচ্চিত্রই নয়। বাজাঁ এবং তাঁর গুণগ্রাহী নয়াবাস্তবধর্মী পরিচালকেরা এমন এক আঙ্গিকের সন্ধান করেছিলেন যেখানে ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ দৃশ্যগ্রহণ পদ্ধতি বস্তুবিশ্বকে মধ্যস্থতা ছাড়াই আমাদের সামনে হাজির করবে। এই রীতিতে তৈরি ছবির কাটিং পদ্ধতি দৃশ্যের অতিরিক্ত কিছু জোগায় না, কেবল প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া ছাড়া। দর্শকদের আকর্ষণ যতটুকু আদায় করা দরকার দৃশ্যের কাটিং ততোটুকুই দেয়, ক্লোজ আপ এবং দৃষ্টিকোণ নির্বাচিত শটগুলোতে আমরা চরিত্রকে দেখি এবং সে কি দেখছে তা লক্ষ্য করি, প্রায় সব ক্ষেত্রেই দৃশ্যগত পরিবেশ প্রাধান্য পায় যার মধ্যে ছবির চরিত্র জড়িয়ে রয়েছে। ছবির দৃশ্যকল্প যাবতীয় অর্থ দ্যোতনা করছে যার মধ্যে ছবির প্রতিপাদ্যও স্বয়ং বিদ্যমান।

তিরিশ দশকের হলিউডী ক্যামেরা স্টাইল দৃশ্যকল্পে ততোটা মনোযোগী ছিল না, পরিবর্তে যেভাবে দৃশ্যকল্প নিদারুণ পরিবেশে প্রথাগতভাবে ব্যবহারযোগ্য চরিত্রদের হাজির করতে পারে, তারই ক্রমবিন্যাসে গড়ে তোলা কাহিনীধারার দিকেই বেশি লক্ষ্য দিত। নয়াবাস্তবধর্মী চলচ্চিত্রকারেরা এই কাহিনী প্রবহমানতাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেননি, কিন্তু আবার এই রীতির স্বার্থে তাঁদের স্বকীয় দৃশ্যকল্পের মৌলিকতাকে ত্যাগ করেননি। তাঁরা সিনেমার ইমেজকে নিজস্ব জগৎ তৈরির ছাড়পত্র দিয়েছিলেন যেখানে ক্যামেরায় গৃহীত দৃশ্যসজ্জা সহজ স্বাভাবিকভাবে প্রার্থিত পরিমণ্ডল গড়ে তুলবে, যতোটা কম অলংকৃত হয় সেইভাবে।

রোজালিনীর 'Paisa' ছবির শেষ দৃশ্যক্রম স্মরণ করা যেতে পারে। সেই ছোট্ট বালকটি যার সঙ্গে মার্কিন নিগ্রো লোকটির একটা সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। ছবির শেষে বালকটির Close-up যেখানে ছেলেটির ভীত মুখমণ্ডল আমরা দেখি, সেই সঙ্গে সংলগ্ন দূরবর্তী শটে মার্কিন নিগ্রো সৈনিকটি জীপ গাড়ী চালিয়ে দূরে মিলিয়ে যায়। এখানে রোজালিনী দর্শকের আবেগ জোর করে আদায় ক'রে নেন না, কিন্তু শহরের দারিদ্র্যপীড়িত হতাশ্বাস অবস্থার সঙ্গে আমরা একাত্মতা লাভ করি যা নিগ্রো সৈনিকটির তাঁর নিজের অবস্থার ভেতর দিয়ে শ্লেষাত্মকভাবে প্রতিফলিত হয়। পরিচালক এখানে কেবল সামান্য ইঙ্গিত দিয়েই ছবি শেষ করেছেন। কোনো অতিরিক্ত দৃশ্যকল্প জুড়ে দেন নি। যুদ্ধোত্তর ইটালীর তদানীন্তন পরিস্থিতির সংকটময় দুরবস্থা এবং মর্মান্তিক পরিস্থিতির কারুণ্য দৃশ্যের স্বাভাবিকতায় ছবির পর্দা থেকে দর্শকদের মনে সঞ্চারিত হ'য়ে যায়। পরিচালক বালকটির চেয়ে থাকা আর দূরে মিলিয়ে যাওয়া জীপগাড়ীর সৈনিকের দৃশ্যের মধ্যে দর্শকদের ছেড়ে দেন।

ডি সিকার 'বাইসাইকেল থীভস্' ছবির শেষ দৃশ্যক্রমেও অনুরূপ ব্যঞ্জনা মূর্ত হয়েছে। ছবির নায়ক রিক্কি নিজের সাইকেল চুরি হওয়ায় বহুকষ্টে জোগাড় করা চাকরিস্থলে পৌঁছতে পারে না। সে গোটা শহর হন্যে হ'য়ে তার সাইকেল খুঁজে বেড়ায়। অগত্যা মরিয়া হয়ে অপরের একটা সাইকেল চুরি করে পালাতে গিয়ে জনতার হাতে ধরা পড়ে এবং চরম লাঞ্ছিত হয়। তার ছোট্ট ছেলে ব্রুনো বাবার লাঞ্ছনার সাক্ষী হয়। এক নিদারুণ মর্মস্পর্শী দৃশ্যে ডি সিকা লাঞ্ছিত, অপদস্থ

রিক্কিকে জনতার হাত থেকে রেহাই দেন। তখন অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষের ভীড়ে বাবা ও ছেলে হাত ধরাধরি করে মিলিয়ে যায়। নয়াবাস্তববাদী চলচ্চিত্রকারেরা সেই জগৎ জীবনের ইমেজ পর্দায় তুলে ধরতে চেয়েছিলেন যা প্রথাগত সিনেমা ঐতিহ্যে উপেক্ষিত ছিল। তাঁরা সিনেমার ক্যামেরা নির্মাণ কৌশলের ওপর নির্ভর করে সেই কৌশলকে বাস্তবের নবতর রূপের মধ্যে উত্তীর্ণ করেছিলেন। মার্কিন চলচ্চিত্র ও মার্কিন সিনেমাঅনুসারী ও প্রভাবিত যাবতীয় চলচ্চিত্র কর্মের অলীক বাস্তবতার বিরুদ্ধে তাঁরা প্রশ্ন তুলেছিলেন।

সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বিশ্বের যাবতীয় শিল্পশাখায় রূপাঙ্গিকের বিবর্তন ঘটতে শুরু করে। ব্রেখট্ বলেছিলেন—'Reality changes; in order to represent it, modes of representation change'। ইম্প্রেসনিস্ট পরবর্তী আন্দোলনের যুগে তথাকথিত নিসর্গচিত্র ও মানুষের শরীরী সংস্থান চিত্রকলা থেকে অপসৃত হ'তে শুরু করে। বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়ায় চিত্রকর, নাট্যকার, কবি, চলচ্চিত্রকারেরা তাদের শিল্পের ক্ষেত্রে বৃহত্তর দর্শকগোষ্ঠীর উন্মুখ হ'য়ে ওঠেন। দুটি যুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্বে ঔপন্যাসিকেরা কেবল তাঁদের ভাষার রচনা কৌশল নিয়েই নয়, কি বলা হচ্ছে তা নিয়েও ভাবিত ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, আধুনিক সাহিত্য ও চিত্রকলার আঙ্গিকে চলচ্চিত্রের বিবর্তমান টেকনিকের প্রভাব পড়েছিল। সময় ও সময়হীনতা, বাস্তবিক সময় ও মনস্তাত্ত্বিক সময় প্রবাহের চিত্রণ বর্ণনায় মার্সেল প্রুস্ত, জেমস্ জয়েস, ডস প্যাসোস, ভার্জিনিয়া উলফ্ প্রমুখ লেখকেরা সিনেমার কাটিং, ডিজলভ্, মন্তাজ রীতির অনুবর্তনে নোতুন সাহিত্য স্টাইল তুলে ধরেন। রাশিয়ার আভাঁগার্দ আন্দোলনের পুরোধা আইজেনষ্টাইন, ফ্রান্সের বিশ ও তিরিশ দশকের আভাঁগার্দ আন্দোলনের শরিক আবেল গাঁস, জাঁ আপস্তাঁ, লুই ডেলুক, মার্সেল লে হারবিয়ের, রেনে ক্লেয়ার, হল্যাণ্ডের ইয়োরিস ইভান্স, জার্মানীর ওয়াল্টার রুটমান প্রমুখের ঐকত্রিক প্রচেষ্টায় ইওরোপীয় চলচ্চিত্রের নির্মাণ শৈলী আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল। পাশাপাশি সিনেমার গঠনতন্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে বুনুয়েলের নিরন্তর চিন্তাও ইওরোপীয় সিনেমার ক্যামেরা বিন্যাসকে নোতুন মাত্রা দেয়।

কিছু ভিন্নগোত্রের ইওরোপীয় ছবি বিষয়ের মনস্তাত্ত্বিক উন্মোচনে ক্যামেরার গতিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য হয়ে আছে। যেমন রোজালিনীর 'Voyage in Italy' ছবিটি। কেবল কাহিনীর সিদ্ধান্তেই নয়, এ ছবির দৃশ্যক্রম যেভাবে চরিত্রদের অন্তর বাহির তল্লাশ করেছে তাতে ছবির দৃষ্টিকোণের উপস্থাপনায় দর্শকও চরিত্রদের পারস্পরিক আদান-প্রদানের শরিক হয়ে পড়েন। ব্যক্তি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক স্তর উন্মোচিত হয় এখানে। ক্যামেরায় বিধৃত দৃশ্যকল্পের বস্তুসত্য সরাসরি প্রতিফলিত হয়েও তন্ময় ও মন্ময় চেতনার স্তরে পৌঁছয়। নয়া বাস্তবধর্মী ছবির কঠোর বাস্তবতার ভূমি ছেড়ে এ ছবি নোতুন রীতির সিনেমার আগমন সূচিত করে, যেখানে বস্তুবিশ্ব কেবল ক্যামেরায় ধরা থাকবে না, চরিত্র ও দর্শকের চেতনার অপরিহার্য অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে। এরম্যান্নো ওল্মি তাঁর 'The Tree of Wooden Clog' ছবিতে নয়াবাস্তবধর্মী ছবির অনুষঙ্গ গ্রহণ করেও ক্যামেরা রীতিতে নিজস্ব চিন্তা আরোপ করেছেন। তিনি দৃশ্যের মধ্যে অবিরামভাবে কাট ব্যবহার করেন এবং তাঁর খণ্ড দৃশ্যগুলোও খুব ছোট ছোট। তিনি যতটুকু দেখাতে চান দর্শক ততোটুকুই দেখার সুযোগ পায়, তাঁর দৃশ্যক্রমের টুকরো টুকরো অংশগুলো পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, প্রতিটি টুকরো দৃশ্যই আমাদের পর্যবেক্ষণকে পাল্টে দেয় এবং প্রসারিত করে, যা একাধিক সুরের মিশ্রণে তৈরি এক সাংগীতিক মূর্ছনার মতো বহুলোকের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপকে বিধৃত করে, যার মধ্যে এক ও বহুর একাধিক নাট্যসংঘাত সংলগ্ন থাকে। এর মধ্যে সবকটি শটই পরস্পর সম্পৃক্ত হ'য়ে প্রত্যেকটি পর্বকে এগিয়ে দেয়।

অন্যান্য সমসাময়িক ইওরোপীয় চলচ্চিত্রকারদের মতো ইটালীয় পরিচালক আন্তনিওনি ক্লোজ-আপ-এর ব্যবহারে ততোটা উৎসাহী ছিলেন না। যদিও তাঁর ছবির অপরিহার্য অংশে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে তিনি ক্লোজ-আপ ব্যবহার করেছেন। তাঁর ছবিতে যে পারিপার্শ্বিকতা ছবির ক্যামেরার গতিময়তায় ধরা দেয় তা চরিত্রের প্রাতিস্বিকতা থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তিরিশ দশকের গোড়া থেকেই রেনোয়া ও অপরাপর সৃজনশীল ইওরোপীয় পরিচালকেরা আইজেনষ্টাইন ও মার্কিন কাটিং রীতির বিপরীত এক পদ্ধতিতে কাজ করছিলেন। আন্তনিওনি মূলতঃ ছবিতে লঙ টেক ব্যবহার করেন যেখানে অবিচ্ছিন্ন, অনির্দেশিত দৃষ্টিপাতের মধ্যে মানুষ এবং বস্তু দর্শকের গোচরে আসে। দৃশ্যের মধ্যে তিনি ডীপ ফোকাস-এর পক্ষপাতী যাতে নিকট ও দূর দর্শকের দৃষ্টিতে সমান উজ্জ্বলতায় প্রতীয়মান হয়। তাঁর ক্যামেরার দীর্ঘ বিলম্বিত টেকিং কেবল বস্তুজগতের বাস্তব প্রতিফলনই ঘটায় না, তিনি তার ভেতর দিয়ে ব্যক্তিবিশেষের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক অবস্থা, সেইসঙ্গে সমকালীন ইওরোপীয় মানুষের বিশেষ শ্রেণীচরিত্রের অনুভূতির স্তরটিকে উন্মোচিত করেন।

ফরাসী 'নুভেল ভাগ' বা 'নবতরঙ্গ' আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা জাঁ লুক গোদার ১৯৫৯-এর কান চলচ্চিত্র উৎসবে ত্রুফোর 'Four Hundred Blows' ছবির নির্বাচন উপলক্ষে এক ইস্তেহারে ফ্রান্সের একাধিক সনাতনপন্থী পরিচালকদের সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে লেখেন—"Your camera movements are ugly because your subjects are bad, your casts act badly because your dialogue is worthless; in a word you don't know how to create cinema because you no longer even know what it is.....

It is our films which will go to Cannes to show that France is looking good, cinematographically speaking."[১৩] গোদারের এই ঘোষণায় এটুকু প্রতীয়মান হয় যে, ফরাসী নবতরঙ্গের হাত ধরে ইওরোপীয় চলচ্চিত্রে নোতুন স্টাইলের আগমন ঘটলো।

নবতরঙ্গের জন্ম ষাট দশকে হলেও এর বীজ নিহিত ছিল দশ বছর আগের এক বৈপ্লবিক চিন্তাধারার মধ্যে। ১৯৪৮ সালে ঔপন্যাসিক, সমালোচক, চলচ্চিত্রকার আলেকজান্দার আস্‌ত্রুক সিনেমা নির্মাণ বিষয়ে তাঁর ঐতিহাসিক তত্ত্ব 'La Camera Stylo'-র কথা ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে চলচ্চিত্রকারও ঔপন্যাসিকের কলমের মতোই তাঁর বক্তব্য ও ঘটনাকে ক্যামেরার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলবেন। নবতরঙ্গের পরিচালকেরা আসত্রুকের সেই কথাকেই এক দশক পরে তাঁদের ছবিতে সার্থক করে তোলেন। "Director is no longer a means of illustrating or presenting a scene, but a true act of writing. The film maker/author writes with his camera as a writer writes with his pen."[১৪] এরই সঙ্গে তৈরি হ'ল আরো কয়েকটি নন্দনতত্ত্ব—Mise-en-scene এবং 'Politique des auteurs.'। ক্যামেরাকে আরো যুক্তি শৃঙ্খলার পারম্পর্যে ব্যবহার ক'রে মানুষের জীবনকে বহুধা বিচ্ছিন্ন স্তর থেকে একেবারে চলচ্চিত্রের পর্দায় মেলে ধরলেন তাঁরা। চল্লিশ দশকের নয়াবাস্তববাদী আন্দোলন ছিল মূলতঃ একটা দর্শনকেন্দ্রিক যেখানে things as they are ছিল সেইসব স্রষ্টাদের লক্ষ্য। নুভেলভাগ মূলতঃ ক্যামেরা তথা সিনেমার সার্বিক আঙ্গিক প্রকরণের আন্দোলন। things as they are শুধু নয়, সেইসঙ্গে things as they ought to be-কে চিত্রিত করা হয়ে উঠল তাঁদের প্রধান অভিপ্রায়। ছবিতে সাধারণ cut-এর পাশাপাশি Jump cut, জুম-এর স্বকীয় ব্যবহার, হ্যাণ্ডহেল্ড ক্যামেরার যথেচ্ছ ব্যবহার, ফ্রীজ শট, স্লোমোশন, ফ্ল্যাশব্যাকের নোতুন ব্যঞ্জনা ইত্যাদি নানা প্রক্রিয়া আধুনিক ইওরোপীয় চলচ্চিত্রে ক্যামেরার ভাষায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করলো।

আলা রেনের ক্যামেরা মুভমেণ্ট প্রবহমান সময়ের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সাহিত্যের মগ্ন চৈতন্যের সমকক্ষতায় নিজস্ব কাটিংয়ে চলচ্চিত্রের পর্দায় অদ্ভুত নৈপুণ্যে চিত্রিত হ'ল। ছবির পর্দায় Time ও Space এক অনন্য বিরল দার্শনিক প্রজ্ঞা অর্জন করলো। তাঁর 'হিরোশিমা মন আমুর', 'লাস্ট ইয়ার এ্যাট মারিয়েনবাদ' ও আরো অনেক ছবি সিনেমার পর্দায় অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের কালচিহ্নে একাকার হয়ে এক মন্ময় প্রতিভাস গড়ে তুলেছিল, যার বিকল্প চিত্ররূপ আজও ইওরোপীয় চলচ্চিত্রে দেখা যায়নি।

ফরাসী নবতরঙ্গের গোদারই প্রধান ব্যক্তি যাঁর ক্যামেরা স্টাইল, জাম্প্ কাট পদ্ধতি, মন্তাজ রীতি, কাহিনী ভাঙার নিজস্বতা অব্যবহিত পরবর্তী ফরাসী সিনেমা তথা গোটা ইওরোপের নোতুন প্রজন্মের চিত্র-পরিচালকদের ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। এমনকি কানাডা, ব্রাজিল ও লাতিন আমেরিকার আধুনিক চলচ্চিত্র গোদারের সিনেমাতত্ত্ব ও ক্যামেরা প্রয়োগ পদ্ধতির দ্বারা অসীম প্রভাবিত। গোদারের প্রথম কাহিনীচিত্র 'Breathless' থেকেই তিনি ক্যামেরা রীতি তথা সিনেমার প্রথাসিদ্ধ ফর্ম্ ভাঙলেন। এ ছবির প্রথম দৃশ্য শুরু একটি খবরের কাগজ-এর শট থেকে। খবরের কাগজের একটি বিজ্ঞাপনের close up-এ নারীর অন্তর্বাসের পোশাকে একটি মেয়ের শরীর— মার্কিন ছবিতে এমত শুরু থাকে না। সেখানে আগে থাকে একটি লঙ শট যা স্থানের পরিচয় দেয় যা পরবর্তী কাটিংয়ের মাধ্যমে দর্শকের কাছে প্রতিভাত হয়। এর পরবর্তী বেশ কয়েকটি দ্রুত কাটিংয়ে আমরা দেখি খবরের কাগজটি মাটিতে পড়ে যায়। খবরের কাগজ ধরে থাকা লোকটির মুখে সিগারেট, মাথার টুপিটা চোখ পর্যন্ত ঝুঁকে রয়েছে, লোকটি মুখ থেকে সিগারেট সরিয়ে ঠোঁট দুটো রগড়ে নেয়, লোকটি রাস্তার একটি মেয়ের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে, মেয়েটি লোকটিকে একটি মোটর গাড়ীর প্রতি ইঙ্গিত করে, লোকটি সবেগে গাড়ীতে ঢুকে সেটি চালিয়ে উধাও হয়ে যায়। এখানে ধ্রুপদী ছবির dissolve ব্যবহার করে গোদার সময় ও স্থানের ইঙ্গিত দেন, দ্রুত কয়েকটি কাটিংয়ে রাস্তা পার হয়ে যাওয়া দৃশ্যমান হয়, অস্থির গতির কিছু cut প্রযুক্ত হয়, অপ্রত্যাশিতভাবে দৃশ্যের গতি পরিবর্তিত হয়। পরপর বেশকিছু শটে গাড়ীর ভেতর ও বাহির দৃশ্যমান হয়, লোকটি নিজের মনে গুনগুন করে গান করে এবং নিজের মনেই কথা বলে যায়, এবং দর্শকদের উদ্দেশ্য করেও কথা বলে, জনৈক পুলিশ গাড়ীটিকে থামায়। লোকটি পুলিশকে গুলি করে, কিন্তু এই গুলি ছোঁড়া অতি সংক্ষিপ্তভাবে দেখি আমরা, ক্যামেরা লোকটির হাতের অংশে pan করে, আবার কাটিংয়ের মাধ্যমে লোকটির হাতে ধরা পিস্তল দৃশ্যমান, আর একটি শটে পিস্তলের নলটিকে দেখা যায়, অন্য শটে পুলিশটি গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং পিস্তলের শব্দ শোনা যায়। পরের শটে লোকটি একটি মাঠের ভেতর দিয়ে ছুটে পালাতে থাকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অসংখ্য খণ্ড দৃশ্যের সমাহারে গোদার তথাকথিত ganster ছবির প্রত্যাশাকে ভেঙে চুরমার করে দেন। কেবল গোদারই নন, নবতরঙ্গের অন্যান্য চলচ্চিত্রকারেরাও ছবির ফ্রেম ও দৃশ্যক্রমের প্রতি দর্শকের দৃষ্টিপাতের ভাবনাটাকে পাল্টে দিয়েছিলেন। গোদারের চলচ্চিত্রে টেকনিকের প্রভাব যেমন দেখি মারি স্ট্রাউব, ড্যানিয়েটের ছবিতে, তেমনি দেখি বার্তোলুচি, প্যাসোলিনী, মিকলোস ইয়ানচো, ষাট দশকের বার্গম্যানের ছবিতে, বুনুয়েলের শেষ দিকের ছবিতে, লাতিন আমেরিকার সব প্রধান রাজনৈতিক চিত্র পরিচালক ও নোতুন জার্মান চলচ্চিত্রকার উইম ওয়েণ্ডার, ফ্যাসবিণ্ডার প্রমুখের সৃষ্টিতে।

গোদার বুঝেছিলেন যে সিনেমার ক্যামেরাই ব্রেখ্টীয় প্রয়োগবিধি কাজে লাগানোর প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। সেই সঙ্গে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রতি আগ্রহ বশত তিনি দৃশ্যবিভাজনের মন্তাজ রীতিতে ক্যামেরার গতিময়তায় তার স্বীকরণ করেছিলেন নিজের ভাবনা চিন্তা অনুযায়ী। এক

অনন্য শিল্পভাষা হিসেবে চলচ্চিত্র মানুষের অস্তিত্ব সংকটের চেহারা নিয়ে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা রাখে। এই সার্বিক মনোভঙ্গিই গোদারের চলচ্চিত্র স্টাইলের মধ্য দিয়ে সমগ্র ইওরোপীয় সিনেমার নির্মাণ প্রকরণে সঞ্চারিত হয়। পরবর্তীকালে ইওরোপের অন্যান্য সৃজনশীল চলচ্চিত্রকারেরা যখন সিনেমার ক্যামেরাকে জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন, তাঁদের স্টাইল ও প্রত্যয়ে গোদারীয় সিনেমা অভিজ্ঞান গভীরভাবে প্রোথিত ছিল। ষাট দশকের পরবর্তী পর্যায়ে সারা বিশ্বের বাণিজ্যিক ছবির নির্মাণশৈলী—লোকেশনের ব্যবহার, রঙের প্রয়োগ, কাটিং ও শট কম্পোজিশনের ভঙ্গি গোদারীয় শিল্প প্রবর্তনার চিহ্ন মনে পড়িয়ে দেয়।

নব্য জার্মান সিনেমার ক্যামেরা আঙ্গিকে ফরাসী নবতরঙ্গের প্রভাব ঈষৎ দেরীতে পৌঁছলেও সেখানকার উল্লেখযোগ্য পরিচালক আলেকজান্দার ক্লুগ, উইম ওয়েণ্ডার, ফ্যাসবিণ্ডার, ওয়ার্নার হারজোগ নবতরঙ্গের আদলে সিনেমাকে নোতুন করে আবিষ্কার করেন। ক্লুগের ক্যামেরায় কাহিনীর প্রবহমানতা ছিন্ন হ'ল অনেকটা ব্রেখ্‌টীয় ও গোদারীয় স্টাইলে, যাকে বলা যেতে পারে 'narrative deconstruction'। ফ্যাসবিণ্ডার দর্শকের দৃষ্টি সেইসব বস্তুর ওপর আকৃষ্ট করলেন যা সাধারণ দেখার অভিজ্ঞতায়, আকর্ষণহীন, অতি সাদামাটা, তাঁর ক্যামেরা একান্তভাবেই সামনা সামনি ও নিশ্চল, পাত্র পাত্রীরা সংলাপ বলা ছাড়া বিশেষ কিছু করে না। তাঁর ছবিতে অভিনয় করার জন্য নির্দিষ্ট স্থানিক ব্যবধান অল্প এবং একঘেয়েমি শ্লথ গতিতে পর্যবসিত।

ওয়ার্নার হারজোগের সিনে ক্যামেরায় ধরা পড়ে এক অধিবিদ্যাসজ্জাত (metaphysical) জগতের অধ্যাস। তাঁর বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য না থাকলেও ছবির ফ্রেম, দৃষ্টিকোণ নির্বাচন তথা ক্যামেরার গতিময়তায় এক ধরনের অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনার আভাস থাকে, ব্রিটেনের নিকোলাস রোয়েগের দৃশ্যসজ্জায় যা অন্যভাবে প্রতিফলিত। "Of all major contemporary European film makers, Herzog is most willing to allow his images to stand uninterrogated; to allow them, and the carefully selected music he insinuates under them, to generate—amazement, promote reverie, and frustrate analysis. His films, like his characters, are without shadows and, like the landscape of 'Fata Morgana' without deeper meaning. His images are astounding, but his discourse it attenuated. The films are more incantations than narratives."[১৫]

ক্যামেরা স্টাইলের বৈচিত্র্যে জার্মানীর উইম ওয়েণ্ডার ষাট দশকের চলচ্চিত্রায়ণ রীতির এক ব্যতিক্রমী নাম। তাঁর রীতি গোদারের সিনে-টেকনিকের অনুসারী, কাহিনীগত ঘটনাসংস্থান থেকে দর্শকদের বিচ্ছিন্ন বা দূরে সরিয়ে রাখার ব্যাপারে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন না, কিন্তু ছবির চরিত্রদের প্রতি তাঁর মমত্ব নিবিড় হয়ে থাকে। তাঁর ছবির চরিত্রেরা সব সময়েই এমন সব জিনিসপত্রের দ্বারা পরিবৃত থাকে যা সহজেই তাদের জীবিকা ও মানসিক পর্যায়টিকে ফুটিয়ে তোলে।

ইওরোপীয় চলচ্চিত্রে ক্যামেরা স্টাইলে যিনি আধুনিককালে অনন্য রীতির প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি হলেন হাঙ্গেরীয় চিত্রপরিচালক মিক্‌লোস ইয়ানচো। ইয়ানচো বিশেষ অর্থেই দায়বদ্ধ বিপ্লবী চলচ্চিত্রকার। তাঁর ছবির বিষয়বস্তুতে বিপ্লব পর্ব ও বিপ্লব পরবর্তী হাঙ্গেরীর বিশেষ বিশেষ পর্বের ঘটনাক্রম চিত্রিত হয়। এই ঘটনাচিত্রণে তিনি মন্তাজ রীতি পরিহার করেন, ছবির দৃশ্যের কাটিং ব্যবহৃত হয় তখনই যখন তা ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনে একান্ত অপরিহার্য হ'য়ে ওঠে, যখন অন্য দৃশ্যে পরিচালক যেতে চান কিংবা ক্যামেরায় নোতুন ফিল্মের রীল ভরার প্রয়োজন হয়। তাঁর কাছে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া হ'ল অত্যন্ত প্রবহমান রীতি এবং ছবির ফ্রেমে তাকে সেই ভাবেই বিধৃত করতে হয়। দৃশ্যক্রমের মধ্যে একাধিক শটের সংঘাত সৃষ্টি না করে তিনি দৃশ্যক্রমকে এক

নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবহমান গতিময়তায় রূপ দেন। তারই মধ্যে সুচিন্তিত কোরিওগ্রাফিসুলভ ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় ছবির চরিত্রেরা ব্যালে নৃত্যের ছন্দভঙ্গিমায় ছবির ঘটনা ও সংলাপকে মূর্ত করে তোলে। এদিক থেকে ইয়ানচো ইওরোপীয় চলচ্চিত্রভাষায় আইজেনষ্টাইনের বিপরীত আঙ্গিকের প্রবর্তক। ইয়ানচোর দীর্ঘ সময়ের এক একটি দৃশ্যে রৌদ্রকরোজ্জ্বল বিস্তীর্ণ মাঠ, দলবদ্ধ মানুষের অবিরাম গতি, হতাশা ও নিষ্ঠুরতা, জয় ও বিজয়ের উদ্‌যাপন পর্ব বর্ণময় হয়ে ওঠে। ইওরোপীয় তথা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে তাঁর মতো এত দীর্ঘ সময়ের এক একটি দৃশ্য আর কেউ ক্যামেরায় ধরেন না। তাঁর ছবির এই রীতি চলচ্চিত্রের পর্দায় এক অনবদ্য ছন্দ সৃষ্টি করে যা তাঁর পূর্বাপর কোনো চিত্রপরিচালকের মধ্যে নেই। সাধারণতঃ সিনেমায় দৃশ্য বিন্যাসে একটি গোটা ছবি জুড়ে ৫০০ থেকে ১০০০ খণ্ড খণ্ড শট থাকে। সেক্ষেত্রে ইয়ানচোর এক একটি দৃশ্যক্রমের স্থিতিকাল (duration) কাট ব্যবহার না করে নিরবচ্ছিন্নভাবে কমপক্ষে ১০ মিনিট ধরে সিনেমার পর্দায় বিরাজ করে। তাঁর সব ছবিই ১০ থেকে ১৩টি দৃশ্য পর্যায়ে বিভক্ত থাকে। এ এক আশ্চর্য ক্যামেরা গতি। সিনেমার স্টাইল গড়ে ওঠার নেপথ্যে নানা প্রযুক্তিগত বিবর্তনের একটা বড় ভূমিকা অনস্বীকার্য। গত ষাট বছরে নানা শ্রেণীর চলচ্চিত্রোপযোগী ক্যামেরার উদ্ভাবন ও গভীরতর লেন্সের বিবর্তনে ইওরোপীয় চলচ্চিত্রকারেরা ছবির বিষয় বিন্যাসে ক্যামেরার বিবিধ উপকরণ ও বিবর্তনশীল পদ্ধতিকে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করেছেন। তাঁদের একান্ত প্রয়াসে ইওরোপীয় সিনেমার চলচ্চিত্ররীতি নোতুন সংজ্ঞায় চিহ্নিত হয়েছে। পাশাপাশি ছবির জন্য ব্যবহৃত কাঁচা ফিল্মের তারতম্যও চলচ্চিত্রে ফোটোগ্রাফির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনে প্রভাবশীল হয়েছে। রোজালিনী তাঁর নিজের ছবির জন্য Pancinor লেন্সের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করেছিলেন। ১৯৬০-এর শেষ দিকে তিনি এই লেন্সের আরো খানিকটা উন্নতি ঘটিয়েছিলেন যাতে প্যানিং ও জুমিংয়ের ফল পাওয়া যায় একই সঙ্গে। রোজালিনী ফরাসী টেলিভিশনের জন্য একটি ছবি করেন The Rise of Louise XIV, যেখানে এই নোতুন ধরনের Moving lens-এ চিত্রগ্রহণ করেন। অন্য আর একটি ক্যামেরা কৌশল 'Sequence shot' যা বাস্তবকে আরো গোচরীভূত করে, তার উদ্ভব ঘটেছিল ফরাসী Plan-Sequence থেকে। অর্থাৎ একক একটি দৃশ্য—স্থির কিংবা সচল। ইটালীয়ান চিহ্নবিজ্ঞানী (Semiotician) গিয়ান ফ্রাঙ্কো বেত্তেতিনি এর কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর মতে এই কৌশল কৃত্রিম শিল্প প্রকরণে পরিচালককে, ছবির বিন্যাস রীতির ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে বিচরণের সুযোগ দেয়, অথচ যেখানে দীর্ঘ সময়ের তথ্যচিত্রসুলভ বৈশিষ্ট্য হারায় না। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গোদার, আন্তনিওনি, ফ্রান্সিস্‌কো রোসি, জোসেফ লোসে, বার্তোলুচি প্রমুখের 'সিকোয়েন্স শট' কোনোভাবেই দৃশ্যকল্পের প্রতিরূপ ক্ষমতাকে তার দৃষ্টিকোণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় না।

'কাইয়ে দ্যু সিনেমা' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে জাঁ লুই কোমোল্লির প্রশ্নের উত্তরে এরিক রোমার সুন্দর মন্তব্য করেছিলেন—"The greatest danger to the cinema is the pride of the filmmaker who says : I have a style, and I want to draw people's attention to it."[১৬] আসলে চলচ্চিত্র স্টাইলের বিবর্তন, যা মূলতঃ ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ নির্বাচন ও গতিময়তায় গড়ে ওঠে, তা হ'ল সিনেমা মাধ্যমের টেক্‌নিকগুলোর সুসম্বদ্ধ ও বৈশিষ্ট্যমূলক ব্যবহার। মনে রাখা দরকার যে, সিনেম্যাটিক উপকরণ যেমন ক্লোজআপ, দৃষ্টিকোণ, বস্তুর প্রত্যক্ষতা সব সময়েই চলচ্চিত্রে বিদ্যমান ছিল, কেবল তার নানা রকমের প্রকরণগত ব্যবহারের রীতি যুগ থেকে যুগে পাল্টেছে। আর তার থেকেই এক একটা স্বতন্ত্র স্টাইলের জন্ম। হলিউডের নির্বাক ছবি ছিল গতিসম্পৃক্ত ছবি, সে সব ছবিতে দৃশ্যের গতিই সময়কে চিহ্নিত করত, বিপরীতে

চল্লিশ দশকের নিওরিয়ালিস্ট ছবি ও অন্যান্য ইওরোপীয় ছবিতে সময়ই গতির ব্যঞ্জনা দিয়েছে। নানা দেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল স্টাইল বিবর্তনে রসদ জুগিয়েছে। এক্ষেত্রে স্টাইলগত ও আঙ্গিকগত সমস্যা নানা প্রদেশের সাংস্কৃতিক ও ভাবাদর্শের পারস্পরিক আদান প্রদানে নিজের পথ বেছে নিয়েছে। ডীপ ফোকাস ও তদানুষঙ্গিক প্রকরণ এবং সম্পাদনা মার্কিন ও ইওরোপীয় উভয় দেশের চলচ্চিত্রে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচ্য ছিল, কেবল তার ধারণা বিবর্তিত হয়েছে।

মার্কিন ও ইওরোপীয় চলচ্চিত্রে পরিচালকের পাশাপাশি ক্যামেরাম্যানের কৃতিত্বকেও গভীর মূল্য দেওয়া হয়। ছবির পরিচয় লিপিতে ‘ডিরেক্টর অফ ফোটোগ্রাফি’ শিরোনামে ক্যামেরাম্যানের দায়িত্ব ও শিল্পনৈপুণ্য সেখানে আলাদা মর্যাদায় চিহ্নিত। চলচ্চিত্র ক্যামেরার নান্দনিক বিবর্তনে তাই ছবির পরিচালকের মতোই বহু ক্যামেরাম্যানের অবদান স্বীকৃত হয়েছে। একটি ছবির ক্যামেরা স্টাইলে পরিচালকের সঙ্গে যুগপৎভাবে ক্যামেরাম্যানও স্বকীয় শিল্প অনুধ্যান মেলে ধরেন। আন্তর্জাতিক সিনেমার এমন বেশকিছু ক্যামেরাম্যান তাঁদের চিত্রগ্রহণের দক্ষতায় আমাদের কাছে স্মরণীয় হ'য়ে আছেন। রুশ চলচ্চিত্রকার আইজেনস্টাইনের আলোকচিত্রী এডওয়ার্ড টিসে, ক্রুফোর ক্যামেরাম্যান নেস্টর এ্যালমেনড্রেস, বার্গম্যানের ক্যামেরাম্যান গুণার ফিশার ও স্ভেন নিক্ভিস্ট, ভিসকন্তির রঙীন ছবির ক্যামেরাম্যান পি. ডি. স্যান্টিস, গোদারের ক্যামেরাম্যান রাউল কুতার, মার্কিন সিনেমার জেমস ওয়াং হো, গ্রেগ টোল্যাণ্ড প্রমুখের অসংখ্য ক্যামেরা নিদর্শন, আলোর অভিনব বিন্যাস, গভীরতা ও মায়ামুগ্ধতায় ছবির স্বকীয় স্টাইলকে আমাদের দৃষ্টির কাছে নোতুন চেতনায় প্রতিভাত করেছে। একটি ছবির ফ্রেম নির্বাচন, দৃষ্টিকোণের পারম্পর্য, গতিময়তা সহ ছবির mise-en-scene অর্থাৎ সার্বিক মুড তৈরি করতে তাঁদেব শিল্পবোধ, পরাদৃষ্টি এবং সিনেম্যাটিক দক্ষতা পরিচালকের প্রাতিস্বিকতা প্রতিপাদনে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে।

বার্গম্যানের সাদা কালোয় তোলা ছবি ‘স্মাইলস্ অফ এ সামার নাইট’, ‘দ্য সেভেন্থ সীল’, ‘ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীজ’ ছবির টোনাল টেক্সচার, বিন্যাস, দৃশ্যগঠনের গভীরতা যেমন গুণার ফিশারের ক্যামেরা আঙ্গিকে এক রূপ নেয়, তেমনি বার্গম্যানের ‘দ্য সাইলেন্স’ (সাদাকালো), ‘ভার্জিন স্প্রিং’ (সাদাকালো) এবং রঙে তৈরি ‘অটাম সোনাটা’, ‘ক্রাইজ এ্যাণ্ড হুইসপার’, ‘ফ্যানি এ্যাণ্ড আলেকজান্দার’ ইত্যাদি ছবির আলোক নিয়ন্ত্রণ, দৃশ্যক্রমের গভীরতা তথা সামগ্রিক কম্পোজিশনে নিক্ভিস্টের আবেগময় মুড, ব্যাকগ্রাউণ্ড ও ফোরগ্রাউণ্ডের পারম্পর্য, অমোঘ Close-up-এর অভিঘাত, রঙের সংবেদনশীলতা নিক্ভিস্টকে বিরল ক্যামেরাম্যান হিসেবে চিহ্নিত করেছে। একই পরিচালকের সঙ্গে কাজ করলেও দুই আলোকচিত্রীর তৈরি দৃশ্যসজ্জার মুড ও গঠনশৈলী কতো ভিন্ন মেজাজ বহন করছে। বার্গম্যানের ‘ক্রাইজ এ্যাণ্ড হুইসপার’ ছবিতে ব্যবহৃত রঙের সুষমতা, ব্যঞ্জনা ও আলোকনিয়ন্ত্রণের বিস্ময়কর নৈপুণ্যে নিক্ভিস্টের দক্ষতা পরিচালককে ছবির গূঢ়ার্থ প্রতিপাদনে অনেকটা সমর্থ করেছে। রেমব্রান্টের পেন্টিংসুলভ আলো আঁধারির ঈর্ষণীয় ভারসাম্যতায় তৈরি দৃশ্যকল্পে বার্গম্যান ফ্রেমের আঁধারকেও আলোর অধিক গভীরতা দিতে পেরেছেন। এখানেই ক্যামেরা স্টাইলের সার্থকতা যুগপৎ পরিচালক ও আলোকচিত্রীর ঘনিষ্ঠ বোঝাপড়ায় মহৎ শিল্পে উত্তীর্ণ হয়েছে। ১৯৭১-এ তৈরি ভিস্কন্তির ‘ডেথ ইন ভেনিস’ ছবিতে Zoom lens-এর ব্যবহার অমোঘতা পেয়েছে। ছবির কাহিনীকেন্দ্রিক বিষণ্ণতা, আসন্ন মৃত্যুর দিকে অপ্রতিরোধ্য তাড়নায় ছবির নায়কের ভ্রাম্যমাণতাকে মহামারী আক্রান্ত শহরের বীভৎসতা ও কারুণ্যের প্রেক্ষাপটে চিত্রিত করেছেন পরিচালক জুম-এর অনবদ্য ব্যঞ্জনাময়

প্রয়োগে—"to a series of zoom shots among decaying characters and situations, zooms that neither select nor reveal, but only pile on non-signifying details in operatic proportions."[১৭] এর ভেতর দিয়েই বেরিয়ে আসে ভিসকন্তির দেখা ও দেখানোর শিল্পপ্রবণতা, তাঁর স্টাইল, যা ক্যামেরাম্যানের অন্তরঙ্গ সাহচর্যে শিল্পরূপ পায়।

একালের আন্তর্জাতিক সিনেমার প্রথম সারির ক্যামেরাম্যান নেস্টর এ্যালমেনড্রস সিনেমার অধীত শিক্ষা ও তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেছেন চমৎকারভাবে। "We learn about eras before the twentieth century through painting, that is, through colours. We know the first third of this century through black and white cinema more than anything else. I admit I have a conditioned reflex. As a spectator of director of photography, I 'see' periods before our own in colour. However, in the case of the film that reconstructs the decade of twenties, thirties or forties, I feel that colour is an anachronism."[১৮] প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যেতে পারে যে, রেনোয়াও জানিয়েছিলেন—বিশ্বচলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মগুলো তৈরি হয়েছিল সাদাকালোর প্যানক্রোমাটিক ফিল্মে। আসলে সাদা কালোয় তৈরি ছবি সিনেমার মানচিত্র থেকে এখন নির্বাসিত-প্রায়। কুরোসাওয়া, ওয়াইলার, হিচকক, ড্রেয়ার, ওরসন ওয়েলস্, আন্তনিওনি, বার্গম্যান, নিওরিয়ালিস্ট যুগের সহজ অথচ গভীর হৃদয়গ্রাহী সাদাকালোয় তৈরি একাধিক ছবির বিস্ময়কর চিত্রবিন্যাস আমাদের আজও মুগ্ধ করে। রঙের আবির্ভাব, রঙীন ফিল্মের নিত্যনোতুন আবিষ্কার, চল্লিশ দশকের টেকনিকালার থেকে ১৯৪৯-এর ইস্টম্যানকালার নেগেটিভের প্রচলন, নানা ক্ষমতা সম্পন্ন ফিলটার ইত্যাদি বিভিন্ন রূপান্তরে জাত রঙীন ফোটোগ্রাফি আধুনিক চলচ্চিত্রে নোতুন ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়েছে। পুরোনো কালের পরিচালক এবং একালের আধুনিক চলচ্চিত্রকারেরা রঙীন আলোকচিত্রের মায়ায় তাঁদের উৎকৃষ্ট কিছু শিল্প ফসল উপহার দিয়েছেন। যেটা মনে রাখা দরকার সেটা হ'ল, ছবির ফ্রেম নির্বাচনে, স্থান ও কালের বস্তুতান্ত্রিকতা ও মন্ময় বাস্তবতা প্রকৃত সত্যে অবলোকন করার ক্ষেত্রে সেই মানুষটির দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন, যিনি ক্যামেরার লেন্সের মাধ্যমে ফ্রেম, দৃশ্যক্রম, গতিময়তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে দেখবেন ও আবিষ্কার করবেন।

এটা লক্ষণীয় যে, গত চল্লিশ বছরে ক্যামেরার যান্ত্রিক পদ্ধতির খুব একটা রূপান্তর হয়নি। কেবল বিগত যুগের ক্যামেরার তুলনায় একালের ক্যামেরা অনেক হাল্কা এবং বহনযোগ্য হয়ে উঠেছে। যার ফলে হ্যাণ্ড হেল্ড ক্যামেরার সহজ স্বচ্ছন্দ ব্যবহার ইওরোপীয় ছবির নান্দনিক রীতিতে অন্য এক মাত্রা দিয়েছে। যতটুকু নবরূপায়ণ ঘটেছে, তা সাধিত হয়েছে লেন্সের ক্ষেত্রে। আজকের আধুনিক সিনেমায় ব্যবহৃত অতি উজ্জ্বল ও অতি সংবেদনশীল লেন্সের তারতম্যই ছবির দৃষ্টিকোণ কেন্দ্রিক শৈলীর সূত্রপাত ঘটিয়েছে। নেস্টর এ্যালমেনড্রস ফরাসী সিনেমার দৃশ্যের উজ্জ্বলতা গড়ে তুলতে আয়নার ব্যবহার প্রথম প্রচলন করেন। এটা রাউল কুতারের 'ফোটোফ্লাড প্রথা'র সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। কুতার সিলিংয়ের ওপর থেকে ফ্লাড লাইট ঝুলিয়ে রেখে দৃশ্যের আলোক নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষপাতী ছিলেন যেখানে আলো বিচ্ছুরিত হলেও কোনো প্রতিচ্ছায়া থাকবে না। সৃজনশীল চলচ্চিত্রকারের পর্যবেক্ষণ রীতিকে সুষম ভঙ্গিতে ছবির ফ্রেম রূপায়িত করার ক্ষেত্রে ক্যামেরাম্যানকেও অনেকক্ষেত্রে নোতুন উদ্ভাবনের পথে যেতে হয়। ক্যামেরাম্যানের তন্নিষ্ঠ বোধ ও শিল্প এষণা সেক্ষেত্রে স্রষ্টার স্টাইলকে আরো বিশিষ্ট করে তোলে। এ্যালমেনড্রস ত্রুফোর সঙ্গে কাজ করার প্রসঙ্গে লিখেছেন—"Truffaut's 'calligraphic' work, which Adele H, The Green Room and Last Metro continued. This elaborated,

stylized film making allowed me to introduce refinements of lighting and framing that I had never used before."[১৯] ক্রুফোর 'Two English Girls' ছবিতেও অনুরূপভাবে এ্যালমেনড্রস পীরিয়ড লাইটিংয়ের প্রতিভাস গড়ে তোলার জন্য প্রথম অয়েল ল্যাম্পের আলোর সাহায্য নিয়েছিলেন।

স্ট্যানলি কুব্রিক ১৯৭৫ সালে যখন থ্যাকারের উপন্যাস নিয়ে তাঁর 'ব্যারী লিণ্ডন' ছবি তোলেন, তখন তিনি পীরিয়ড পীস নির্মাণের স্বার্থে দৃশ্যগত আলোর জন্য একই ধরনের পরীক্ষা চালিয়েছিলেন এবং চূড়ান্তভাবে সফল হয়েছিলেন। কাহিনীকেন্দ্রিক আঠারো শতকের পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য তিনি ছবির অন্তর্দৃশ্য গ্রহণে আঠারো শতকের মোমবাতিদানের আলোর ব্যবহার করেছিলেন। সেইসঙ্গে ছবির আলোকনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ লেন্সের প্রয়োজন হয়েছিল। এক্ষেত্রে Zeiss Company নাসার মহাকাশ ফোটোগ্রাফির জন্য ব্যবহৃত লেন্সের আরো উন্নয়ন ঘটিয়েছিল যা ছবিতে চূড়ান্ত সাফল্যে কাজে লাগানো হয়। এই লেন্সটির অনুপাত ছিল f0.9, যেক্ষেত্রে সিনেমায় সাধারণভাবে গভীরতম লেন্সের অনুপাত হ'ল f1.25; কুব্রিকের এই নাসা লেন্স প্রায় সাধারণ f1.2 লেন্সের আলোকধারণের চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ আলোকধারণের ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল।

যেকালে আধুনিক সিনেমায় ফোকাল লেংথ্ অনুসারে ৩৫ থেকে ৫০-এর সাধারণ 'নর্মাল লেন্স' থেকে শুরু করে ১৮ ও ২৫-এর ওয়াইড এ্যাঙ্গেল লেন্স, ১০০, ১৫০ মিলি মিটার ছাড়িয়ে ১০০০ মিলি মিটারের টেলিফোটো লেন্সের আশ্চর্য ব্যবহার ঘটেছে, সেখানে বিশ্বের অন্যতম পরিচালক রোবের ব্রেসঁ তাঁর ছবির ঘটনাক্রম ও স্থানকালের পারম্পর্য তুলে ধরার জন্য প্রায় ক্ষেত্রেই গ্রহণ করেন তাঁর প্রিয় ৫০ মিলি মিটারের লেন্স। তাতেই তাঁর ছবির প্রার্থিত শিল্পরূপ গড়ে ওঠে। সিনেমার জন্মলগ্ন থেকে ৩৫ মিলি মিটারের ফিল্মই প্রচলিত মাপ ছিল। পঞ্চাশ দশকের শেষে আবির্ভূত হয় ৭০ মিলি মিটারের ফিল্ম ফরম্যাট। South Pacific, Cleopetra, Lawrance of Arabia, DR Zivago, Gran Prix, 2001 : A Space Odyssey-র মতো বিপুল জনপ্রিয় ছবির বর্ণাঢ্যতায় এই ফরম্যাট বাণিজ্যিকভাবে বহুল প্রচলিত। এখন আবার এর থেকেও আরো ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসারিত মাপের Imax ফিল্ম ফরম্যাট এসে গেছে। এর আগে চলচ্চিত্রের ক্যামেরা টেকনিকের প্রাথমিক উপাদান হিসেবে সিনেমাস্কোপের প্রচলন হয়েছিল। এখানে তদনুযায়ী লেন্সও তৈরি করতে হয়েছিল। এই রীতির মধ্যে খানিকটা খোলামেলা মুক্ত শিল্প স্বভাব ছিল। ওয়েলস্, ওয়াইলার, আন্তনিওনির মতো চলচ্চিত্রস্রষ্টারা এই রীতির প্রতীক্ষায় ছিলেন। আন্তনিওনি তাঁর Le Amiche ছবিতে চওড়া পর্দার অনুযায়ী দৃশ্যগ্রহণের ব্যাপকতায়, দীর্ঘ সময়ের ট্রাকিং শটে পরিবেশ ও চরিত্রদের অবস্থানকে আরো সম্পৃক্ত করে তোলেন। 'লাভেন্তুরা' ছবির চওড়া পর্দাও তাঁকে হতাশা, বিচ্ছিন্নতা ও পরিবেশের মুডকে বিষয় অনুযায়ী আরো অব্যর্থ দৃশ্যময়তায় উপনীত হবার সুযোগ দেয়। সিনেমাস্কোপ আধুনিক ইওরোপীয় চলচ্চিত্রকারদের কাছে দৃশ্যগ্রাহ্যতার নিরিখে আরো এক মাত্রা যোগ করে। সিনেমাস্কোপের পর্দায় পরিচালক তাঁর দরকার মতো, বিষয়ানুগ দ্রুত এবং ক্রস কাটিং, এমনকি বড় ক্লোজ-আপের ব্যবহারও শৃংখলার সঙ্গে করতে পারেন। এর নিদর্শন ক্রুফো, রোসি, আন্তনিওনি প্রমুখের ছবিতে ছড়িয়ে আছে।

আদিতে চলচ্চিত্রের পর্দার অনুপাত ছিল ১ : ১.৩৩। পৃথিবীর বহু অসাধারণ ছবি এই ফরম্যাট অনুযায়ী তৈরি হয়েছিল। পরে লেন্সের ও ফিল্মের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পর্দাও ক্রমপ্রসারিত হ'তে থাকে। পরে পর্দার অনুপাত হয় ১ : ১.৮৫ ফরম্যাটের, যা সিনেমাস্কোপ

ও ১ : ১.৬৬ ফরম্যাটের মধ্যবর্তী একটা অনুপাত। মার্কিন মুলুকে এটা বহুল প্রচলিত।

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি, চলচ্চিত্রের প্রথম তাত্ত্বিকদের মধ্যে ভ্যাকেল লিণ্ডসের ব্যাখ্যা ও দার্শনিক হুগো মুন্সটারবার্গের আলোচনায় শিল্প হিসেবে সিনেমাকে চিহ্নিত করার প্রাথমিক প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। সেই থেকে শুরু করে ষাট দশকের শেষ পর্বে প্রকাশিত খ্রীশ্চিয়ান মেজের সিনেমার গঠনতান্ত্রিক তাত্ত্বিক আলোচনা ও একালের অন্যতম চিহ্নবিজ্ঞানী উমবার্তো ইকোর আধুনিক বিশ্লেষণ চলচ্চিত্রের বিন্যাস রীতি, প্রকরণ ও দৃশ্য নির্মিতির সার্বিক স্টাইলের নানা রন্ধ্রে ছায়া ফেলেছে। তারই মধ্যবর্তী সময়ে নানা পর্বে এসেছে কুলেশভ, আইজেনষ্টাইন, পুদভ্কিন, বেলা বালাজ, আর্নহাইম, আন্দ্রে বাজাঁ প্রমুখ প্রবাদপ্রতিম শিল্পতাত্ত্বিকদের চলচ্চিত্র নন্দন ব্যাখ্যার বিপুল সম্ভার। স্বকীয় ভাষা ও ব্যাকরণে গভীর সম্পৃক্ত হ'য়ে চলচ্চিত্র আধুনিক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশক্তিশালী শিল্প মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। তারই পাশে গত আশি বছরে এক্সপ্রেসনিজম, সিনেমা ভেরিতে, নিওরিয়ালিজম, পরাবাস্তবতা, মন্তাজ প্রক্রিয়া, ডাইরেক্ট সিনেমা, ফ্রী সিনেমা, নবতরঙ্গ, সিনেমা নোভো ইত্যাদি নানা অভিধা ও ব্যঞ্জনায় চলচ্চিত্রের শরীর ও আত্মার মূর্ত ও বিমূর্ত রূপ আমরা দেখেছি।

এক প্রজন্মের শিল্পী পূর্বতন যুগের স্রষ্টার অভিজ্ঞানকে নিজের অভিজ্ঞতা ও প্রায়োগিক দক্ষতায় নোতুন করে পরখ করতে চেয়েছেন। তেমনি প্রবহমান পরবর্তী সময়ের আধুনিক স্রষ্টারাও তাবৎ অতীতের শিল্পবিন্যাস-লব্ধ চেতনায় আজকের সময়টাকে তাঁদের শিল্পনির্মিতিতে ধরার নিরন্তর চেষ্টা করেছেন। স্টাইল তাই যুগ থেকে যুগে বিবর্তনশীল। বিভিন্ন দেশের স্টাইলের ক্ষেত্রে যেমন সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি প্রভাব ফেলেছে তেমনি দেশজ রাজনৈতিক আবর্ত ও আন্তর্জাতিক শিল্পমননও স্টাইল পরিবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। কেবল দৃষ্টিনন্দন উপভোগের মানদণ্ডে নয়, চলচ্চিত্রের প্রসারিত পর্দায় ক্যামেরা মানুষের হৃদয় ও মানস, চিন্তাচেতনা ও সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক স্তরের গভীরে ডুব দিয়ে এক একটি মূল্যবান হীরকখণ্ড আহরণ করে আনছে। শিল্পীর প্রাতিস্বিকতার স্বাতন্ত্র্যে সেখানে আপন স্বভাবেই গড়ে উঠেছে নবনব স্টাইল। হলিউডী সিনেমার প্রবণতা ও অভিপ্রায় থেকে মৌলিক ভিন্নতাতেই গড়ে উঠেছিল ইওরোপীয় চলচ্চিত্রের অভিনব শিল্প আঙ্গিক, যাকে আমরা বলতে পারি—ক্যামেরার দিব্যদৃষ্টি। চলচ্চিত্রের বিবিধ উপকরণ ও প্রয়োগ কৌশলকে অবজ্ঞা না করেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, চলচ্চিত্র শিল্পের প্রধান ও সর্বব্যাপী হাতিয়ার হ'ল ক্যামেরা। ক্যামেরার চলনভঙ্গিই এক একজন চলচ্চিত্র স্রষ্টার স্টাইলের ইঙ্গিতবাহী হ'য়ে ওঠে। সিনে দর্শকের অভ্যস্ত চোখ সঠিকভাবে চিনে নেয় ছবির জনককে। ফ্রান্সের 'অথর থিয়োরী'র সূচনাই হয়েছিল সেই দার্শনিক ভাষ্য থেকে। পশ্চিমী ফিল্ম কালচারে হলিউডের দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর বিপুল আধিপত্যের সমান্তরালে ইওরোপীয় সিনেমার নব্য রীতির ক্যামেরা আঙ্গিক চলচ্চিত্রের দৃষ্টিগ্রাহ্য নন্দনে নোতুন ভাষ্য রচনা করেছিল। নিজের ছবির ক্যামেরাম্যানের লেখা গ্রন্থের ভূমিকায় ত্রুফো শ্রদ্ধা সহকারে সিনেমার স্টাইল গঠনে আলোকচিত্রীদের অবদান স্মরণ করেছিলেন। তাঁর মতে ক্যামেরাম্যানই জানেন—"How to prevent ugliness on the screen. How to purify the image in order to increase its emotional force. How to render plausibly stories that take place before the twentieth century. How to reconcile elements both natural and artificial, timeless and dated, in the same frame. How to give homogeneity to disparate material. How to struggle against the sun, or bend to its will. How to interpret the desires of

a director who knows exactly what he does not want but can't explain what he does want."[২০] চলচ্চিত্র পরিচালকের ইত্যাকার সব চাওয়াকে ও অপূর্ণতাকে পরিপূর্ণতা দেন একজন সুযোগ্য ক্যামেরাম্যান। আর ইওরোপীয় চলচ্চিত্র ভিস্যুয়ালের নান্দনিক পরিকাঠামোয় পরিচালক ও ক্যামেরাম্যানের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতাই সেখানকার চলচ্চিত্রের স্বাতন্ত্র্য উজ্জ্বলতর করেছে।

উল্লেখপঞ্জী :—

১. Andre Bazin—What is Cinema–Les Edition du Cerf, 1958–VOL-I Page – 15

২. Siegfried Kracaur—Theory of Film—Oxford University Press–New York–1965–Page–IX

৩. Andre Bazin—What is Cinema—VOL-I Page –18

৪. Realism in Cinema : A Reader (Edited Christopher Williams/Routledge & Kegan Paul) London, 1980–Page–71-7?

৫. Nestor Almendros—A Man with a Camera (Faber & Faber) London, 1980/Page–4

৬. Henri Langlois—Translated by Tom Milne–Reprint in Cinema : A Critical Dictionary (Edited : Richard Roud) The Viking Press/N. York, 1980/VOL-1 Page–428-429

৭. A Thesis on Neo-Realism : in Overbey, Springtime, Page–69 Quoted in 'The Altering Eye'–Robert Phillip Kolker (Oxford University Press/1983/Page–26)

৮. The Altering Eye : Robert Phillip Kolker Page–33

৯. The Haunted Screen—Lotte Eisner (Barkley and Los Angeles : University of California Press. 1973/Page–151)

১০. Jean Renoir—Andre Bazin–Translated by W. W. Halsey II and William H Simon (N. York, Simor & Schuster 1973/Page–87)

১১. Quoted in 'Dictionary of Films'—Translated and Edited by Peter Morris (Barkley & Los Angeles, University of California Press, 1972) Page–379-380

১২. The Philosophical Basis of Neo-Realism—Felix A—Morlion Overbey, Springtime, Page–121 (Quoted in 'The Altering Eye'–Robert Phillip Kolker–Page–45)

১৩. Godard on Godard : Edited Jean Narboni & Tom Milne, Translated by Tom Milne (N. York : Viking Press/1972) Page–146-147

১৪. The Birth of a New Avant-Garde · La Camera Stylo published in 'The New Movie'—Edited by Peter Graham (Garden City/N. York, Doubleday, 1968)–Page–22

১৫. The Altering Eye : Robert Phillip Kolker—Page–265

১৬. Quoted in 'The Altering Eye'—Page-250

১৭. The Altering Eye—Page–81

১৮. Nestor Almendros—A Man with a Camera. (Faber & Faber; 1980) Page–15

১৯. Ibid—Page–104

২০. Francois Truffaut—'The tights of Nestor Almendros' in 'A Man with a Camera'—Nestor Almendros (Faber & Faber, London, 1980)–Page–VI.

ভারতীয় সিনেমায় সিনেমাটোগ্রাফি—একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

গোবিন্দ নিহালনী

উনিশ শতকের শেষ ভাগে পাশ্চাত্যে সিনেমার উদ্ভব হয়েছিল আমাদের দর্শনশক্তির বিশেষ একটা ক্ষমতা, পারসিস্টেন্স অব ভিশন বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে। ইউরোপ ও আমেরিকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতির দরুন এই কলাকৌশলগত আবিষ্কার কিছুদিনের মধ্যেই এক চিত্তাকর্ষক শিল্পমাধ্যমের রূপ পেল। সিনেমার বিকাশ হয়েছিল মূলত একটা চাক্ষুষ মাধ্যম বা দৃশ্যশিল্প রূপে। তাই আদি সিনেমার চিত্রগত নান্দনিকতার মূল উৎস ছিল য়ুরোপিআন দৃশ্যশিল্পের ঐতিহ্য। চিত্রকলার রেনেসাঁসীয় ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল সিনেমার দৃশ্যগত পরিপ্রেক্ষিত, আলোকসম্পাত ও কম্পোজিশনের বিভিন্ন উপাদান। নির্বাক যুগের ছবিতে, বিশেষত য়ুরোপিআন ছবিতে, প্রভাব পড়েছিল এক্সপ্রেশনিস্ট আলোকচিত্র ও চিত্রকলায় সংঘটিত বিভিন্ন আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষারও।

ইউরোপে বিনোদনের মাধ্যম হিশেবে জন্মলাভ করার কয়েক বছরের মধ্যেই সিনেমার পদার্পণ ঘটল ভারতে। দর্শক হলে গিয়ে পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে সিনেমা দেখতে শুরু করল। যদিও ভারতের প্রারম্ভিক চলচ্চিত্রকাররা গল্পাংশ ও কাহিনী বাছতেন ভারতীয় পুরাণ, ইতিহাস ও লোকসাহিত্য থেকে, তবু এই সব ছবির কাহিনী-বর্ণন-রীতি এবং চিত্রগত প্রতিন্যাস ছিল ইউরোপ ও আমেরিকায় অনুসৃত রীতিনীতির অনুরূপ। এই প্রবণতার আজও, মোটের উপর, তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি।

সারা পৃথিবী জুড়েই মুভি ফোটোগ্রাফির নান্দনিকতার ওপর প্রাযুক্তিক সমৃদ্ধির গভীর প্রভাব পড়েছে। ভারতও এর কোনো ব্যতিক্রম নয়। উনিশ শতকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত ভারতীয় চিত্রকলার ঐতিহ্য ছিল মিনিয়েচার-এর ঐতিহ্য। এই চিত্রকলার শৈলী ছিল ঘাতহীন সমতল আলোকসম্পাত এবং সম্পূর্ণ-বাস্তববাদী-নয় এমন এক পরিপ্রেক্ষিত নির্ভর। কিন্তু য়ুরোপিয় ক্যামেরাম্যানরা, যাদের দৃশ্যচেতনা গড়ে উঠেছিল ভের্মিয়ে, গোয়া ও রেমব্রাঁ-র মতো শিল্পীদের শিল্পকর্ম থেকে, চিত্রপ্রতিমা গড়তেন আলো-ছায়ার এবং ঔজ্জ্বল্য-অনৌজ্জ্বল্যের স্থানিক বিন্যাস ও বিভাজনের ভিত্তিতে।

আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে কলাকৌশলগত নানান উন্নতির ফলে স্বাভাবিক আলোয় তোলা চিত্রপ্রতিমার দেখা মিলল, এমন চিত্রপ্রতিমা যা দেখতে 'আসল'-এর মতো। চলচ্চিত্রগ্রাহকরাও তাঁদের চিত্রপ্রতিমায় 'বাস্তবতার'-সঙ্গে-সাদৃশ্যের এই ধারণা সঞ্চারিত করতে চাইলেন। যে-কাজে আলোকসম্পাত একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। যদিও বাস্তবতা সঞ্চারের এই চেষ্টা

সহজে সফল হয়নি। বহু বছরের চেষ্টায় ফিল্ম নেগেটিভের দ্রুতি ও কণাময়তার ক্ষেত্রে যখন যথেষ্ট উন্নতি ঘটল একমাত্র তখনই চলচ্চিত্রপ্রতিমা বাস্তববাদী বা স্বাভাবিকবাদী হয়ে উঠল। কিন্তু তার আগে, বিশেষত আমেরিকায়, একটি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার ঘটেছিল। ফিল্ম নেগেটিভের নিম্ন দ্রুতির দরুন ছবি তোলার জন্য অতি উজ্জ্বল ল্যাম্প ব্যবহার করার প্রয়োজন হত, এই ল্যাম্পে 'ফ্রেস্ন্যাল' লেন্স লাগানো থাকত এবং সেটে ঘন গাঢ় ছায়া পড়ত। শাদা-কালো ফিল্ম নেগেটিভের সংবেদনশীলতার ব্যাপক বৈচিত্র্যের জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ এক ধরনের মেক-আপ ব্যবহার করতে হত। জোরালো উজ্জ্বল আলোর উৎস এবং ভারী মেক-আপ দুয়ে মিলে আলোকচিত্রিত প্রতিমায় অত্যন্ত কর্কশ একটা টেক্সচারের সৃষ্টি হত। দৃক্‌বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞরা তখন 'ডিফিউজার' নামে কাঁচে-তৈরি একটা সরল যন্ত্রাংশ উপহার দিলেন। এটাকে লেন্সের সামনে ধরে ছবি তোলা হত, যার ফলে ক্যামেরায় প্রবিষ্ট আলোর তেজ কমত এবং আলোকচিত্রিত প্রতিমাকে 'কোমল' দেখাত। কমনীয়তার মান নির্ভর করত ব্যবহৃত ডিফিউশনের হারের উপর। এইভাবে মেক-আপের কর্কশতা ও ছায়ারেখার তীক্ষ্ণতা হ্রাস পেল, চলচ্চিত্রপ্রতিমায় এল এমন এক টেক্সচার যা শুধুই দৃষ্টিনন্দন নয়, গভীরভাবে গ্ল্যামারাসও।

হলিউডে আলোকসম্পাতের বিশেষ একটা রীতির প্রচলন হল, যা জোরালো ব্যাক-লাইটিং ও ডিফিউজারের সম্মিলিত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গ্ল্যামার ফোটোগ্রাফির এমন এক ধারার জন্ম দিল যেটি সারা পৃথিবী জুড়ে চলচ্চিত্রের ক্যামেরাম্যানদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

ফোটোগ্রাফির এই ধরনটি পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতীয় ক্যামেরাম্যানদের মধ্যেও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। বস্তুত আজও কিছু-কিছু পরিবর্তন-পরিমার্জন সহ এই রীতিই ভারতীয় সিনেমায় বজায় আছে। পঞ্চাশের ও যাটের দশকে ভারতে শাদা-কালো সিনেমাটোগ্রাফির মান কেমন ছিল তার কিছু অনবদ্য উদাহরণ মেলে বিখ্যাত ভারতীয় ক্যামেরাম্যান ফারদুন ইরানি, ফলি মিস্ত্রি, জাল মিস্ত্রি, রাধু কর্মকার, ভি. কে. মূর্তি, আর. ডি. মাথুর, ভি. অবধূত, ভি. এন. রেড্ডি, ভি রাটরা, নরিমান ইরানি এবং জি. সিং-য়ের কাজে।

ক্যামেরাম্যানদের দার্শনিক সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে। যুদ্ধচিত্রের ক্যামেরাম্যানেরা সিনেমার পর্দায় নিয়ে এলেন কঠোর নিখাদ বাস্তবতা। যুদ্ধের বাস্তবতাকে তৎক্ষণাৎ সঠিক ও যথাযথ ভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে লাইটিং ও কম্পোজিশনের প্রথাগত নিয়মকানুন অবান্তর বোধ হল। পশ্চিমি চিত্রপরিচালকেরা অধিকাংশই ছিলেন যুদ্ধের প্রত্যক্ষ সাক্ষী এবং/অথবা যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির ফলভোগকারী। সমসাময়িক কালচেতনাকে তুলে ধরার জন্য তাঁরা প্রত্যক্ষ কঠোর নির্জলা প্রতিমার প্রয়োজন বোধ করলেন। উন্নত কাঁচা মাল (ফিল্ম স্টক) ও নানান সুযোগ-সুবিধা যুক্ত ক্যামেরায় সজ্জিত হয়ে ক্যামেরাম্যানরা এগিয়ে এলেন ওই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায়।

'দ্য বাইসাইকেল থিভ্‌স্'-এর মতো ছবি ইউরোপে নিও-রিয়ালিজমের প্রবর্তন করল, এই আন্দোলন ভারতীয় চলচ্চিত্রকার ও চিত্রগ্রাহকদের চলচ্চিত্রশৈলী ও চিত্রশৈলীকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতীয় সিনেমায় চলচ্চিত্রপ্রতিমার নান্দনিকতার ক্ষেত্রে দুজন সিনেমাটোগ্রাফারের ভূমিকা অবিস্মরণীয়—এঁরা হলেন বম্বের ভি. কে. মূর্তি ও বাংলার সুব্রত মিত্র। দুজনেই পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে সিনেমার জগতে পদার্পণ করেন।

মূর্তি বাঙ্গালোরের এস. জে. পলিটেকনিক থেকে শিক্ষা লাভ করে ফলি মিস্ত্রি ও জাল মিস্ত্রির সহকারী রূপে কাজ করেন। ভারতে পঞ্চাশের হলিউড সিনেমাটোগ্রাফির সবচেয়ে সৃজনশীল প্রতিনিধি ছিলেন ফলি ও জাল। মূর্তি এরপর পরিচালক গুরু দত্তের সঙ্গে যুক্ত হন। গুরু দত্ত

নিজেও তখন নতুন এক চলচ্চিত্রীয় প্রকাশভঙ্গির সন্ধানে ছিলেন। দুজনে মিলে এমন এক চিত্রশৈলীর সৃষ্টি করলেন যাতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকবাদী লাইটিংয়ের সঙ্গে মৌলিক ক্যামেরা মুভমেন্টের মিলন ঘটল। মূর্তির সিনেমাটোগ্রাফির সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ মেলে প্যাসা, কাগজ কে ফুল এবং সাহিব, বিবি আউর গুলাম ছবিতে। শাদা-কালোয় চিত্রিত এই তিনটি ছবি (শেষোক্ত ছবিটি সিনেমাস্কোপে) ভারতীয় সিনেমায় শাদা-কালো চলচ্চিত্র-প্রতিমার বিবর্তনের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

মূর্তির কল্পমূর্তিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অত্যন্ত নিখুঁত ফ্রেমিং এবং লাইটিংয়ে বৈষম্য ও বুনটের ক্ষেত্রে চমৎকার নিয়ন্ত্রণ। কাগজ কে ফুল ছবিতে তিনি দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার সময় চমৎকার কাব্যিক ট্র্যান্‌জিশন বা রূপান্তর সৃষ্টি করেছিলেন। যা ছিল তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা। কিছুটা শৈলীকৃত আলোকসম্পাত ও ক্যামেরা মুভমেন্টের মধ্য দিয়ে ওই ইফেক্ট সৃষ্টি হয়েছিল। ছবিটির নায়ক ছিল একজন চিত্রপরিচালক। ছবির অনেক দৃশ্য স্টুডিও ও ফিল্ম সেটে তোলা হয়েছিল। মূর্তির অনবদ্য শাদা-কালো আলোকচিত্রণে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের ভারতীয় ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির পরিবেশ ও পটভূমি তুলনারহিত ভাবে ফুটে উঠেছে। ছবিটি সেইদিক থেকে অদ্বিতীয়। তাঁর ফোটোগ্রাফির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে চলচ্চিত্র-প্রতিমার ক্ষেত্রে ক্ল্যাসিকাল অ্যাপ্রোচের বদলে এক সদর্থক ও মৌলিক নতুনত্ব। মূর্তি পরবর্তী প্রজন্মের একসারি ক্যামেরাম্যানকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন। আমি বহুবছর তাঁর সহকারী হিশেবে কাজ করেছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ভারতীয় সিনেমায় নব্য চিত্রপ্রতিমার আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক তিনি।

সিনেমাটোগ্রাফার হিশেবে সুব্রত মিত্রের কর্মজীবনের সূচনা হয় সত্যজিৎ রায়ের ছবি দিয়ে। ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার এবং চলচ্চিত্র বিষয়ে ব্যাপক পড়াশুনো করার সুবাদে সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সিনেমা সম্পর্কে সত্যজিৎ সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। বাংলার তৎকালীন জনপ্রিয় সিনেমার রীতিনীতি থেকে সত্যজিতের ফিল্ম-অ্যাপ্রোচ ছিল একেবারে মূলগতভাবে আলাদা। বিজ্ঞাপন সংস্থায় আর্ট ডিরেক্টরের কাজ করেছিলেন বলে তাঁর দৃশ্যচেতনা ছিল খুবই পরিণত। এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনি চিত্রনির্মাণে এলেন। সুব্রত-সত্যজিৎ-জুটি ভারতীয় সিনেমাটোগ্রাফির ক্ষেত্রে বিপ্লব এনে দিলেন। সত্যজিৎ যদিও হলিউডের কাহিনীবর্ণন রীতির দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন, নিজের ছবিতে তাঁর বর্ণনারীতি হলিউডের চাইতে য়ুরোপিয় নিও-রিয়ালিস্ট সিনেমার বেশি কাছাকাছি। তাঁর ছবির আঙ্গিকে সুব্রত মিত্রের শাদা-কালো-আলোকচিত্র একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিশেবে কাজ করেছে। চলচ্চিত্র-প্রতিমায় বাস্তববাদের সবচেয়ে স্মরণীয় কিছু উদাহরণ মেলে পথের পাঁচালী, অপরাজিত, অপুর সংসার ও চারুলতার মতো ছবিতে।

সুব্রত মিত্রের আলোকচিত্রণের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিখুঁতভাবে পরিকল্পিত স্বাভাবিকবাদী আলোকসম্পাত, অত্যন্ত সংবেদনশীল কম্পোজিশন ও খুবই সুষমামণ্ডিত ক্যামেরা মুভমেন্ট। তাঁর চিত্রগ্রহণ পদ্ধতি য়ুরোপিয় ক্যামেরাম্যানদেরও অনুপ্রাণিত করেছে।

১৯৮০-৮১ সনে নিউ ইয়র্কের মিউজিয়ম অব মডার্ন আর্টে অনেকগুলি ভারতীয় ছবি একসঙ্গে দেখানো হয়েছিল। সেই সময় আমি নিউ ইয়র্ক গেছিলাম। সেখানে বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান নেস্টর অ্যাল্‌মেনড্রস-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে বলেন, প্যারিসের ফিল্ম স্কুলে সিনেমাটোগ্রাফি নিয়ে পড়াশুনো করার সময় উনি চারুলতা ছবিটি দেখেন। ছবিটির চিত্রপ্রতিমার অতি উন্নত মান তাঁকে একেবারে বিমুগ্ধ করে দেয়। তাঁকে বিশেষ করে আবিষ্ট করেছিল সুব্রত

মিত্রের আলোকসম্পাত পদ্ধতি। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে তিনি মিত্রের প্রকাশিত কিছু সাক্ষাৎকার জোগাড় করেন ও তা থেকে জানতে পারেন ছবিতে কীভাবে ওই পদ্ধতি সম্ভব করে তোলা হয়েছিল। তিনি তারপর ফিল্ম স্কুলে তাঁর শিক্ষানবিশ ছবিগুলিতে ওই একই পদ্ধতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। তাঁর সহপাঠীরা এবং শিক্ষকদেরও কেউ-কেউ মনে করেছিলেন তিনি অদ্ভুত প্রয়াস চালাচ্ছেন। কিন্তু পরে ছবিতে তার ফল দেখে তাঁরা মত পাল্টান। নেস্টর জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, 'চারুলতার আলোকচিত্রণ থেকে যে মৌলিক অনুপ্রেরণা আমি পেয়েছিলাম তাকে কেন্দ্র করেই আমার পরবর্তী সমগ্র চিত্রকর্মের উদ্ভব ঘটেছে।' তাঁর এই উক্তির মধ্যে ছিল সুব্রত মিত্রের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধার প্রকাশ।



ষাটের বছরগুলিতে আমাদের সিনেমা জগতে দুটো ঘটনা ঘটল। প্রথমত ভারতবর্ষে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি এল, দ্বিতীয়ত পুনেতে ভারতীয় ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইন্‌স্টিটিউট স্থাপিত হল। ফিল্ম সোসাইটিগুলির কল্যাণে ইউরোপের ও পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছবি দেখার সুযোগ ঘটল। এইসব ছবি থেকে আমরা জানতে পারলাম আলোকসম্পাত, কম্পোজিশন ও ক্যামেরা মুভমেন্টের নানান ধরনের কথা, যা ছিল হলিউডের ধরন-ধারণ থেকে মূলগতভাবে আলাদা। এই অভিজ্ঞতা ছিল খুবই চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। সহজে বহনযোগ্য ক্যামেরা অ্যারিফ্লেক্স ও নাগ্রা টেপ রেকর্ডারের দৌলতে সারা পৃথিবী জুড়ে চিত্রপরিচালক ও চিত্রগ্রাহকদের মধ্যে এক নতুন দৃশ্যচেতনার সূচনা হচ্ছিল। তরুণ ভারতীয় ক্যামেরাম্যানরাও, বিশেষত যাঁরা ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইন্‌স্টিটিউট থেকে পাশ করেছিলেন তাঁরা, ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিমার ক্ষেত্রে নতুন অ্যাপ্রোচ নিয়ে এলেন।

এই সমস্ত তরুণ ক্যামেরাম্যানদের অনেকেরই প্রথমদিককার কাজ চিহ্নিত হয়ে আছে প্রতিফলিত বা নমনীয় আলোর সুষম প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। এই বিশেষ 'দৃষ্টিভঙ্গিমা'র অনুপ্রেরণাটা

এসেছিল গদারের ছবির চিত্রগ্রাহক রাউল কুতারের সিনেমাটোগ্রাফি এবং তৎকালীন চেকোশ্লোভাক ছবি থেকে। এই বৈশিষ্ট্যটি কয়েকটা বছর শুধু ইন্‌স্টিটিউটের স্নাতক ক্যামেরাম্যানদের কাজে নয়, ইণ্ডাস্ট্রির কোনো-কোনো সিনেমাটোগ্রাফারের ছবিতেও প্রাধান্য বিস্তার করেছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই নরম সুষম আলোয় তোলা এইসব প্রতিমা একঘেয়ে মনে হ'তে লাগল, যার মূল কারণ ক্যামেরাম্যানদের অভিজ্ঞতা ও মৌলিকতার অভাব।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে পশ্চিমি জগতে সিনেমা ও টেলিভিশনে বিজ্ঞাপনচিত্রের এক ব্যাপক বিস্ফোরণ দেখা দিল। বিজ্ঞাপন-চিত্রের মূল উপকরণগুলি হল চাকচিক্য, জাঁকজমক এবং নতুন ধরনের ক্যামেরা মুভমেণ্ট, এক কথায় চিত্রপ্রতিমার মধ্যে প্রচণ্ড এক উত্তেজনার ভাব। প্রথম দিককার পণ্যপ্রতিমা কাহিনীচিত্রপ্রতিমাকে তাদের আদর্শ হিশেবে নিয়েছিল। শেষ সত্তরে আর আশির দশকে প্রবণতাটা একেবারে উল্টে গেল। পণ্যপ্রতিমা থেকে তরুণ চিত্রপরিচালক ও চিত্রগ্রাহকরা অনুপ্রেরণা পেতে লাগলেন, এঁদের অনেকেই বিজ্ঞাপন-জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। ভারতেও তরুণ ক্যামেরাম্যানরা বিজ্ঞাপনচিত্রের কাজে খুবই সৃজনশীল ও আকর্ষণীয় অবদান রেখেছেন। আমি নিজে অসংখ্য বিজ্ঞাপনচিত্র ও তথ্যচিত্রে ক্যামেরা চালিয়েছি। সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এই বিভাগে সপসেরা ক্যামেরাম্যানদের মধ্যে আছেন আর.এম.রাও, বরুণ মুখার্জী, চ্যাং, বিকাশ শিবরমন, কিরণ দেব হংস, মহেশ আর এবং রাজীব মেনন। সত্তরের দশকে অনেক তরুণ ভারতীয় ক্যামেরাম্যানের চিত্রকর্মকে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করেছে যে-ছবির সিনেমাটোগ্রাফি ও ক্যামেরার কাজ তা হল ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা পরিচালিত হলিউডচিত্র দ্য গডফাদার। এই ছবিতে কপোলা নরম টপ লাইটিংয়ের যে-পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন, তা সম্ভব করার জন্য সিনেমাটোগ্রাফার গর্ডন উইলিস, প্রথাগত চলচ্চিত্রীয় আলোকসম্পাত পদ্ধতি যে-সমস্ত নিয়মকানুন অনুসরণ করে চলে, তার অনেকগুলিকে অস্বীকার করেন। এর ফলে একটা দৃশ্যগত 'ফিলিং'-এর সৃষ্টি হয়, সিনেমাটোগ্রাফির ইতিহাসে এই ইফেক্টটি একদিক থেকে অতুলনীয়।

ভারতে যে-দুই সিনেমাটোগ্রাফার এই শৈলীর অন্তর্গত উপাদানকে তাঁদের চিত্রকর্মে ব্যবহার করে কিছু অনবদ্য চলচ্চিত্র-প্রতিমার সৃষ্টি করেন তাঁরা হলেন পি.সি. শ্রীরাম ও সন্তোষ শিবন। শ্রীরাম চিত্রিত নয়াকন ও শিবন-চিত্রিত রোজা সমসাময়িক ভারতীয় সিনেমাটোগ্রাফির দুটি মাইলস্টোন।

ইউরোপের আর যে ক্যামেরাম্যান তরুণ ভারতীয় ক্যামেরাম্যানদের কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপিত করেছেন তিনি হলেন স্বেন নিক্‌ভিস্ট। ইঙ্গমার বার্গম্যানের ছবিতে তাঁর সিনেমাটোগ্রাফি বস্তুত সমস্ত পৃথিবী জুড়েই তরুণ ক্যামেরাম্যানদের গভীর অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

চিত্রগ্রাহক প্রধানত চিত্রপরিচালকের চক্ষু হিশেবে কাজ করেন। কোনো ছবির পরিচালকের পক্ষে এটা খুব জরুরি যে তাঁর যেমন খুব স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট দৃশ্যচেতনা ও দৃশ্যশৈলী থাকবে, তেমনি ছবির দৃশ্যগত ঐক্য অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি ক্যামেরাম্যানকে ক্রমাগত উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবেন। চিত্রপরিচালক ও চিত্রগ্রাহকের ছবির স্থানচেতনা নিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার আগ্রহও থাকা দরকার। বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে চিত্রপরিচালক ও চিত্রগ্রাহকের মধ্যে মনোগ্রাহী সৃজনশীল সমন্বয়ের বহু উদাহরণ মেলে। তার মধ্যে আইজেনস্টাইন-এডওয়ার্ড টিশে, অরসন ওয়েলস-গ্রেগ টোলাণ্ড, বার্গম্যান-নিক্‌ভিস্ট, কপোলা-উইলিস, গদার-কুতার প্রভৃতি জুটি হল সর্বাগ্রে উল্লেখ্য।

ভারতে অনুরূপ উল্লেখযোগ্য জুটির মধ্যে আছে গুরু দত্ত-ভি. কে. মূর্তি, বিমল রায়-দিলীপ

বোস, রাজ কাপুর-রাধু কর্মকার, সত্যজিৎ রায়-সুব্রত মিত্র, মৃণাল সেন-কে. কে. মহাজন, শ্যাম বেনেগল-গোবিন্দ নিহালনী এবং বিনোদ চোপরা-বিনোদ প্রধান জুটি। .

শ্যাম বেনেগল হলেন এমন একজন পরিচালক যার সঙ্গে কাজ করার স্বপ্ন সমস্ত ক্যামেরাম্যানই দেখবেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দৃশ্যশিল্পের বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ও সচেতন তিনি। তাঁর প্রতিটি ছবির মধ্য দিয়েই একটা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট দার্শন ব্যক্তিত্ব বেরিয়ে আসে। তাঁর বারোটির অধিক কাহিনীচিত্রে এবং বেশ কয়েকটি তথ্যচিত্রে ক্যামেরা চালাবার সুযোগ আমার ঘটেছে। প্রতিটি ছবির জন্যই স্বতন্ত্র ও নির্দিষ্ট একটা দৃশ্যশৈলী তৈরির চেষ্টা আমরা করেছি। দুজনের নিখুঁত যোগাযোগের মধ্য থেকেই সৃষ্ট হয়েছে অঙ্কুর, নিশান্ত, ভূমিকা, কলযুগ, কোন্ডুরা এবং জুনুন-এর মতো ছবির চিত্রপ্রতিমাগুলি। যেমন ভূমিকা ছবিটি ভারতীয় সিনেমার তিনটি পর্বকে তুলে ধরেছে। যার মধ্যে নির্বাক যুগটিও আছে। আমরা পুনের ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভে গিয়ে নির্বাক যুগের এবং চল্লিশ ও পঞ্চাশ-এর দশকের বিভিন্ন ছবির আলোকসম্পাত রীতি অনুশীলন করি। আমরা ছবিতে বিভিন্ন পর্বের বিভিন্নতা প্রকাশ করেছিলাম বিভিন্ন মাত্রা ও বৈষম্যের ফিল্ম নেগেটিভ ব্যবহার করে।

সাম্প্রতিক জনপ্রিয় ভারতীয় সিনেমায় যে দৃশ্যশৈলীর সাধারণত দেখা মেলে তা হল অত্যন্ত চাকচিক্যময় বা শৈলীকৃত বাস্তববাদ। আশির দশকের শুরু থেকে নতুন একদল ক্যামেরাম্যানের দেখা মিলল যারা ছবির দৃশ্যাভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সিনেমাটোগ্রাফারের সুনির্দিষ্ট অবদান সম্পর্কে মৌলিক ভাবে সচেতন। এই নতুন দৃশ্যচেতনা প্রতিফলিত হয়েছে যেসব বিখ্যাত ক্যামেরাম্যানের চিত্রকর্মে তাঁরা হলেন সন্তোষ শিবন, পি. সি. শ্রীরাম, অশোক মেহতা, বিনোদ প্রধান, মধু আমবট, রাজীব মেনন, ইউ. বি. রাও, বাবা আজমী, ফ্রান্সিস জেভিয়ার, প্রমুখ।

জনপ্রিয় সিনেমার পাশাপাশি ভারতে আছে সমান্তরাল সিনেমা নামে পরিচিত সংখ্যালঘু পরীক্ষামূলক সিরিয়স আঞ্চলিক চলচ্চিত্রও। বিষয় ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে নিরীক্ষামূলক এইসব ছবির গুরুত্ব এইখানে যে, বিনোদনমূলক ঘরানার প্রলোভন ও চাপ এরা অস্বীকার করার চেষ্টা করে। বাণিজ্যিক সিনেমার বিপরীতে এই সমস্ত ছবি কাহিনীবর্ণনের বিভিন্ন রীতি অনুসরণ করে এবং তার ফলে ক্যামেরাম্যানদের কাছ থেকেও বিভিন্ন ও বিবিধ দৃশ্যশৈলী ও দৃশ্যগত প্রতিন্যাস দাবি করে। কে. কে. মহাজন, এ. কে. বীর, বেণু, কুমার, শাজী করুন, জাহাঙ্গীর চৌধুরী, বীরেন্দ্র সাইনি, পীযূষ শাহ ও অনুপ জোতওয়ানি-র চিত্রকর্মে ধরা পড়েছে সম্পূর্ণ নিরলংকার চিত্রপ্রতিমা থেকে অত্যন্ত সংরক্ত চিত্রপ্রতিমা পর্যন্ত প্রতিমার বিবিধ বৈচিত্র্য।

প্রযুক্তির ক্রমাগত সমৃদ্ধির ফলে, ভারতীয় সিনেমাটোগ্রাফারদের সামনে আজ এই চ্যালেঞ্জ উপস্থিত যে চলচ্চিত্র মাধ্যমের নতুন নতুন সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত করে তাঁরা চলচ্চিত্র-প্রতিমার অপার রহস্য ও গভীর কাব্যগুণকে সিনেমার পর্দায় সৃজনশীল ভাবে তুলে ধরতে পারবেন তো!

স্বীকৃতি : দীনেশ লখনপাল

রঙিন ছবি প্রসঙ্গে

ক. রঙ ও রঙিন ফিল্‌ম্/কার্ল ড্রেয়ার

খ. নিছক রঙিন নয়, অর্থপূর্ণ ভাবে রঙে করা/সের্গেই আইজেনস্টাইন

॥ ক ॥

আজ [১৯৫৫ সনে] বছর কুড়ি হল বিশ্ব জুড়ে সিনেমার পর্দায় রঙিন ফিল্‌মের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু এর মধ্যে কটি রঙিন ছবি নান্দনিক ভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে? দুটো-তিনটে-চারটে-পাঁচটা?

হয়তো পাঁচটাই—কিন্তু বোধহয় তার বেশি আর নয়।

এই পাঁচটার মধ্যে পড়বে কিনুগাশার 'গেট অব হেল' এবং অলিভিয়ের-এর 'পঞ্চম হেনরি'-র পর 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট'। অলিভিয়ের তাঁর ছবির বর্ণপ্রকল্পের আইডিয়াটা পেয়েছিলেন পঞ্চম হেনরির সময়কার সচিত্র রঙিন পাণ্ডুলিপি থেকে। আর কিনুগাশা জাপানের ধ্রুপদী কাঠখোদাই অলংকরণ থেকে।

এই তিনটি ছবি ছাড়া অন্যান্য রঙিন ছবিতে রঙ ব্যবহার করে শুধু বিশেষ কিছু ইফেক্ট সৃষ্টি করার চেষ্টাই হয়েছে। এই প্রকার প্রচেষ্টার সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ মিলবে 'মোলিন রোগ' ছবির শুরুতেই ধূমাচ্ছন্ন ঘরটির উপস্থাপনায়, যা একটা খুবই বিশ্বাসযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করে। কিন্তু বাকি ছবিটা, রঙের দিক দিয়ে দেখলে শাদামাটা। কেন? কারণ অন্যান্য দৃশ্যে পরিচালকের পাশে কোনো তুলুজ্-লত্রেক ছিলেন না। হাস্টন নিঃসন্দেহে বড় পরিচালক কিন্তু চিত্রকর হিশেবে তুলজ-লত্রেক আরও বড়।

ফলে কুড়ি বছর সময়ের মধ্যে নান্দনিক ভাবে উল্লেখযোগ্য রঙিন ফিল্‌ম্ তিনটে বা চারটেই হয়েছে। সামান্যই সাফল্য।

মিউজিক্যাল ফিল্‌মে যে মজাদার ও চমকপ্রদ বর্ণবিন্যাস দেখা যায় তার কথা বাদ দিলে, চলচ্চিত্রে রঙ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা খুব সাধারণ প্রবণতাই দৃশ্যমান। স্বাভাবিকতাবাদের রীতি-নীতির প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হতে গিয়েই সম্ভবত এটা ঘটে, যে রীতিনীতি কঠোর ভাবে নির্দিষ্ট, এবং একঘেয়ে। দৈনন্দিন জীবনের বর্ণবিন্যাসের মধ্য থেকে অবশ্যই কবিতা বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির নিজস্ব রঙগুলির যথার্থ অনুকরণের মধ্য দিয়েও রঙিন ফিল্‌ম্ শিল্প হয়ে উঠতে পারে না। চলচ্চিত্রকার যদি প্রকৃতিকে নিছক অনুকরণ করেন, দর্শকও তাহলে খালি ভাববেন অনুকরণ কতটা যথাযথ হয়েছে বা হয়নি।

বস্তুতঃ, আমাদের চোখ এতবার সবুজ ঘাস ও নীল আকাশ দেখেছে, যে, মাঝে-মাঝে সবুজ

আকাশ ও নীল ঘাস দেখার শখ জাগে আমাদের—নতুনত্বের জন্যই। এর পেছনে একটা শৈল্পিক উদ্দেশ্যও অবশ্য থাকতে পারে। কেননা আমাদের মনে রাখা উচিত ছবির রঙ কখনোই প্রকৃতির রঙের নিখুঁত অনুকরণ হতে পারবে না। প্রকৃতিতে বর্ণবিন্যাসের বিভাজন অসংখ্য, যেসব সূক্ষ্ম তারতম্যের অনেকগুলিকে মানুষের চোখ অনুধাবনও করতে পারে না।

চোখে ধরা পড়ে না যেসব তারতম্য, সেমি-টোনগুলির পারস্পরিক পার্থক্য, রঙের অতিসূক্ষ্ম বিভাজন—এ-সমস্তই রঙিন ছবিতে অনুপস্থিত। রঙিন ছবির রঙ প্রকৃতির রঙের অনুরূপ হবে—এই দাবিটাই রঙকে সম্পূর্ণ ভুল-বোঝার এক উদাহরণ। বরং ছবির রঙ প্রকৃতির রঙ থেকে আলাদা হলেই তো দর্শকের নান্দনিক অভিজ্ঞতা আরও ব্যাপক হতে পারে।

পরিচালকের একটা জোরালো হাতিয়ার হল রঙ। যদি রঙের আবেগময় প্রভাবের কথা মনে রেখে বর্ণ নির্বাচন করা হয় এবং বর্ণের সমন্বয়কারী সমাবেশ ঘটানো যায় তাহলে ছবিতে এমন এক শিল্পগুণ আসতে পারে যা শাদা-কালো ছবিতে দুর্লভ। কিন্তু এ-কথা সবসময় মনে রাখা চাই, শাদা-কালো ছবিতে কম্পোজিশন যেমন গুরুত্বপূর্ণ রঙিন ছবিতে কালার কম্পোজিশন বা বর্ণবিন্যাস সেই রকমই গুরুত্বপূর্ণ।

শাদা-কালো ছবিতে অন্ধকারের বিপরীতে আলোর উপস্থাপন, রেখার বিরুদ্ধে রেখার উপস্থাপন। কিন্তু রঙিন ছবিতে উপস্থাপন তলের বিরুদ্ধে তলের, আকারের বিরুদ্ধে আকারের, রঙের বিরুদ্ধে রঙের। শাদা-কালো ছবিতে যা আলো ও ছায়ার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এবং রেখাসমূহের মিলন ও বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, রঙিন ছবিতে তাকেই প্রকাশ করতে হয় বর্ণপুঞ্জের মধ্য দিয়ে।

এ-ছাড়া ছন্দের ব্যাপারটাও আছে। ছবিতে উপস্থিত অন্যান্য ছন্দের সঙ্গে বর্তমানে বর্ণ-ঘটিত ছান্দিকতার প্রসঙ্গটিও এসে যুক্ত হয়েছে।

এখন যখন রঙিন ফিল্‌ম্ তৈরি হওয়া শুরু হয়েছে তখন রঙিন ছবির সম্পাদনা করা হবে কীভাবে সেই সমস্যাটা নিয়ে গভীরভাবে ভাবা দরকার। কাটিং ও প্লেসিং-এর একটু এদিক ওদিক হলেই বর্ণতলের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে ও ছবিতে অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে।

এ-কথা সবসময় মনে রাখা দরকার, চলচ্চিত্রে দৃশ্যবস্তু ও পাত্র-পাত্রী সর্বদা গতিশীল বলে, রঙিন ছবিতে রঙ নিত্য পরিবর্তনশীল ছন্দের মধ্য দিয়ে নিয়ত সঞ্চারিত হয় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এবং যখনই, রঙের সঙ্গে রঙের সংঘাত বা মিলন ঘটে তখনই চমকপ্রদ প্রভাবময়তার সৃষ্টি হয় বা হতে পারে। চলচ্চিত্রে রঙ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মটা হল এই : প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সংখ্যক রঙ ব্যবহার করা এবং শাদা ও কালোর সঙ্গে মিলিয়ে রঙ ব্যবহার করা। রঙিন ছবিতে এমনিতে শাদা ও কালো রঙের ব্যবহার প্রায় ঘটেই না, বলা চলে। শিশু যেমন তার রঙের বাক্সে উজ্জ্বল সব রঙ পেয়ে শাদা ও কালোকে ভুলে যায়, সেইরকম।

যাবতীয় সমস্যাই পরিচালকের কাজকে আরও জটিল করে তোলে—এবং একই সঙ্গে আরও আকর্ষণীয়ও। যে-কোনো সচেতন পরিচালকই জানেন, শাদা-কালোয় দৃশ্যরচনা করা মানে এক প্রকার শৈল্পিক সংগ্রাম করা। রঙের আবির্ভাব এই সংগ্রামকে কোনোমতেই সহজ করেনি, কিন্তু তা, সংগ্রামে সাফল্য এলে, সেই বিজয়কে মধুরতর করেছে। এবং এই সাফল্য আরও তাৎপর্যপূর্ণ হবে পরিচালক যদি রঙ ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতাবাদের বন্ধ্যা চক্র থেকে সৃজনশীল ভাবে বেরিয়ে আসতে পারেন তবে। রঙ ব্যবহারের দিক থেকে দেখলে, রঙিন ছবি প্রকৃতই এক বিশেষ নান্দনিক অভিজ্ঞতা হয়ে উঠতে পারবে যদি স্বাভাবিকতাবাদের গণ্ডি থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। একমাত্র তাহলেই রঙের পক্ষে অপ্রকাশযোগ্যকে প্রকাশ করা সম্ভব হবে। যা শুধুই

অনুভবযোগ্য তাকে বহিরঙ্গে প্রকাশ করা সম্ভব হবে। একমাত্র তাহলেই বিমূর্তের জগতে প্রবেশাধিকার ঘটবে চলচ্চিত্রের, যে-জগতের দ্বার এতদিন সিনেমার কাছে রুদ্ধ ছিল।

পরিচালক ছবিতে তাঁর প্রতিমাগুলিকে প্রথমে শাদা-কালোয় ভাববেন এবং তারপর তাতে রঙ যোজনা করবেন এমন নয়। শুরু থেকেই পরিচালকের মনশ্চক্ষুতে থাকবে সমস্ত দৃশ্যের সম্পূর্ণ বর্ণবিন্যাস। পরিচালককে সৃষ্টিই করতে হবে রঙের ভাষায়। কিন্তু বর্ণানুভূতি তো অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। রঙের সংবেদন এক দার্শনিক অভিজ্ঞতা, এবং রঙে দেখা, ভাবা ও অনুভব করার ক্ষমতা একটা জন্মগত ক্ষমতা। আমরা ধরতে পারি যে চিত্রকরদের সাধারণভাবে এই দক্ষতা থাকে।

আগামী কুড়ি বছরে শিল্পগুণসম্পন্ন রঙিন ফিল্মের সংখ্যা যদি চার বা পাঁচ থেকে আরও বাড়াতে হয়, তাহলে চলচ্চিত্র শিল্পকে সাহায্য নিতে হবে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে, অর্থাৎ চিত্রশিল্পীদের কাছ থেকে, ঠিক যেভাবে সাহায্য নেওয়া হয় লেখকদের, সুরস্রষ্টাদের এবং নৃত্য পরিচালকদের কাছ থেকে। রঙিন ছবির চিত্রপরিচালককে তাঁর সহযোগীদের মধ্যে এখন থেকে একজন চিত্রশিল্পীকেও স্থান দিতে হবে। এবং পরিচালকের অধীনস্থ হিশেবে ওই চিত্রশিল্পী পরিচালকের সঙ্গে সহযোগিতায় গোটা ফিল্মের কালার ইফেক্ট সৃষ্টি করবেন। মূল চিত্রনাট্যের পাশাপাশি একটা কালার স্ক্রিপ্ট থাকবে এবং তাতে থাকবে চিত্রশিল্পীর আঁকা যাবতীয় অনুপুঙ্খ সহ অসংখ্য রেখাচিত্র।

অনেকে আপত্তি জানাতে পারেন : পরিচালকের জন্য তো কালার টেক্‌নিসিয়ানরা আছেনই। এই কলাকুশলীরা হলেন ও ভবিষ্যতেও থাকবেন রঙের ক্ষেত্রে পরিচালকের প্রধান উপদেষ্টা। বর্ণতত্ত্ব ও বর্ণপ্রয়োগ বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও ব্যাপক অভিজ্ঞতার দরুন তাঁরা নানান ব্যবহারিক সমস্যা ও প্রায়োগিক সংকট থেকে পরিচালককে রক্ষা করতে পারবেন। কিন্তু তাঁদের দক্ষতা ও দায়িত্ববোধের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখেও বলা যায়, তাঁদের সেই গুণটা নেই যা একজন গুণী চিত্রকরের রয়েছে—শিল্পীর সৃজনশীলতা, শিল্পী নিজের শিল্পসত্তা থেকে অভিঘাত ও অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকেন। তাছাড়া তাঁর উপস্থিতি—পেশাদার চিত্রশিল্পী রূপে তাঁর দক্ষতা—কালার টেক্‌নিসিয়ানদের পক্ষেও সহায়ক হবে।

একটা বিশুদ্ধ কাল্পনিক ঘটনার কথা ভাবা যাক। ধরা যাক তুলুজ্‌-লত্রেক বেঁচে আছেন এবং 'মোলিন রোগ' ছবিতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণ উপদেষ্টা হিশেবে তিনি কাজ করেছেন। শুধু প্রারম্ভিক দৃশ্যটিতে নয়, সমস্ত দৃশ্যেই। তাহলে কি ছবির অন্যান্য সমস্ত দৃশ্যের বর্ণবিন্যাসও প্রারম্ভিক দৃশ্যের বর্ণবিন্যাসের মতো উঁচুদরের হত না? প্রারম্ভিক দৃশ্যটির বর্ণবিন্যাস যে তুলুজ্‌-লত্রেকের একটা কালার কম্পোজিশন থেকেই নেওয়া! আর তাহলে কি 'মোলিন রোগ', একটা প্রশংসাযোগ্য প্রচেষ্টার বদলে, হয়ে উঠত না একটা প্রকৃতই উল্লেখযোগ্য কালার ফিল্‌ম্? এর ফলে পরিচালকের গুরুত্ব যে কমে যেত তা নয়। পরিচালকের কাজ তো সবকিছু নিজে করা নয়, পরিচালকের কাজ হল সবকিছুর তত্ত্বাবধান করা, যাবতীয় নির্দেশ দেওয়া, ছবির কাঠামো সুদৃঢ় রাখা এবং খণ্ড খণ্ড অংশগুলির সাহায্যে অখণ্ড রূপকল্পনা প্রতীত করে তোলা।

আমি এখানে যা বললাম তার পেছনে এই ইচ্ছা কাজ করছে যে, আমি চাই কালার ফিল্‌ম্ বা রঙিন ছবি যে বদ্ধ জলাশয়ে আটকে পড়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসুক ও তর্‌তর্ করে এগিয়ে চলুক উন্মুক্ত সমুদ্রপানে। বর্তমানে রঙিন ছবির উদ্দেশ্য হল নিছক অনুকরণ প্রবণতা, রঙিন ছবির যা হওয়া উচিত নয় তা হওয়ার চেষ্টার মধ্যেই চলচ্চিত্রে রঙ ব্যবহারের যাবতীয় প্রয়াস সীমাবদ্ধ। 'পঞ্চম হেনরি' অনুসরণ করতে চেয়েছে মধ্যযুগের সচিত্র রঙিন পাণ্ডুলিপির

বর্ণপ্রকল্প, 'গেট অব হেল'-য়ে কিনুগাশা অনুপ্রাণিত হয়েছেন জাপানের ধ্রুপদী কাঠখোদাই অলংকরণের বর্ণবিন্যাসের দ্বারা।

আধুনিক যুগের বর্ণবিশেষজ্ঞের প্রতিভার ছাপ সর্বাঙ্গে নিয়ে কোনো রঙিন ছবির আবির্ভাব এখনও অনেক পরিচালকের অসমাপ্ত প্রয়াসের কাজ। একমাত্র তাহলেই রঙিন ছবি আর নিছক রঙে তোলা ছবি না থেকে হয়ে উঠবে এক জীবন্ত শিল্পমাধ্যম।

॥ খ ॥

এল. ভি. কুলেশভ যখন তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য আমাকে চলচ্চিত্রে রঙের ব্যবহার নিয়ে কিছু লিখতে অনুরোধ করেছিলেন, তখন তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে, অল্পবিস্তর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা না থাকলে, কালার কম্পোজিশন নিয়ে যাবতীয় কথাবার্তা তাত্ত্বিক বা ভিত্তিহীন কল্পনার স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য।

'আইভান দি টেরিব্‌ল্' ছবিতে একটি রঙিন দৃশপর্যায় গ্রহণ করতে গিয়ে আমার যে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার ভিত্তিতে, কুলেশভের অনুরোধ মতো, আমি কিছু লিখছি।

(আমি আগে ও অন্যত্র বলেছি, শব্দ যেমন ছবিতে খেয়াল, নতুনত্ব বা তামাশা হিশেবে আসেনি, যথাযথ ভাবে বললে, নির্বাক চলচ্চিত্র শব্দের ভিত্তিভূমি নয়, শব্দের জন্মই হয়েছে নির্বাক চলচ্চিত্র থেকে, নির্বাক চলচ্চিত্রে দৃশ্যগত অভিব্যক্তির সীমার বাইরে যাওয়ার যে আভ্যন্তরীণ প্রেরণা ছিল তা থেকেই শব্দের উদ্ভব হয়েছে, শব্দের সমস্যার প্রাযুক্তিক সমাধান হওয়ার আগেই নির্বাক চলচ্চিত্রে শব্দের প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়েছিল : নির্বাক চলচ্চিত্র শব্দ, শব্দের ইফেক্ট, শব্দের ইমেজ ও শাব্দিক অনুযঙ্গের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল; তেমনি চলচ্চিত্রে রঙের তাগিদও সমভাবেই অনুভূত হয়েছিল। নির্বাক চলচ্চিত্র যেমন শব্দের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে, সবাক চলচ্চিত্র তেমনি রঙের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছে। শাদা-কালো ছবির যুগেও রঙ উপাদান হিশেবেই ছায়াছবির একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য রূপে বিবেচিত হয়েছে। এবং আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, চলচ্চিত্রে সম্পূর্ণ গঠনগত ঐক্য—ছবি ও শব্দের ঐক্য- -যখন ছবি রঙে তোলা হবে তখনই লাভ করা যাবে।)

চলচ্চিত্রে প্রকাশময় বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার সম্বন্ধে একটা দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত আছে, যা, আমার মতে, ত্রুটিপূর্ণ হলেও, বহুল প্রচলিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সার্থক আবহসংগীত হল তাই যা আলাদা করে শুনতে হয় না, ক্যামেরার সার্থক ব্যবহার হল তাই যা বিশেষভাবে চোখে পড়ে না, এবং সফল পরিচালনা হল তাই যা নিজেকে জানান দেয় না। তেমনি রঙের ক্ষেত্রে, এই দৃষ্টিভঙ্গি বলে, সার্থক রঙিন ছবিতে দর্শককে রঙ সম্পর্কে আলাদা করে সচেতন হতে হবে না। আমার মতে, এই দৃষ্টিভঙ্গিকে যদি নীতিগত স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে, সৃজনক্ষমতার বন্ধ্যাত্বই প্রকাশ পাবে, সাংগঠনিক ভাবে সম্পূর্ণ একটি ছবি নির্মাণ করতে গেলে চলচ্চিত্রের প্রকাশময় পদ্ধতিগুলি যেভাবে আয়ত্ত করতে হয় তা করায় অক্ষমতাই বোঝাবে।

আমার মতে, চলচ্চিত্রে প্রকাশময় পদ্ধতির বৈচিত্র্য প্রচুর বলে পরিচালক যেন এক বা একাধিক পদ্ধতির খাতিরে অন্য কোনো পদ্ধতিকে অবহেলা না করেন। বরং, প্রতিটি পদ্ধতির সমস্ত সম্ভাবনার সম্পূর্ণ ব্যবহার ঘটাতে পরিচালককে ক্রমাগত শিখতে হবে, গোটা ফিল্‌মের সামগ্রিক সমাবেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটিকে তার প্রয়োজনীয় অবস্থান ও গুরুত্ব দিতে হবে।

এখানে আমি ইচ্ছে করেই 'সমাবেশ' শব্দটি ব্যবহার করলাম। কেননা যেমন অভিনেতাদের

সমাবেশের মধ্য দিয়ে প্রতিটি অভিনেতাকে সুযোগ দেওয়া হয় তার সামর্থ্য অনুসারে ও অন্যদের সঙ্গে ঐকতানিক ভারসাম্য রেখে নিজেকে প্রকাশ করার, তেমনি চলচ্চিত্রের প্রকাশময় পদ্ধতিগুলির সামগ্রিক সমাবেশ এমন হওয়া চাই যাতে সমগ্র কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি পদ্ধতি সর্বাধিক ফলপ্রদ ও কার্যকর হতে পারে।

'ঐকতান' শব্দটাও উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে ব্যবহার করা হল, কেননা সবসময়েই বাঞ্ছিত ভারসাম্যের চরম উদাহরণ হল সংগীতের ঐকতান বৃন্দবাদন।

সাংগীতিক সংগঠনের মতো, চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও, সমগ্র প্রকাশ কাঠামো এমন হওয়া চাই যাতে বিশেষ-বিশেষ উপাদান ব্যাহত না হয়, বিশেষ কোনো উপাদানের উপর পক্ষপাতিত্বও না ঘটে। পরিবর্তে প্রকাশের পদ্ধতিগুলিকে সুচিন্তিতভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ও সেই নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ফিল্মের বিষয়বস্তু, থিম, ভাবার্থ ও বক্তব্যকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারে যে-উপাদানটি তাকেই সর্বাধিক সুযোগ দেওয়া সম্ভব।

এই উপাদানটি অবশ্য একমাত্র তখনই ফলপ্রদ হয় যখন তার পেছনে থাকে অন্যান্য উপাদানের সম্মিলিত সহযোগিতা। প্রকাশময় পদ্ধতিগুলি সকলে মিলে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে ও সমগ্র কাঠামোর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এই ঐকতানে অংশগ্রহণ করে।

আবার বলছি, শিল্পক্ষমতা বলতে বোঝায় প্রকাশময় পদ্ধতিগুলির প্রতিটি উপাদানকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত বিকশিত করতে পারার ক্ষমতা ও তারই সঙ্গে সমগ্রকে এমন ভাবে ঐকতানিক ভারসাম্য দেওয়া যাতে বিশেষ কোনো একক উপাদান সামগ্রিক সমাবেশের ঐক্যকে ও সমগ্র কাঠামোর ভারসাম্যকে ব্যাহত করতে না পারে।

চিত্রনির্মাণের যে-কোনো প্রকাশময় পদ্ধতি সম্পর্কে এ-কথা প্রযোজ্য।

চলচ্চিত্রে রঙের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এ-কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

(ইমেজই যদি শব্দ-দৃশ্য সংযোজনের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রক হয় যে রকম আমরা অনেক আগে সবাক ছায়াছবির উপর আমাদের বিবৃতিতে বলেছিলাম; যদি গতিময়তার সূচনা হয় দৃশ্যগত ও শাব্দিক উপাদানের সূক্ষ্ম সমন্বয় স্থাপন করছে এমন ছন্দ ও বুনোটের মধ্য দিয়ে, তা হলে ইমেজের সাথে সাউণ্ডের সুসমঞ্জস মিশ্রণ খুব সম্ভব সবচেয়ে ভালোভাবে লাভ করা যায় বর্ণের অতি সূক্ষ্ম তারতম্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত আলোর সূক্ষ্ম তারতম্যের মধ্য দিয়ে।)

এখন পর্যন্ত আমি যা বলেছি তাকে সংহত করে আনা যায় এই বক্তব্যে . চিত্রনির্মাণ কর্মে চলচ্চিত্রের প্রকাশময় পদ্ধতির সমস্ত উপাদান অবশ্যই অংশগ্রহণ করবে নাটকীয়তার উপাদান হিশাবে। সুতরাং, চলচ্চিত্রে রঙ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথম শর্ত হল, রঙ প্রথমত ও প্রধানত হওয়া চাই একটি নাটকীয় উপাদান।

এই ব্যাপারে রঙ হল সংগীতের মতো।

চলচ্চিত্রে সংগীত ভালো তখনই যখন তা দরকারি।

চলচ্চিত্রে রঙও ভালো তখনই যখন তা দরকারি।

যার অর্থ চলচ্চিত্রে সংগীত বা রঙ ভালো তখনই যখন ও যেখানে এই দুই উপাদান (অন্য কোনো উপাদান নয়), নাটকীয়তার বিকাশের সেই পর্যায়ে, ছবির যা বক্তব্য বা ব্যঞ্জনা, তাকে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ বা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম।

আমরা রঙকে ফিল্মের নাটকীয় গঠন কাঠামোর একটা উপাদান হিশাবে নিচ্ছি।

রঙের ব্যবহার সংগীতের ব্যবহারের অনুরূপ বলে মনে করছি।

এই কথা উঠতে পারে যে, রঙিন ছবিতে সবসময়ই পর্দায় রঙ উপস্থিত, কিন্তু সংগীত তো

যখন দরকার শুধু তখনই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই যুক্তিতে পূর্বোক্ত সাদৃশ্য বাতিল হয়ে যায় না। কেননা যে ছবিতে এই মুহূর্তে আমরা একজন অ্যাকর্ডিয়ন বাজিয়েকে দেখি, আরেক মুহূর্তে শুনি একটি গান ও অন্যান্য সময়ে থাকে সংলাপ, তাকে মিউজিকাল ছবি বলা হয় না।

মিউজিকাল ছবি হল তাই যেখানে সংগীতের অনুপস্থিতি একটা সাময়িক বিরতি মাত্র। কিন্তু সেই বিরতিতে সাংগীতিক ধারাবাহিকতা ভঙ্গ হয় না : পর্দা থেকে যখন কোনো সংগীত ভেসে আসছে না, তখনও সংগীতময় সংলাপ থাকছে, থাকছে প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপাদানের শরীরী ধারাবাহিকতা, চরিত্রগুলি কর্তৃক উত্থাপিত আবেগের তন্তুজাল, পর্বগুলির মধ্যে এবং পর্বগুলির ধারাক্রমের মধ্যে মনতাজসম্মত ছন্দ।

রঙ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

যতক্ষণ না পর্যন্ত সিচুয়েশন রঙের কাছে অ্যাকশনের নাটকীয় প্রকাশ দাবি করছে (এবং তার ফলস্বরূপ, ফিসফিস করে বলা কয়েকটি শব্দ থেকে আমাদের মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার মতো উপযুক্ত ও প্রাসঙ্গিক বর্ণবিন্যাস না থাকছে), যতক্ষণ না পর্যন্ত রঙ পর্দাকে ভরিয়ে দিচ্ছে, ধরা যাক, নায়িকার পোশাকের টকটকে সবুজ রঙ দিয়ে (যে দৃশ্যে নায়িকার হিমশীতল বিবর্ণ মুখে কম্পমান ঠোঁট থেকে ঝরে পড়ছে ফিসফিস করে বলা কয়েকটি শব্দ), ততক্ষণ অবধি রঙ নিজের প্রভাবশালী ক্ষমতাকে দাবিয়ে রাখছে ও এমন একটি ফ্রেম হিশাবে কাজ করছে, যা, ছবিতে ব্যবহৃত ক্লোজ-আপের স্বার্থে, একেবারে অপরিহার্য নয় এরকম সবকিছুকে বর্জন করে; যেগুলি লং শটে দেখানো হলে, ক্লোজ-আপে প্রদর্শিত দৃশ্যবস্তু থেকে আমাদের মনোযোগ সরে যেতে পারত।

কিন্তু এটা রঙের উপাদানের নিজেকে ব্যাহত করা নয়। এটা হল একপ্রকার 'বর্ণবিরতি'। বর্ণোপাদান কর্তৃক শক্তি সঞ্চয় যাতে একটু পরেই দর্শককে বিমুগ্ধ করা যায় উপযুক্ত বর্ণবিন্যাস দিয়ে—শাদা ফেনায় শোভিত নীলচে-কালো তরঙ্গমালা, গাঢ় বাদামি ধোঁয়ার মেঘ থেকে গনগনে লাল লাভার স্রোত, ইত্যাদি। ঠিক যে মুহূর্তে রঙ ছাড়া আর কোনো উপাদানের দ্বারাই পুরোপুরি ও সম্পূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি করা যাবে না। অভিনয়ের দ্বারা নয়, গতিময়তার দ্বারা নয়, এমনকি শাদা-কালো কল্পমূর্তির দ্বারাও নয়।

একটার পর একটা 'অলংকৃত' শব্দ দিয়ে আবেগবহুল বর্ণনা অনেক হল।

এখন চিত্রনির্মাণ কর্মে বর্ণ ব্যবহারের যে প্রায়োগিক দিক, সেই বিশুদ্ধ গদ্যের আলোচনায় আসা যাক।

(আমরা যখন ছায়াছবিতে রঙের সমস্যা উপস্থাপন করি আমাদের সবচেয়ে প্রথম নির্দিষ্ট রঙটির ভাবার্থ ও ভাবানুষঙ্গের কথা ভাবতে হয়। সেক্ষেত্রে উপদেষ্টার মতো আমি বলছি, ইন কালার; কালারড্ নয়: নিছক রঙিন নয়, অর্থপূর্ণ ভাবে রঙে করা। প্রাকৃতিক ও চিত্রগতভাবে যা রঙিন তা থেকে আলাদা করার জন্য এই বাগ্‌ধারা। আমরা কখনই পর্দার দৃশ্যগত গাম্ভীর্যকে হঠাৎ এক টুকরো জমকালো ছাপা কাপড় বা জমকালোভাবে রঙ করা পোস্টকার্ডে পরিবর্তিত করতে পারি না। আমরা পর্দায় এইরকম পোস্টকার্ড দেখতে চাই না। আমরা চাই যে এই নতুন আঙ্গিক ইমেজ ও থিম, বিষয়বস্তু ও নাটক, ঘটনাধারা ও সংগীতের সঙ্গে গঠনগত ঐক্য রেখে রঙকে দেখাবে। এগুলির সাথে একত্রিত হয়ে রঙ ফিল্মের প্রভাবময়তা ও চিত্ররীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হবে।

একটি প্রকৃত সাংগঠনিক বর্ণচেতনা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের চলচ্চিত্রে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, এটি শাদা-কালো সিনেমার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই বিকাশ লাভ করেছে এবং এমন অনেক

চলচ্চিত্রশিল্পী আছেন যাঁদের রঙ এবং কীভাবে তা ব্যবহার করতে হবে তার সম্বন্ধে সত্যিকারের জ্ঞান রয়েছে এবং প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে নিখুঁত আমেরিকান ছবিগুলিতে আমরা রঙের যে-প্রয়োগ দেখি ছবিতে রঙের কাজ তা নয়।)

ছবিতে 'বর্ণরেখা' প্লটের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয়। ফিল্মের প্রকাশময় পদ্ধতিগুলির নাটকীয় কাউন্টার পয়েন্টে আর একটি স্বাধীন উপাদান হিশাবে। এখন আমরা দেখব এটা কীভাবে হয় এবং তা হওয়ার জন্য কী প্রয়োজন—কীভাবে 'বর্ণকল্পমূর্তি' আলাদা 'প্রতিনিধিত্বকারী রঙিন বস্তু' ও 'রঙিন চিত্ররূপ' থেকে, সমগ্র ফিল্মের 'বর্ণাঙ্গিকরেখা'র প্রয়োজনে তা কীভাবে সামগ্রিক বর্ণপ্রকল্প নির্ধারণ করে।

রঙের নাটকীয় ভূমিকার দুটি দিক রয়েছে : বর্ণোপাদানকে নির্দিষ্ট নাটকীয় কাঠামোর (ফিল্মের সার্বিক কাঠামো এর দ্বারাই নির্ধারিত হয়) সঙ্গে খাপ খাওয়ানো এবং এই কাঠামোর মধ্যে রঙের নাটকীয় প্রকাশময়তাকে ভালো করে বুঝে ওঠা (এই ক্ষমতার জন্যই রঙের ব্যবহার প্রকৃতির রঙের নিছক অনুকরণের চাইতে বেশি কিছু)।

প্রকৃতিতে ও ঐতিহ্যে রঙের যে সত্তা আমরা পাই তা, ও রঙের প্রকাশময়তার একটি নির্দিষ্ট জগৎ গড়ে তোলা—এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। নিজের ভাবনা ও অনুভূতিকে প্রকাশ করার জন্য শিল্পী 'প্রকৃতিতে আছে' এমন বর্ণবিন্যাস থেকে শুরু করে 'প্রকৃতিতে নেই' এমন বাস্তবাতীত বর্ণবিন্যাস সৃষ্টি করেন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে রঙকে বিচার করলে আমরা দেখি, রঙকে সৃজনশীলভাবে আয়ত্ত করতে গেলে আমরা সেই একই সমস্যার সম্মুখীন হই মনতাজকে, বা পরে সবাক চিত্রে অডিও-ভিসুয়াল সম্পর্ককে, আয়ত্ত করতে গিয়ে আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম।

তা হল 'একটি নির্দিষ্ট কোণ থেকে চিত্রগ্রহণ' হতে আমরা যখন 'মনতাজ ফোটোগ্রাফি'তে এলাম তখন সেই রূপান্তরের মূল তাৎপর্য কী ছিল সেটা অনুধাবন করা।

তা হল নিষ্ক্রিয় প্রতিরূপ থেকে সপ্রাণ সক্রিয় কল্পমূর্তিতে আসা। জীবন, কর্ম, ইতিহাস, প্রকৃতি, ঘটনা ও মানবীয় আচার আচরণ বিষয়ক বিবিধ প্রতীতির নির্জীব প্রতিনিধিত্ব থেকে তার সচেতন প্রতিফলনে আসা।

নিষ্ক্রিয় প্রতিরূপ যেন 'যেমন আছে যেভাবে আছে' ক্যামেরায় সেরকম তুলে নেওয়া আলপটকা কিছু শট, যেখানে উপাদানগুলির সম্পর্ক ও বিন্যাস শিল্পীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, ঘটনাচক্রে যা আছে তেমনই হয়, যেখানে মূল উদ্দেশ্যের উপর জোর পড়ে না, যেখানে প্রধান আর অপ্রধান একসঙ্গে মিশে থাকে।

মনতাজ পদ্ধতির বিকাশে বিভিন্ন শটকে পৃথক পৃথক উপাদানে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। আয়তনের আধিক্য বা ক্ষুদ্রতা অনুসারে উপাদানগুলিকে দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন ঘাত ও মাত্রার গুরুত্ব। তাদের মধ্যে নতুন ধারাবাহিকতা ও সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছিল। এই সমস্ত কিছু করা হয়েছিল একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে—নিষ্ক্রিয় উপস্থাপনাকে সক্রিয় ও নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতে রূপান্তরিত করা, যার মধ্য দিয়ে বিশেষ একটি প্রতীতির প্রতি শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি ও তার প্রকাশ ধরা পড়বে।

যে প্রতীতিটি উত্থাপিত হচ্ছে তার প্রতি শিল্পীর প্রতিন্যাস সচেতনভাবে সৃজনশীল হতে পারে একমাত্র তখনই যখন এই প্রতীতির সঙ্গে ঘটনাচক্রে জড়িয়ে থাকা অন্যান্য প্রতীতিগুলিকে পৃথক করে ফেলা হয় ও শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়।

তাহলেই মনতাজ পদ্ধতি চলচ্চিত্রসম্মত প্রকাশময়তার একটা উপায় হয়ে ওঠে।

অডিও-ভিসুয়াল ইমেজের ক্ষেত্রেও তাই হয়।

অডিও-ভিসুয়াল মনতাজ পদ্ধতির সূচনা হয় তখনই যখন বিভিন্ন প্রতীতির মধ্যকার অতি প্রত্যক্ষ সম্পর্কগুলি আপনা আপনি প্রতিফলিত হওয়ার পর, পরিচালক তাঁর উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ইত্যাদি অনুসারে, প্রতীতিগুলির মধ্যকার বিশেষ-বিশেষ সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেন।

প্রতীতিগুলির মধ্যকার শাদামাটা ধরতাই সম্পর্ককে এখানে বাতিল করা হয় এবং 'বস্তুগত ধারাক্রম' অস্বীকার করে থিমের প্রয়োজন অনুসারে একটি নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়। অডিও-ভিসুয়াল সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটা খুব স্বাভাবিক, কেননা এখানে আমাদের ফিল্‌মের দুটো ফিতের মধ্য দিয়ে (দৃশ্যের ফিতে ও শব্দের ফিতে) দুটি আলাদা বিষয়কে সংযুক্ত করতে হচ্ছে।

এই দুই ফিতের নিজেদের মধ্যকার সংযোগ ও অন্যান্য সাউণ্ড ট্র্যাকের সঙ্গে সম্পর্ক নানাবিধ হতে পারে এবং তার ফলে অডিও-ভিসুয়াল ইমেজের পদ্ধতি আরও জটিল, সমৃদ্ধ ও থিমের পক্ষে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এর ফলে নিষ্প্রাণ 'বস্তুগত ধারাক্রম'-এর বদলে পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ভিন্ন ও উদ্দেশ্যাত্মক এক ধারাক্রম প্রতিষ্ঠিত হয়।

ছবিতে রঙের প্রয়োগের সময় এ-সমস্ত কথাই মনে রাখতে হবে। পূর্ববর্তী ধাপগুলি নিয়ে আমি এত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলাম এই কারণে যে, বর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া কীভাবে কাজ করে তা পুরোপুরি বুঝে ওঠা না গেলে গোটা ফিল্‌ম্ জুড়ে 'বর্ণোপাদানের তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ' সম্ভব নয় এবং এই প্রক্রিয়ার সাহায্য ছাড়া চলচ্চিত্রে 'বর্ণোপাদানের বিকাশ'-এর সবচেয়ে প্রাথমিক সূত্রগুলোও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

রঙিন ছবির প্রয়োজনা অর্থহীন যদি না আমরা বুঝতে পারি যে, গোটা ফিল্‌ম্ জুড়ে 'বর্ণরেখা' 'সংগীত রেখা'-র মতোই স্বাধীন ও সম্পূর্ণভাবে অগ্রসর হয়। কিন্তু দৃশ্যরূপের 'রেখার' মধ্য দিয়ে 'বর্ণরেখা'-র বিকাশ অনুভব ও অনুধাবন করা যথেষ্ট কঠিন, যদিও 'বর্ণরেখা' ও 'সংগীতরেখা' উভয়ই দৃশ্যরূপের রেখার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ অগ্রসর হয়।

এবং এই অনুভব ছাড়া ও তা থেকে বর্ণগত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে যে-সমস্ত প্রত্যক্ষ পদ্ধতির জন্ম হয় সেগুলি ছাড়া রঙ নিয়ে কোনো ব্যবহারিক কাজ করে ওঠা সম্ভব নয়।

চিত্রপরিচালককে মনস্তাত্ত্বিকভাবে আয়ত্ত করতে হবে 'পৃথকীকরণ'-এর পদ্ধতি, যা মনতাজ প্রক্রিয়ার ও অডিও-ভিসুয়াল সংযোগের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের কাজে অবশ্য প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে 'পৃথক' করতে হবে বস্তুবর্ণ ও 'বর্ণানুষঙ্গ'কে, যদিও রঙ সম্পর্কে আমাদের ধারণায় এই দুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে আছে।

ঠিক যেমন শব্দ ও তার উৎসের মধ্যকার শাদামাটা ধরতাই সম্পর্ককে বাতিল করার পরই তা প্রকাশময়তার একটি উপাদান হয়ে উঠেছিল, তেমনি 'কমলা রঙ'-এর ধারণাকে কমলালেবুর রঙের অনুষঙ্গ থেকে অবশ্যই পৃথক করতে হবে, একমাত্র তাহলেই রঙ হয়ে উঠবে প্রকাশ ও অনুভবের সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রিত কোনো পদ্ধতির অংশবিশেষ। এক টুকরো লনের ওপর তিনটে কমলালেবুকে যতক্ষণ না আমরা ঘাসের মধ্যকার তিনটে বস্তু এবং সবুজ পৃষ্ঠভূমির বুকে তিনটে কমলা ছোপ হিশেবে চিহ্নিত করতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত রঙের কম্পোজিশন নিয়ে আলোচনা করে কোনো লাভ নেই।

কেননা এই ক্ষমতা অর্জন করতে না পারলে, রঙের কম্পোজিশনের দিক থেকে এই তিনটি কমলালেবুর সঙ্গে সবজে-নীল জলের বুকে ভাসমান দুটো কমলা রঙের বয়ার কী সম্পর্ক তা বুঝে উঠতে পারব না। রঙের উপাদান থেকে উপাদানে রূপান্তরের ফলে সৃষ্ট গতিময়তা কীভাবে ক্রমবৃদ্ধি পাচ্ছে তা বুঝতে পারব না। রঙ পাল্টে যাচ্ছে টাটকা কমলা থেকে লালচে কমলায়, এবং ঘাসের সবুজ, জলের নীলচে সবুজ হয়ে জলের বুকে আকাশের পৃষ্ঠভূমিতে লালচে কমলা

বয়াদুটিকে করেছে লাল পপির মতো উজ্জ্বল। আকাশ ও জলে যেমন নীলের সঙ্গে সবুজের সামান্য আভা লেগেছে তেমনি তাজা সবুজ ঘাসে, যত সামান্যই হোক না কেন, নীলের ছিটেফোঁটা লেগেছিল।

মনে রাখা দরকার, রঙ পাল্টালেই লন আকাশ হয়ে যায় না বা কমলালেবু হয়ে পড়ে না পপি।

কমলাকে লালচে কমলা হয়ে হতে হয় লাল এবং নীলের ফোঁটাযুক্ত তাজা সবুজ নীলচে সবুজ হয়ে হয়ে ওঠে আকাশি নীল।

এই ধরনের কোনো না কোনো কারণেই আমরা একসারি বস্তুর প্রয়োজন বোধ করি; তিনটে কমলালেবু, দুটি বয়া ও পপিদুটি রঙের একটি সাধারণ গতিময়তার দ্বারা ঐক্যবদ্ধ ও এই ঐক্যের কাজে সাহায্য করেছে পৃষ্ঠভূমির বর্ণবিন্দুগুলি। অতীতে ঠিক এরকমই ঘটত যখন এই ঐক্যের পরিকাঠামো হিশেবে স্থির দৃশ্যে আমরা ব্যবহার করতাম শাদা-কালো ফোটোগ্রাফির ধূসরতার টোন ও আউটলাইনকে যা আকাশের মেঘ, গাছের ডালপাতা ও নায়িকার গায়ের চাদরের নকশার বর্ণবিভেদের মধ্যে সুষম ভারসাম্য নিয়ে এসে একটা ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড দৃশ্যরূপ সৃষ্টি করতে পারত। আর গতিশীল দৃশ্যে ব্যবহার করা হত শট থেকে শটে সুচিন্তিতভাবে বর্ধিত টেম্পোকে।

বিশুদ্ধ দৃশ্যগত স্তরে এটাই ঘটে। অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন দৃশ্যগত স্তরে।

এ-রকমই ঘটে যখন বর্ণগত গতিময়তা রঙের নিছক পরিবর্তনে আবদ্ধ না থেকে কল্পমূর্তিগত তাৎপর্য পায় এবং বিভিন্ন আবেগানুভূতি প্রকাশের কাজে অংশগ্রহণ করে।

তাহলেই কালার স্কেল বা বর্ণলিপি তার মতো করে সংগীতের স্বরলিপির অনুরূপ হয়ে উঠবে, যে স্বরলিপি ঘটনা ও দৃশ্যরূপকে আবেগগতভাবে রঙিন করে এবং বর্ণলিপির বিকাশের সূত্রগুলি সমগ্র বর্ণপ্রতীতি জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে।

তাহলেই বর্ণবিন্যাস প্রতীকী চরিত্র পায়, রঙ মোটিফ হয়ে ওঠে।

তাহলেই বক্তব্য বা ব্যঞ্জনা অনুসারে একটি রঙ আর একটি রঙের সঙ্গে প্রতিধ্বনির বা প্রতিবাদের সূত্রে যুক্ত হতে পারে।

তাহলেই লাল-কালো বর্ণবিন্যাসের পর আসা নীল-হলুদ বর্ণবিন্যাস তুলে ধরতে পারে আনন্দময় জীবনের পরিমণ্ডল।

এবং তাহলেই রঙের লীট-মোটিফগুলির মধ্য দিয়ে প্রতিভাত থিম বর্ণলিপির মাধ্যমে এবং অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্যে প্রকাশ করতে পারে একটি অন্তর্নিহিত নাটকীয়তাকে। যে নাট্যক্রিয়া ফিল্মের সমগ্র রূপরেখার ভিতর তার নিজস্ব নকশা গঠন করে, যে নকশা অ্যাকশনের ধারাকে ছেদ ও পুনর্চ্ছেদ করে বারবার ও নানাভাবে। যে কাজ যথাযথ ভাবে শুধু সংগীত করতে পারত এতদিন; অভিনয় বা অভিব্যক্তির দ্বারা যা প্রকাশ করা যায় না সংগীত তা প্রকাশ করত। শুধু সংগীতই কোনো দৃশ্যের অন্তর্নিহিত সুর বা কাব্যগুণকে একটি সম্পূর্ণ ও ফলপ্রদ অডিও-ভিসুয়াল ভাবাবহে উত্তীর্ণ করতে পারত।

আজ এই কাজ নীতিগতভাবে রঙের পক্ষেও করা সম্ভব।

পদ্ধতিগতভাবে তা কী করে হয় সেটা প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিয়ে দেখানো যায়।

'আইভান দি টেরিব্‌ল্'-এর রঙিন দৃশ্যপর্যায়টি তার উদাহরণ।

(সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত)

অনুবাদ : সুতপা সেনগুপ্ত

সুব্রত মিত্রের সঙ্গে মৃণাল সেনের সাক্ষাৎকার

আপনি কি ন্যাচারিলিস্টিক লাইটিং পছন্দ করেন, না কি প্রতিটি দৃশ্যের তাৎপর্য ও মেজাজ অনুযায়ী বিশেষভাবে লাইটিং করেন?

আমি সাধারণভাবে ন্যাচারিলিস্টিক লাইটিং-এই বিশ্বাসী। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই আলোর ব্যবহার গল্পের যথাযথ পরিবেশনায় সাহায্য করে থাকে, কারণ আমরা সকলেই তো এক ধরনের illusion বা মায়া তৈরি করতে ভালোবাসি। একটি রিয়ালিস্টিক ছবিতে পরিচালক, ক্যামেরাম্যান, অভিনেতা এঁরা সবাই মিলে বাস্তবের মায়া (illusion of reality) তৈরি করতে চেষ্টা করেন। স্টাইলাইজড ছবির ক্ষেত্রে তা সাধারণত হয় না, কারণ সেখানে এমনই সব লাইটিং প্যাটার্ন তৈরি করা হয়, যা বাস্তব জীবনে দেখা যায় না, যা শুধুমাত্র সিনেমাতেই সম্ভব; যা গল্পের প্রয়োজনে যেমন ব্যবহার করা যায়, তেমনই আবার শুধুমাত্র ওইভাবে আলো ব্যবহার করার জন্যই প্রয়োগ করা হয়, বাস্তবের মতো হয়ে ওঠার কোনো দায় তার মধ্যে থাকে না।

ন্যাচারিলিস্টিক লাইটিং নিয়ে কাজ করার সময় ক্যামেরাম্যানকে তিনটে জিনিস মাথায় রাখতে হয়। তার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল source of light বা আলোর উৎস— যা একটা নির্দিষ্ট দৃশ্যের নির্দিষ্ট সেটকে আলোকিত করে। যেমন ধরুন দিনের বেলায় ঘরের ভেতরের দৃশ্যে আসবাবপত্র, দেওয়াল, অভিনেতা সহ ওই সেটের প্রায় সবকটি উপকরণকে আলোকিত করার জন্য ক্যামেরাম্যানকে সেই নির্দিষ্ট জানলার কথা মাথায় রাখতে হবে যার ভেতর দিয়ে দিনের আলো ঘরের ভেতর ঢুকছে। আবার রাতের দৃশ্যে যেখানে শুধু একটাই বাতি দেখানো হচ্ছে, সেখানেও ক্যামেরাম্যানকে সেই বাতির আলো অনুযায়ী লাইটিং করতে হবে। যদি ঘরটা অন্ধকার হয়, যেখানে শুধু আশেপাশের ঘর থেকে অথবা রাস্তার বাতি থেকে আলোর ছটা এসে পড়েছে সেখানে ক্যামেরাম্যানের কাজ হতে পারে সবকিছু দেখানো অথবা বেশি কিছু না দেখানো। তার জন্য তাঁকে বাস্তবে ঘরের বিভিন্ন অংশে যেভাবে আলো এসে পড়ে তা খুঁটিয়ে দেখে তাকেই ফোটোগ্রাফিতে নতুন করে তৈরি করতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয় হল brightness of the image বা চিত্রের উজ্জ্বলতা। কীভাবে সেই ঘরের ছবি তোলা যাবে যেখানে কোনো আলো নেই? আপনি দর্শককে কতটা দেখাতে চাইবেন? অন্ধকারেরও বিভিন্ন shade বা মাত্রা থাকে। ক্যামেরাম্যান ইচ্ছে করলে সেই দৃশ্যকে এতটাই

অন্ধকার করে তুলতে পারেন যাতে দর্শক কোনোক্রমে শুধু আঁচ করতে পারেন যে সেই ঘরে দুজন লোক রয়েছে। হয়তো পরিচালক সেটাই চেয়েছেন, তিনি সংলাপ অথবা শব্দের ওপরেই জোর দিতে ইচ্ছুক। অথবা এমনও হতে পারে যে ক্যামেরাম্যান দৃশ্যটাকে খুব বেশি অন্ধকারাচ্ছন্ন করলেন না, কারণ পরিচালক নায়িকার মুখটা দেখাতে চাইছেন। যদিও এটা ঠিক যে deep darkness বা গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্নতা এবং light darkness বা হালকা অন্ধকারাচ্ছন্নতা, এই দুটোই 'আলো নেই' বা আলোহীনতার শ্রেণীতে পড়ে।

লাইটিং-এর তৃতীয় বিষয় হল quality of light বা আলোর চরিত্র; সেটা একটা হার্ড শ্যাডো তৈরি করতে পারে, এমন concentrated বা কেন্দ্রীভূত আলোকরশ্মি হতে পারে যা সবকিছুতেই হাই কনট্রাস্ট এনে দেয়; অথবা সেটা হতে পারে সফ্‌ট ডিফিউজড শ্যাডো-লেস বা ছায়াহীন আলো, যা কোনোরকম ছায়াই ফেলে না, অথবা তা ফেললেও সে ছায়া অতি সামান্য এবং সবকিছুই মোলায়েম আভাসে ধরিয়ে দেয়, যেমন ধরুন সূর্যের যে আলো ঘরের মধ্যে ঢোকে তা ডায়রেক্ট লাইট বা প্রত্যক্ষ অভিঘাত হতে পারে অথবা সফ্‌ট ডিফিউজড দিনের আলো অথবা পাশের ঘর থেকে আসা যে আলো ঘরের দেওয়াল থেকে প্রতিফলিত হয়ে ঘরটাকে মোলায়েম করে আলোকিত করে।

এখন আমাদের এটা ভাবতে হবে যে কোনটা বেশি দরকার, বাস্তবে যে আলো দেখি স্টুডিওতে কি তাকেই নতুন করে তৈরি করা হবে না কি দৃশ্যের mood বা মেজাজ অনুযায়ী ক্যামেরাম্যান আলো করবেন? আমার মতে ন্যাচারিলিস্টিক লাইটিং কোনো মেজাজ তৈরি করতে বাধা দেয় না, বিশেষ করে আবেগতাড়িত কোনো মেজাজ অথবা দিন, রাত, প্রভাত বা সন্ধ্যার নির্দিষ্ট মেজাজ। আসল কথা হল লাইটিং করার আগে পরিচালক ও ক্যামেরাম্যানকে দৃশ্যের নির্দিষ্ট আবেগ অনুযায়ী আলোর উৎস ঠিক করতে হবে। যদি পরিচালক মনে করেন যে একটি ঘরের darkness বা অন্ধকারাচ্ছন্নতা বা ভারী ভাবাচ্ছন্নতা দৃশ্যের মেজাজের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়, তাহলে তিনি অভিনেতার কাছাকাছি রাখা একটি টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিতে পারেন, ক্যামেরাম্যানকে তখন সেই অনুযায়ী আলো করতে হবে। অথবা পরিচালকের এই স্বাধীনতা আছে যে তিনি অন্ধকারাচ্ছন্নতাকে পুরোপুরি বাতিল করে, bright বা উজ্জ্বল দিনের উচ্চগ্রামের gay বা আনন্দোচ্ছল দৃশ্য রচনা করতে পারেন। তাই বলে যে-কোনো লাইটিং স্টাইলের ক্ষেত্রেই gaiety বা উচ্ছলতা এবং brightness বা উজ্জ্বলতা, sorrow বা দুঃখ এবং darkness বা অন্ধকারাচ্ছন্নতা অবশ্যম্ভাবী উপাদান হবে, এমন কোনো কথা নেই।

বাস্তব জীবনেও আনন্দ ও দুঃখ, আলো ও অন্ধকার কোনো ছকে বাঁধা প্যাটার্ন মেনে আসে না। আসলে কোনো ছকে বাঁধা নিয়ম মেনে চলা খুবই কঠিন; 'রাশোমন' (*Rashomon*) ছবিতে মৃতের প্রেতাত্মাকে নিয়ে আসার দৃশ্যে কেউই অন্ধকারের অভাব অনুভব করে না। বেশির ভাগ ক্যামেরাম্যানই ঐ দৃশ্যে উজ্জ্বল 'হাই কি' বা উচ্চ গ্রামের আলোর প্রভাব আনার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না। একইভাবে 'দি ইনোসেন্ট' (*The Innocent*) ছবিতে দিনের বেলায় ঘরের ভেতরের বিশেষ আলোকবিন্যাস মুখগুলোকে overexposed দেখায়, চকের মতো শাদা দেখায়, যেখানে একই শটে জানলা দিয়ে দেখা ঘরের বাইরের দৃশ্যে বা এমনকী দিনের বেলায় তোলা বাইরের দৃশ্যতেও আধো অন্ধকারাচ্ছন্ন মেঘলা দিনের প্রভাব রয়েছে। প্রচলিত ধরনের বদলে এই অপ্রচলিত অবাস্তব আলোর ব্যবহার ভূতের গল্পের পটভূমিকা তৈরি করতে অত্যন্ত কার্যকর। অন্যদিকে 'পথের পাঁচালী' ছবিতে দুর্গার মৃত্যুর পরে কখনও সূর্য ওঠেনি। আমার মনে হয় সকলেই মেঘলা দিনের আলোয় অপু ও সর্বজয়াকে দেখে

বেদনা বোধ করেছে, চারপাশের গাছগাছালি, আকাশ ও নিসর্গ বোধ হয় ওই আলোতেই অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আউটডোর শ্যুটিং করার সময় আপনি কি প্রকৃতিতে যেমন আছে তেমনই ছবি তোলেন, না কি দৃশ্যের বিশেষ আবেগগত চরিত্র বিবেচনা করে প্রকৃতির উন্নতি ঘটান?

'প্রকৃতিতে যেমন আছে' বলতে আপনি ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন, আমি বুঝতে পারলাম না। প্রকৃতি অসংখ্য রূপে প্রতিভাত হয়, তার সেই প্রত্যেকটি রূপকে নানা বিচিত্র ভাবে আলোকচিত্রে ধরা যায়।

প্রথমত আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রকৃতির সব কিছুই সুন্দর নয়— বিশেষ করে ক্যামেরার চোখে। আমার প্রায়ই মনে হয়েছে যে কোনো একটা বিশেষ দৃশ্যে আকাশ গাঢ় নীলের বদলে পুরোপুরি শাদা হলে আরো সুন্দর দেখাত অথবা কোনো বিশেষ একটা দিনের বৃষ্টি ছবিতে ঠিক ধরা যাবে না। স্থির নিসর্গদৃশ্যে অবশ্য ঠিক ততটা অনিশ্চয়তা নেই। কিন্তু তবুও আমার মনে হয় যে সঠিক লোকেশন বাছাই ক..াটা ভীষণই প্রয়োজনীয়। যদি কোনো লোকেশন দৃশ্যের মেজাজকে ধরতে না পারে, তাহলে তার সামাল দিতে আমার বিশেষ কিছু করার আছে বলে আমি মনে করি না।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আলো। সঠিক লোকেশনই যথেষ্ট নয়, আলোটাও তার সঙ্গে সংগতিসম্পন্ন হতে হবে। প্রকৃতির ওপরে আমি ভীষণভাবেই নির্ভর করি, কারণ যেভাবে স্টুডিওতে আমি আলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি সেভাবে প্রকৃতির আলোকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এখানেও আবার বাছাই করার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কোনো দৃশ্যে নির্দিষ্ট একটা মেজাজ ফুটিয়ে তুলতে কোন আলোটা উপযুক্ত হবে? কোনটা ভালো— সূর্যের আলো না কি মেঘলা আবহাওয়া? যদি সূর্য থাকে তবে সে কি ভোরবেলার আবছা আলো না কি মাঝ দুপুরের, মাথার ওপরে জ্বলন্ত সূর্য? মেঘলা দিনের তুলনায় গোধূলির আলো (যে সময় রাস্তার আলোগুলোও জ্বলে ওঠে) কি বেশি ভালো?

ছবির বাজেট অবশ্য সবসময় এই বাছাই করার সুযোগ দেয় না। ধরুন, আমার কোনো একটা দৃশ্য সূর্যের আলোয় তুলব স্থির করেছি। অথচ সেদিনের আকাশ মেঘে ঢেকে গেছে; হিন্দি ছবির ইউনিট হলে সকলে তাস খেলা শুরু করে দেবে এবং কখন রোদ ওঠে তার অপেক্ষায় থাকবে, আর দশটার মধ্যে নটা বাংলা ছবিতেই পরিচালক বলবেন, 'চল আমরা এই দৃশ্যটা এই মেঘলা দিনেই শুট করি, এটাও খুব একটা খারাপ হবে না।' শেষ পর্যন্ত শ্যুটিং-এর মাঝপথে যখন রোদ উঠবে 'চল আজই আমাদের এই দৃশ্যটার শ্যুটিং শেষ করে ফেলি, তা না হলে অনেকেই আর পরে সময় দিতে পারবে না।' সান্ত্বনা একটাই, এখনকার হলিউডের ক্যামেরাম্যানদেরও আজকাল এই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। হলিউডের অনেক ছবিতেই একই দৃশ্যে আলোর অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে। যেহেতু আউটডোর বিভিন্ন আলোতে শ্যুটিং করার প্রচুর সুযোগ সুবিধে দেয় ফলে প্রকৃতিতে যেমনটি আছে ঠিক তেমনই শ্যুট করতে কেউ বাধ্য নয়। একই নিসর্গ বিভিন্ন আলোতে বিভিন্ন রকম দেখায়, ফলে যে কেউ তাঁর প্রয়োজনমতো আলোকে ব্যবহার করতে পারেন।

আর যে সব বিষয় ক্যামেরাম্যানকে মাথায় রাখতে হবে তা হল— র-স্টক, কোন ফিলটার

ব্যবহার করবেন (অথবা একেবারেই কোনো ফিলটার ব্যবহার না করা) এবং ল্যাবরেটরি প্রসেস—যার মাধ্যমে এক্সপোজ করা ফিল্ম চূড়ান্ত রূপ পায়। তবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল এক্সপোজার, আমার মতে এটাই একজন ক্যামেরাম্যানের হাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারগুলির মধ্যে অন্যতম। লাইটিং এবং এক্সপোজার আসলে একই জিনিস। একই লোকেশনে, একই আলোয়, একই মুখে বিভিন্ন ধরনের প্রভাব এবং মেজাজ তৈরি করা যায় আলাদা আলাদা এক্সপোজার দিয়ে। সেজন্যই বহু ব্যবহৃত কথা 'সঠিক এক্সপোজার'-এর কোনো অর্থই হয় না। একটা নির্দিষ্ট এক্সপোজার, আলোর নির্দিষ্ট অবস্থার ওপর নির্ভর করে, নির্দিষ্ট কতকগুলো shades of grey বা ধূসর মাত্রা তৈরি করতে পারে এবং সেখানে আরও কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যার অন্যতম হল প্রসেসিং ল্যাবের অবস্থা। আমাদের বাস্তব জীবনে যে ধূসর স্তর এবং রঙ আছে, এক্সপোজারের মাধ্যমেই তাদের শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়।

স্টুডিওর মধ্যে কাজ করার সময় ক্যামেরাম্যানকে সম্পূর্ণ অন্ধকার থেকে শুরু করে পুরো লাইটিংটা গড়ে তুলতে হয়। নায়িকার মুখে কতটা আলো পড়বে, ঘরে ঢোকার সময় কি নায়ককে দেখা যাবে, ঘরের কোণে কীভাবে আলো এসে পড়বে, এই সব কিছুই ক্যামেরাম্যানের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁকে প্রয়োজনমতো এই সব কিছুকেই আলোকিত করে তুলতে হবে।

আউটডোর শুটিং-এর সময় আবার পুরো কাজটাই আলাদা। সেখানে মূল লাইটিংটা তৈরি করাই থাকে। এখন তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই যে quality of light বা আলোর চরিত্র আমার যা দরকার তাই আছে, তাহলেও কিন্তু আমার উদ্দেশ্য পুরোপুরি মিটবে না। কারণ আমি তো প্রয়োজনমতো সূর্যকে নাড়াচাড়া করতে পারব না, যা আমার স্টুডিওর আলোর ব্যবস্থায় সম্ভব; সেক্ষেত্রে আমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সূর্যটা সরে আসে, অথবা এই ত্রুটি দূর করতে, দরকার হলে সূর্যের পরিপ্রেক্ষিতে ক্যামেরা ও অভিনেতাদের সম্পর্ককে যথাসম্ভব অদলবদল করে নিতে হবে।

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল mathematics of photography বা আলোকচিত্রের অঙ্কের হিসেব। সূর্যের কড়া আলো ও গাঢ় ছায়ার যে তফাৎ, তা সম্পূর্ণ ধরতে পারা আমাদের ফিল্মের ক্ষমতার বাইরে। আমি প্রকৃতির এই অসামঞ্জস্য কাটিয়ে ওঠার জন্য বাড়তি আলোকে কমিয়ে দিই এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে তাকে বাড়িয়ে দিই। যখন নায়ক উজ্জ্বল আলোতে এবং নায়িকা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকে তখন কম্পোজিশনে সামঞ্জস্য আনার জন্য আমি কৃত্রিমভাবে ছায়াতে আলোর পরিমাণটা বাড়িয়ে দিই। অথবা যখন দুজনেই ছায়ায় থাকে তখন আমি হয়তো এমনভাবে কেবল তাদেরই ওপর এক্সপোজ করি যে বাকি সবকিছু ওভার-এক্সপোজারে পুরোপুরি ধুয়ে যাবে। এর ফলে যে টোটাল ইফেক্ট তৈরি হবে তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্যাটার্নের দিক থেকে এবং আবেগ প্রকাশে খুবই হৃদয়গ্রাহী। এই প্যাটার্ন আমাদের বাস্তব জীবনে কখনই দেখা যায় না। ক্যামেরা এবং আমাদের চোখের মধ্যে অনেক মিল থাকা সত্ত্বেও টোনাল রেঞ্জে চোখের ল্যাটিটিউড বা বৈচিত্র্যক্ষেত্র যে-কোনো ফিল্ম-এর থেকে অনেক বেশি। মানুষের চোখ সূর্যের আলো এবং ছায়ায় থাকা কোনো জিনিসকে একই সঙ্গে দেখতে পায় এবং অন্য জিনিসগুলোকে তো মুছে দেয়ই না বরঞ্চ নায়ক নায়িকাকেও ঠিক যেমনটি আছে তেমনটিই দেখে। অনেক সময় মানুষের চোখের তুলনায় ফিল্মের এই দুর্বলতা শাপে বর হয়ে এমনই এক ফটোগ্রাফিক বাস্তবের জন্ম দেয় বাস্তব জীবনে যার কোনো তুলনা

হয় না।

এজন্যই প্রকৃতিতে ঠিক যেমনটি আছে তেমনই তুলে ধরতে হবে না কি তার চেয়েও উন্নত কিছু করতে হবে তার নির্দিষ্ট কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কখনও কখনও যে আলো পাওয়া যায় তারও পরে আরো ভালো কিছু করার প্রয়োজন হয় না। 'পথের পাঁচালী'-র ঐ দৃশ্যটা ধরুন, যেখানে আকাশ মেঘে ঢাকা, পাঠশালা থেকে বাড়ি ফেরার পথে অপু মুড়ি চিবোচ্ছে, তার মুখটার ওপর ছায়া পড়েছে। এক্ষেত্রে দুটো আর্ক ল্যাম্প ব্যবহার করেও কোনো বাড়তি সুবিধে হত না। বরঞ্চ তাতে ক্ষতিই হত। কিন্তু যে ফিলটার বা যে এক্সপোজার এই শটে ব্যবহার করা হয়েছে তা কোনোমতেই প্রকৃতির অঙ্গ নয়। ঐ একই শটে কেউ অন্য ফিলটার বা এক্সপোজার ব্যবহার করে অন্যরকম ফল পেতে পারেন। যেহেতু প্রকৃতির প্রতিরূপ তৈরি করার কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই সেহেতু বিভিন্ন টেকনিকাল উপাদান এবং ব্যক্তিবিশেষের ওপরেই তা নির্ভর করে এবং লোকেশন ও আলো বাছাই করার সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে বলে, আমি প্রকৃতিতে যেমন আছে তেমনই ছবিতে তুলব না কি প্রকৃতিকে পালটে আরো উপযোগী করে তুলব---একথার কোনো মানে হয় না।

আপনি কোথায় এবং কী কারণে নতুন টেকনিকাল মেথড উদ্ভাবন করেন এবং তার ফলে আপনার সহকর্মীদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়?

প্রত্যেক ক্যামেরাম্যানেরই কাজের একটা নিজস্ব ধারা আছে যা তার নিজস্ব বিশ্বাস ও রুচিবোধ থেকে জন্ম নেয়। একজন ক্যামেরাম্যান ভাবতে পারেন যে তিনি নায়িকাকে গ্ল্যামারাইজ করেই দর্শককে এবং সেইসঙ্গে নিজেকেও খুশি করতে পারেন। আবার অন্য আরেকজন বিশ্বাস করেন যে লাইটিং ও ফটোগ্রাফির প্রধান কাজ হল বিভিন্ন ধরনের মেজাজ ও অনুভব তৈরি করা। একথা আর বলে বোঝাবার কোনো দরকার নেই যে তাঁদের কাজের ধারা হবে সম্পূর্ণই আলাদা।

আমি নিজে মনে করি আমার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ টেকনিকাল উদ্ভাবন হল বাউন্স লাইটিং এর ব্যবহার, যা আমার মনে হয় ন্যাচারাল লাইটিং-এর প্রতি আমার ভালোবাসা থেকেই উদ্ভুত। ১৯৫৬ সালে 'অপরাজিত'-র শুটিং করার সময়ই প্রথম আমি এই লাইটিং মেথড ব্যবহার করি। বেনারসে বহির্দৃশ্য শুটিং করার পরে কলকাতায় স্টুডিওর মাঠে উঠোনসুদ্ধ একটি বাড়ির সেট তৈরি করার কথা ছিল যাতে বেনারসের ঐ ধরনের বাড়ির ভিতরের শ্যাডোলেস্ আলোর মতো আলো আমরা পেতে পারি। বেনারসের পুরোনো বাড়ির একটা বিশেষত্বই হল যে সেখানে সারাদিনে খুব সামান্য পরিমাণ সূর্যের আলো সরাসরি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, কখনও বা আদৌ সেটুকুও পারে না। যা আসে, তা হল শুধু মোলায়েম ছায়াহীন দিনের আলো। পরে বাধ্য হয়েই স্টুডিওর ভিতরে সেট তৈরি করা হয়। স্টুডিও ল্যাম্পের সাহায্যে ঐ বিশেষ ধরনের আলো নতুন করে তৈরি করা অসম্ভব বুঝেই আমি বিচলিত ছিলাম। এছাড়া আমি এটাও জানতাম যে স্টুডিওর ভেতর স্টুডিও লাইটের সাহায্যে ছবি তুললে স্টুডিওর দেওয়াল এবং মেঝে অবাঞ্ছিত ডাবল শ্যাডোতে ভরে যাবে। সেটা খুবই খারাপ দেখাবে যখন প্রকৃত লোকেশনে সেখানকার স্বাভাবিক ছায়াহীন আলোতে তোলা সরু গলির শটের সঙ্গে ইন্টারকাট করা হবে।

এরই সমাধান হল বাউন্স লাইটিং করে—একটি শাদা চাদরকে কৃত্রিম আকাশের মতো

করে টাঙানো হয়; বেনারসে উঠোনে যে আকাশ ছিল আলোর একমাত্র উৎস, তারই মতো এই নকল আকাশের নীচে স্টুডিও লাইট রেখে, ঐ আকাশ থেকেই তাকে বাউন্স করা হয়। ফলে ডায়রেক্ট লাইটে সেটাকে আলোকিত করার বদলে নকল আকাশ থেকে প্রতিফলিত শ্যাডোলেস সফ্‌ট ডিফিউজড লাইট পাওয়া যায়। এই প্রতিফলিত আলো ভীষণই কম এবং আমরা দ্রুত স্পীড-এর KODAK Tri-X Film ব্যবহার করেছিলাম যা সেসময় পাওয়া যেত।

এই ধরনের আলো প্রথমবার ব্যবহার করলাম বলে যতটা ভালো হতে পারত, তা করতে পারিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অনেকেই মনে করলেন যে আসল বেনারসেই শুট করা হয়েছে। অবশ্যই সেট সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। যদি সেটটা ঠিক বেনারসের বাড়ির মতো না হত তাহলে আমি কোনোমতেই বাস্তব বলে লোকের চোখে ধোঁকা দিতে পারতাম না। আবার যদি শুধু ডায়রেক্ট লাইটই ব্যবহার করা হত তাহলে সুন্দরভাবে ডিজাইন করা সেটটা ঐ বাস্তবভ্রম তৈরি করতে পারত না। আমরা 'অপরাজিত' থেকেই বাউন্স লাইট ব্যবহার করছি – বিশেষ করে স্টুডিওতে তোলা দিনের বেলার অন্তর্দৃশ্যে, কারণ এই আলো হল বাস্তব জীবনে দিনের বেলার অন্তর্দৃশ্যের আলোর সমান।

বাউন্স লাইট ব্যবহারের যুক্তি খুবই সরল। এটা অন্যরকম হত যদি জানলা দিয়ে প্রবেশ করা ডায়রেক্ট সূর্যের আলো তার কনসেনট্রেটেড রশ্মির সাহায্যে হার্ড শ্যাডো তৈরি করত। কিন্তু বাস্তব জীবনে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে জানলা দিয়ে ঢোকা আলো হল ডিফিউজড রিফ্লেক্টেড লাইট। সাধারণত আমরা স্টুডিওতে যে আলো ব্যবহার করি তার ধরনটা সূর্যের আলোরই মতো—দুটোই কনসেনট্রেটেড আলোর রশ্মি তৈরি করে যার ফলে হার্ড শ্যাডো তৈরি হয়। এই হার্ডনেসকে দূর করার জন্য ক্যামেরাম্যানেরা সাধারণত আলো এবং ক্যামেরার লেন্সে ডিফিউজার ব্যবহার করে আসছেন। কিন্তু ঘরের ভেতরে যে ছায়াহীন আলো পাওয়া যায় ঐ পদ্ধতিতে তা কোনোভাবেই পাওয়া যায় না। আবার একজন ক্যামেরাম্যান হিসেবে আমি যদি দিনের বেলায় অন্তর্দৃশ্যে সূর্যের আলো এবং সাধারণ ডিফিউজড আলোর পার্থক্য না বোঝাতে পারি সেটা হবে একটা বিরাট ব্যর্থতা।

আমার মনে হয় নির্দিষ্ট কয়েকটা ইফেক্ট তৈরি করার জন্য বাউন্স লাইটিং-এর ব্যবহার নিঃশর্তভাবে প্রয়োজনীয়। যেমন ধরুন গোধূলিবেলার ঘরের ভেতরের দৃশ্য যেখানে প্রায় অন্ধকার ঘরে হয়তো কোনো আলোই নেই। জানলার ভেতর দিয়ে একটু আলোর ছটা এসে চার পাশের কয়েকটা জিনিসকে আলোকিত করে। কোনো একজন এই ইফেক্ট আনতে গিয়ে জানলার বাইরে থেকে ডায়রেক্ট লাইট ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু তাঁকে ভালো ফল পেতে হলে অবশ্যই রিফ্লেক্টেড লাইট ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ করে যদি ডায়রেক্ট লাইটে তোলা সন্ধ্যার অন্তর্দৃশ্য লোকেশনে পাওয়া আলোয় তোলা সন্ধ্যার বহির্দৃশ্যের সঙ্গে ইন্টারকাট করা হয় তাহলে ঘরের ভেতরটা ভীষণই বেমানান লাগবে।

'আমেরিকান সিনেমাটোগ্রাফার'-এ বার্গম্যানের ক্যামেরাম্যান Sven Nykvist-এর একটা প্রবন্ধ পড়ে আমি ভীষণ উদ্দীপিত হয়েছিলাম। তিনি লিখেছেন : 'সিনেমাটোগ্রাফার হিসেবে আমার কাজ বলতে চল্লিশটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র। এখন আমি যখন ফিরে তাকিয়ে ঐ চল্লিশটি কাহিনীচিত্রের নানা জটিল অভিজ্ঞতা মনে ফিরিয়ে আনি, তখন মাঝে মাঝেই আমি গ্লানি বোধ করি। আমার মনে পড়ে যায় সেই সব যথার্থই আলোকিত স্পট এবং সেটের দেওয়ালে ঝাঁকে ঝাঁকে পড়া ডাবল শ্যাডোর কথা।' এই মন্তব্য আমার ভীষণই ভালো লেগেছিল। ১৯৬১ সালে *The Communicants* ছবির শুটিং-এর আগে নিকভিস্ট এবং

বার্গম্যান Dalecarlia-র বিভিন্ন চার্চ খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তখনই নিকভিস্ট ইনডায়রেক্ট শ্যাডোলেস লাইটের প্রয়োজন অনুভব করেন। এবং পরে স্টুডিওর মধ্যে চার্চের অন্তর্দৃশ্যের ছবি তোলার সময় প্রচুর বাউন্স লাইটিং-এর ব্যবহার করেন।

এখন অনেকে মনে করেন যে আমি শুধুই বাউন্স লাইট পছন্দ করি। এটা ঠিক নয়। রাতের বেলায় অন্তর্দৃশ্য শ্যুটিং করার সময় আমি অনেক ডায়রেক্ট আলো ব্যবহার করেছি। যদিও বেশির ভাগ সময়েই ফিল-ইন-লাইট হিসেবে ইনডায়রেক্ট লাইটের ব্যবস্থা ছিল। আসলে ডায়রেক্ট এবং ইনডায়রেক্ট লাইটের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। সেজন্য একটার থেকে অন্যটা বেশি ভালো একথারও কোনো যুক্তি নেই। উলটো দিক থেকে বাউন্স লাইট কখনই ব্যবহার না করাটাও অযৌক্তিক।

প্রকৃতির আলোর মতো হয়ে ওঠার ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গেই বাউন্স লাইটিং-এর রয়েছে এক সূক্ষ্ম শৈল্পিক মাত্রা। কেবলমাত্র তার বাস্তবতা গুণের জন্য নয়, বরং এই শিল্পগুণের আকর্ষণেই আর্ভিং পেন বা রিচার্ড অ্যাভেডনের মতো স্থিরচিত্র ফটোগ্রাফাররাও বাউন্স লাইটিং ব্যবহার করেছেন। আমার তো মনে হয়, কেউ যদি স্টুডিওর ভিতরে কেবলমাত্র ডায়রেক্ট লাইট-এই কাজ করে যান, তা যেন কোনো বর্ষার দিন, বা মেঘলা আকাশ বা প্রভাত বা গোধূলির যাবতীয় সূক্ষ্ম আলোছায়ার বৈচিত্র্য উপেক্ষা করে কেবলমাত্র কড়া সূর্যের আলোতেই প্রকৃতির ছবি তুলে যাওয়া। কুয়াশার দিনে ছবি তোলায় তাঁর আপত্তি, মেঘলা দিনের কবিতায় অনীহা।

বাউন্স লাইটিং-এর অনেক গুণাগুণ থাকা সত্ত্বেও এটা বিভিন্ন অসুবিধে থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। কখনও কখনও এই আলো করতে অনেক বেশি সময় চলে যায় (যদিও অনেক সময় আবার তাড়াতাড়িও হয়), কখনও শ্যুটিং-এর সময় অনেকটা জায়গা দখল করে, ফলে ক্যামেরা মুভমেন্ট সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। 'চারুলতা' শুরু করার আগে সত্যজিৎ রায়ের ইচ্ছে ছিল যে আমাদের এমন এক পদ্ধতির কথা চিন্তা করতে হবে যাতে ক্যামেরা মুভমেন্টের জন্য অনেকটা জায়গা পাওয়া যায়। আমি এই সীমাবদ্ধতা জানা সত্ত্বেও বাউন্স লাইটিং-কে পুরোপুরি বাদ দিতে রাজি ছিলাম না। একই সঙ্গে আমি অন্য কোনো উপায় খুঁজছিলাম যাতে আলোকে বাউন্স না করিয়েও একই ফল পাওয়া যায়। যে পদ্ধতিকে আমার সব থেকে সরল ও সুবিধাজনক বলে মনে হয়েছিল আমি তাই করার চেষ্টা করেছিলাম এবং তাতেই সার্থকতা লাভ হয়। প্রায় ৩'×২' একটা কাঠের বাক্স সহজেই বানানো গেল। বাড়িতে যে সাধারণ ১০০ ওয়াটের বাল্‌ব্ ব্যবহার করা হয়, তারই বত্রিশটা তার মধ্যে সারিবদ্ধভাবে বসানো হল। বাক্সের খোলা দিকে টিস্যু কাগজ লাগিয়ে দেওয়া গেল। প্রত্যেক সারির জন্য আলাদা সুইচ দেওয়া হল। পুরো বাক্সটাই দু কিলোওয়াটের সাধারণ লাইটস্ট্যাণ্ড-এ রাখা যায়। এই বাক্সগুলোকে এর থেকে ছোটো সাইজের তৈরি করা যাবে না, কারণ শ্যাডোলেস কোয়ালিটির আলো অনেকটাই নির্ভর করে আলোর উৎসের পরিসরের ওপরে। সাদামাটা কাঠের বাক্স থেকে নির্গত এই সফিস্টিকেটেড শ্যাডোলেস আলো আশ্চর্য মনোরম দেখায় এবং তার জন্য বিদেশি মুদ্রাও খরচ হয় না।*

'চারুলতা' থেকেই আমরা সেভাবে বাউন্স লাইটিং-এর ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গেই কাঠের বাক্সে তৈরি 'কৃত্রিম বাউন্স লাইটিং' ব্যবহার করে বিপুল সাফল্য পেয়েছি। এই মুহূর্তে কলকাতার প্রায় সব স্টুডিওতে এই সস্তার বাক্স খুবই ব্যবহার করা হয়।

---

* এই অবধি প্রয়াত সুব্রত মিত্র তাঁর সম্পাদনা সম্পন্ন করেছিলেন।

একটা ছবিতে সংগীত কি কোনোভাবেই লাইটিং স্কীম বা ক্যামেরার কাজকে নির্ধারিত করে?

নিজেরই তোলা ছবি শেষ হওয়ার পরে দেখে আমার অনেক সময়ই মনে হয়েছে যে সংগীত পরিচালকদের ভূমিকা ক্যামেরাম্যানদের তুলনায় অনেক সুবিধেজনক। পুরো ফিল্ম ইউনিটের মধ্যে তিনিই হলেন একমাত্র ব্যক্তি যাঁর নিজের কাজ শুরু করার আগেই ছবিটা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা হয়ে যায়। পরিচালক, অভিনেতা, ক্যামেরাম্যান কী মেজাজ তৈরি করতে চেয়েছিলেন, সে সম্পর্কে কোনো আন্দাজ করার প্রয়োজন তাঁর নেই। তিনি পুরো ব্যাপারটাই নিজের চোখে দেখতে পান। ক্যামেরাম্যানের এই সুযোগ নেই। লাইটিং বিন্যাসের আগে যদি তাঁর জানার সুযোগ থাকত শেষ পর্যন্ত কোন শব্দ কোন ভিজ্যুয়াল-এর সঙ্গে যোগ করা হবে তাহলে তাঁর কাজটা আরো ফলপ্রদ হতে পারত। তাতে কাজ সম্পূর্ণ হলে সামগ্রিক অভিঘাত কী হবে, তারও একটা ভালোই ধারণা পাওয়া যেত।

একজন অভিনেতা overact বা অতিঅভিনয় বা underact বা প্রয়োজনের তুলনায় কম অভিনয় করতে পারেন। লাইটিং এবং ক্যামেরাম্যানের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য। অভিনেতার মতো তাঁকেও নিজের কাজকে সংযত রাখতে হয়। নিজের কাজ সম্পর্কে আমার মনে হয় যে আমার একটা প্রবণতাই হল প্রয়োজনের তুলনায় কম করা। দৃশ্যের সঙ্গে সংগীত যোগ করার পরে সম্পূর্ণ ছবিটা দেখে আমার প্রায়ই মনে হয়েছে যে আমি আর একটু বেশি করতে পারতাম। আমি জানি না এর কোনো প্রতিকার আছে কি না। যে মূল সুরের থিমটা ছবিতে বারে বারে ফিরে আসে যদি ক্যামেরাম্যান এবং অন্য সকলে শুধু সেটাও শুনতে পেতেন তাহলে তাঁরা নিশ্চিন্তভাবেই অনুপ্রাণিত হতে পারতেন। এটা খুবই সত্যি কথা যে সংগীত হল অনুপ্রেরণার অন্যতম উপাদান।

ছবিতে ব্যবহৃত ন্যাচারাল সাউন্ডও সংগীতের মতোই গুরুত্বপূর্ণ, কখনও বা আরো বেশি কার্যকর। *Great Expectations* ছবির কবরখানার দৃশ্যের কথা মনে পড়ে যায়, যেখানে কয়েকটা ন্যাচারাল সাউন্ড এমন একটা প্রভাব তৈরি করেছিল যা একটা বিরাট অর্কেস্ট্রার পক্ষেও সম্ভব ছিল না। নৈঃশব্দ্য হল ন্যাচারাল সাউন্ড অথবা সংগীতের মতোই গুরুত্বপূর্ণ— শব্দহীনতার প্রভাব সুগভীর। অন্য কোনো কিছুই ছবিতে নৈঃশব্দ্যের মেজাজ তৈরি করতে পারে না। শব্দ আর দৃশ্যের মিলন একটা নতুন কিছু তৈরি করে— দৃশ্যগত দিকের দায়িত্ব যার ওপরে মূলত থাকে সংগীত তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

আপনার প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী' তৈরি করার সময় যে অসুবিধের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তা একটু আমাদের বলবেন?

'পথের পাঁচালী'-তে আমার অভিজ্ঞতা বেশ অদ্ভুত, কারণ তার আগে আমি কখনও মুভি ক্যামেরা ছুঁয়ে দেখিনি, এমনকী কোনো ক্যামেরাম্যানের সহকারী হিসেবেও কাজ করিনি। আপনি বলতে পারেন যে আমি ছিলাম একেবারে আনকোরা। নিজেকে সামলাতে আমি এতটাই ব্যস্ত ছিলাম যে, তার অনিবার্য ফল হিসেবে যন্ত্রপাতির গুণাগুণ অথবা স্টুডিওর অবস্থা সম্পর্কে ভাববার সময় আমার ছিল না।

'পথের পাঁচালী'-র প্রতিটি শটেই আমি সমস্যায় পড়েছি, অসংখ্য সমস্যা। পরের দিনের শ্যুটিং-এর দৃশ্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে করতে অনেক রাত না ঘুমিয়েই কাটিয়েছি। আসলে আমি equipment বা যন্ত্রপাতি এবং স্টুডিওর অবস্থা যাচাই করে নিচ্ছি না কি তারাই আমায়

যাচাই করে নিচ্ছে, তা-ই বোঝা যাচ্ছিল না। .

যদিও আজ আমি বুঝি যে তখনকার তুলনায় অনেক হাল আমলের এবং জটিল যন্ত্রপাতি নিয়ে এখন কাজ করছি; কিন্তু 'পথের পাঁচালী'-তে টেকনিকাল দিক এবং শৈল্পিক দিক থেকে একদিকে যেমন অনেক ভালো শট আছে আবার অন্যদিকে তেমনই অনেক বাজে শটও আছে। তার জন্য যন্ত্রপাতি না কি যে সেগুলোকে ব্যবহার করেছিল সে দায়ী, তাও এখন আর বলা যাবে না। এখন ভাবলে আমিই অবাক হয়ে যাই কীভাবে আমরা ভারী মিচেল ক্যামেরা নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে শ্যুটিং করেছি অথবা ফড়িং-এর পেছনে ছুটেছি। আমার বিশেষভাবে মনে আছে লোকেশনে তোলা ঐ দৃশ্যের কথা যেখানে ঘরের মধ্যে দুর্গা শুয়ে রয়েছে। আর জানলা দিয়ে বাইরে মিষ্টিওয়ালাকে দেখা যাচ্ছে। এখানে বাইরের উজ্জ্বল আলোর সঙ্গে ঘরের ভেতরের দৃশ্যকে ম্যাচ করাবার জন্য ঘরের ভিতরে কিছুটা আলোর প্রয়োজন হয়। প্রযোজক পশ্চিমবঙ্গ সরকার শ্যুটিং-এর জন্য যে কয়েকটা বাতির ব্যবস্থা করেছিল, সেগুলো কোনো ফটোগ্রাফিক আলো নয়, সেগুলো ছিল পুলিশ ভ্যানের সার্চলাইট। আমাদের ঐরকম দুটো আলো দেওয়া হয়েছিল এবং তা আমরা শ্যুটিং-এ ব্যবহার করি।

ভারতবর্ষে কাজ করতে হলে একজন ক্যামেরাম্যানকে কী কী বাস্তবিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়? আপনি কি মনে করেন ফটোগ্রাফিক equipment বা যন্ত্রপাতির অভাবই ভারতীয় ছবির খারাপ মানের জন্য দায়ী?

আমার মনে হয় না যে এখনকার ভারতীয় ছবির টেকনিকাল মান খারাপ। আমাদের ক্যামেরাম্যানেরা অত্যন্ত সহজ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে যে কাজ দেখান তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অবিশ্বাস্য। হলিউডের কথা দূরস্থান, যে ইতালীয় ক্যামেরাম্যানদের সঙ্গে আমাদের প্রায়ই তুলনা করা হয় আমাদের অবস্থা তাঁদের থেকেও অনেক খারাপ। 'আমেরিকান সিনেমাটোগ্রাফার' পড়ে আমার মাঝে মাঝেই হাসি পায় যখন দেখি কোনো একজন আমেরিকান ক্যামেরাম্যানকে মাত্র কয়েকটা আর্ক ল্যাম্প দিয়ে লোকেশনে ঘরের ভেতরের দৃশ্য শ্যুট করার সময় ঘরের ভেতরের এবং বাইরের দিনের আলোকে ম্যাচ করাতে গিয়ে কী ভীষণই নাজেহাল হতে হয়েছে' আমি অবাক হয়ে ভাবি তারা কি কখনও আমাদের অবস্থায় আদৌ কাজ করতে পারবে। আবার সব ভারতীয় ক্যামেরাম্যানকেই একই শ্রেণীতে ফেলা যায় না। কলকাতার স্টুডিওতে হলিউডের ক্যামেরাম্যানের মতোই বোম্বাই-এর কোনো ক্যামেরাম্যানও খুব অসুবিধেয় পড়বেন। মোটামুটিভাবে বলা যায় স্টুডিওর অবস্থা বলতে দুটো বিষয়— একটা হল, ক্যামেরা ও লেন্স আর অন্যটা স্টুডিওর আলো। এই দুটোই একজন ক্যামেরাম্যানের পক্ষে অপরিহার্য।

'ভালো কলম ছাড়াও একজন ভালো কবিতা লিখতে পারে' এই আপ্তবাক্য সিনেমাটোগ্রাফির ক্ষেত্রে খাটে না। এমনকী ঘরের জানলা দিয়ে ভোরবেলার সূর্যের আলো ঢুকছে এই ছবি ধরতেও ১০ কিলোওয়াট এম.আর. আলো পেলে তবেই একজন খুশি হতে পারে।

বৃহত্তর অর্থে ল্যাবরেটরির অবস্থা এবং ব্যবহৃত ফিল্ম স্টক—এই দুইই হল স্টুডিও ব্যবস্থার দুটো দিক। আমার মনে হয় না অন্য দেশের ক্যামেরাম্যানদের র-স্টক নিয়ে এই ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়। প্রতিটা প্রোডাকশনের আগে তারা দেখে নিতে পারে একটা নির্দিষ্ট র-স্টকের বিশেষ লক্ষণ ছবির মেজাজ ও স্টাইলের সঙ্গে মিলবে কিনা। আমরা এই বিলাসিতায় অভ্যস্ত নই।

'নায়ক' ছবির স্টুডিওতে তৈরি করা ট্রেনের জানলা থেকে দেখানো চলন্ত দৃশ্যগুলো কলকাতার সেই একমাত্র স্টুডিওতে তোলা হয়েছে যেখানে ব্যাক প্রোজেকশনের সুবিধে আছে। কেবলমাত্র Double X -এর মতো ফাস্ট ফিল্ম ব্যবহার করেই কলকাতার একমাত্র ব্যাকগ্রাউন্ড প্রোজেক্টর-এ সব থেকে বেশি ইনটেনসিটি কাজে লাগিয়ে এ ছবি তোলা সম্ভব ছিল। সেখানে NP5-এ এই কাজ করা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।

একটা ফিল্মের ফটোগ্রাফিক কোয়ালিটি অনেকটাই নির্ভর করে ল্যাবরেটরির কাজের ওপর। প্রতিটা ব্র্যান্ডের ফিল্মের জন্য আলাদা আলাদা ডেভেলপিং বাথ ব্যবহার করা উচিত।

আমি এখনও যে বিষয়ে কোনো কথা বলিনি সেই শেষ প্রতিবন্ধকটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। যখন দর্শক ও সমালোচক শীতাতপনিয়ন্ত্রিত সিনেমা হলে আরাম করে বসে ছবিটা দেখছেন – তাঁরা বোধ হয় জানেনই না যে তখন ক্যামেরাম্যান প্রোজেকশন বুথে ঢুকে হয় প্রোজেকশনিস্টের সঙ্গে লড়াই করছেন নয়তো কাকুতি মিনতি জানাচ্ছেন। তিনি যেটা বোঝাবার চেষ্টা করছেন তা হল, যদি প্রোজেক্টরের আলো কমানো না হয় তাহলে শুটিং পর্ব, ল্যাবরেটরি প্রিন্টিং এর যাবতীয় সংশোধন অথবা পরিচালকের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে যা কিছু করার চেষ্টা করেছেন তার সবটাই বৃথা হয়ে যাবে। আমি অনেক রকম উত্তর পেয়েছি, যেমন ধরুন 'আপনার প্রিন্টটা খুবই অস্পষ্ট, ল্যাবের জানা প্রয়োজন যে আমাদের অনেক বেশি ডীপ প্রিন্টের প্রয়োজন' অথবা 'আপনার প্রিন্টটা ভীষণ ডীপ, আমরা আলো আর বেশি জোরালো করতে পারব না, আপনি তো জানেন আমরা ভারতীয় কার্বন ব্যবহার করি' অথবা 'আমি যদি অ্যাম্পারেজ আরও কমিয়ে দিই তাহলে কার্বনের ক্ষতি হবে'।

প্রত্যেক ক্যামেরাম্যানকেই এই অসুবিধেয় পড়তে হয়। প্রতিটা সিনেমা হলের চাহিদা আলাদা। একই প্রিন্ট এক জায়গায় ভীষণ হালকা তো অন্য জায়গায় অসম্ভব রকমের ডীপ বলে মনে হয়। ল্যাব প্রত্যেকের চাহিদা মেটাতে চাইলেও সাফল্যের পরিমাণ খুবই কম। এক্ষেত্রে প্রতিটা সিনেমা হলের ক্ষমতা অনুযায়ী আলাদা আলাদা শ্রেণীতে ভাগ করলেই সমস্যার একমাত্র সমাধান হবে। আমার মনে হয় না তিন থেকে চারটের বেশি শ্রেণী তৈরি হবে। যদি কোনো একটা হলের প্রোজেক্টরের কোনো শ্রেণীরই অন্তর্গত হওয়ার মতো ইনটেনসিটি না থাকে তাহলে হলকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে, সেক্ষেত্রে ক্যামেরাম্যান বা ল্যাবরেটরির কোনো দায়িত্ব নেই। আমাদের দেশের বিভিন্ন সিনেমাটোগ্রাফারস ইউনিয়নকে এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।

পরবর্তী সময়ে আমরা আরো একটা সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি। একটা নির্দিষ্ট গ্রেডের পজিটিভ সিনেমা হলে কয়েকদিন চলার পরেই খারাপ হতে শুরু করে (মনে হয় এটা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপযুক্ত নয়) এর ফলে পর্দার ওপর সারাক্ষণই ছবিটা আউট অব ফোকাস থাকে। দুর্ভাগ্যবশত প্রায় সব প্রডিউসারই এক সময় এই র-স্টক ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে। 'চারুলতা' বম্বেতে রিলিজ করার সময় এমন হয়েছিল যে শো শেষ হলে পরে অনেকেই মাথার যন্ত্রণার অভিযোগ জানায়। ক্যামেরাম্যান, পরিচালক, প্রযোজক সকলেই এই মাথাব্যথার ভাগীদার ছিল।

সত্যি কথা বলতে কি ভালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে আমার খুবই ভালো লাগে, যা নিঃসন্দেহে চিত্রগ্রহণের প্রায়োগিক মানোন্নতি নিশ্চিত করে। কিন্তু আমার মনে হয় না একটা ছবির শিল্পগত মান শুধুমাত্র তার টেকনিকাল গুণের ওপরে নির্ভর করে। একটা ছবি টেকনিকাল দিক থেকে চলনসই গোছের ফটোগ্রাফি তুলে ধরলে, কোনোমতেই শিল্পগুণে খুব একটা সমৃদ্ধ

হতে পারে না। আমাদের সময়ের একজন চক্ষুবিশেষজ্ঞ আমায় বলেছিলেন, 'আমরা চোখ দিয়ে দেখি না, আমরা আসলে মগজ দিয়ে দেখি।' ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রেও একথা ভীষণই প্রযোজ্য। ক্যামেরার লেন্স নয় তার অন্যদিকে যে চোখটা থাকে সেটাই আসল জিনিস। বিভিন্ন বিষয়ে একজনের মনোভাব, বিশ্বাস এগুলোই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আর সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করার আলাদা মজা আছে। এটা একটা নতুন স্টাইল তৈরি করতে সাহায্য করে। যখন কোনো একজনকে আসল লোকেশনে ঘরের মধ্যে চার পাঁচটা ফটো ফ্লাড ল্যাম্প নিয়ে কাজ করতে হয়, তখন সে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয়। কিন্তু একবার এই সমস্যার মোকাবিলা করতে পারলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুফল লাভ করা যায়।

স্টুডিওর মধ্যে কাজ করতে করতে আমি মাঝে মাঝে ভাবি যে লোকেশনে কাজ করতে গেলে আমায় কী কী সমস্যায় পড়তে হত। লোকেশনের তুলনায় স্টুডিওর মধ্যে অনেক কিছুই অনেক সহজভাবে করা সম্ভব হয়, কারণ সেখানে কতকগুলো সুযোগ সুবিধে আছে। কিন্তু কখনও এই সুযোগগুলোকে আমি নিজেই ছেড়ে দিয়ে 'লোকেশনের সমস্যাকে নতুন করে তৈরি করি', বিশেষত যেখানে লোকেশনের ঘরের দৃশ্যকে স্টুডিওর কাজের সঙ্গে ম্যাচ করাতে হয়। লোকেশনে শুটিং করতে গিয়ে আমার প্রায়ই মনে হয়েছে যে আর একটা ফ্লাড লাইট আরো ভালো লাইটিং তৈরি করতে পারত। পরে আবার স্টুডিওয় সহজলভ্য আলো আমার সংযমের পরীক্ষা নিয়েছে। হয়তো আমি লোকেশনের তুলনায় বেশি আলো ব্যবহার করেছি। কিন্তু তার বেশি ব্যবহার করলে ভয়ংকর হত। এই সব বলে অবশ্য আমি একথা প্রমাণ করতে চাইছি না যে ভালো ইক্যুইপমেন্টের কোনো প্রয়োজন নেই অথবা একজনকে সব সময়েই সব থেকে কম আলোতে কাজ করতে হবে। সরলতার নিজস্ব মূল্য আছে, জটিলতারও তাই। যদি ক্যামেরাম্যানের হাতে ভালো যন্ত্রপাতি থাকে এবং সে সংযত হতে জানে তবে তার ভয়ের কোনো কারণ নেই। ভালো যন্ত্রপাতি অনিবার্যভাবেই 'মেশিনে তৈরি বাড়তি চাকচিক্য' অথবা 'সুন্দর ছবি' তৈরি করতে পারে না।

অনুবাদ : শুভাশিস চক্রবর্তী

১৯৬৬ সালে বোম্বাইয়ের 'মন্টাজ' পত্রিকায় প্রকাশিত এই সাক্ষাৎকারটির কিছু কিছু অংশ এখন অবান্তর বিবেচনায় সুব্রত মিত্র নিজে বাদ দিয়ে দেন। এই সম্পাদিত ইংরেজি ভাষ্যটি কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে ২০০০ সালে তাঁর পূর্বপর ছবির উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকপুস্তিকায় প্রকাশিত হয়। সেই ভাষ্যটিই এখানে অনুসৃত হল।

পরিচালক-ক্যামেরাম্যান সম্পর্ক : পরিচালকের ছবিতে ক্যামেরাম্যানের ভূমিকা

ধীমান দাশগুপ্ত

[গ্রেগ টোলাণ্ড, স্বেন নিকভিস্ট ও সুব্রত মিত্রের চিত্রকর্মের অনুষঙ্গে চলচ্চিত্রে ক্যামেরাম্যানের অবস্থান ও ভূমিকার পর্যালোচনা]

'ছবির সমগ্র গতিপ্রবাহ আগাগোড়া সবটাই আমার মনে সদাসর্বদা গাঁথা থাকে। আমি জানি কাটাকুটির পরে ছবির চেহারা কেমন দাঁড়াবে। এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত থাকি বলেই একই দৃশ্য ক্লোজ, মিডিয়াম ও লঙে—সম্ভবপর প্রত্যেকটি কোণ থেকে তুলি না। কাটিং-এর পরে ঝড়তি-পড়তি বলতে কিছুই প্রায় পড়ে থাকে না। ক্যামেরাতেই কাঁচির কাজ হয়ে যায়।...

'সেই যে বাষট্টি-তেষট্টি সালে মহানগর তুলেছিলাম, সেই থেকে ক্যামেরা ধরেছি। সমস্ত শট, যাবতীয় কিছু। আরিফ্লেক্স-এ চোখ রেখে নির্দেশ দিতে চমৎকার লাগে। ওই-ই একমাত্র জায়গা যেখান থেকে বলা যায় কোন অভিনেতা কোনখানে পরস্পর ঠিক কতোটা তফাতে রয়েছে। বসে কিংবা দাঁড়িয়ে পরিচালকের পক্ষে জুৎ হয় না।...ওটা (কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে লেনসের পেছনে ভিউয়ার-এর আড়ালে রয়েছি যেন থেকেও নেই) আমার বেশি সহজ মনে হয়, কারণ আমি যে নজর রাখছি তা অভিনেতারা টের পাচ্ছেন না। ওটা বেশি সোজা, কেননা ওতে ওরা বেশি সহজ হতে পারে। বিশেষ করে যেখানে 'জুম' করতে হয়। আমি প্রায় সব সময়েই 'জুম'-এর সাহায্যে কাজ করছি, ক্রমশ উন্নতিও করছি।

'অবশ্য ক্যামেরাম্যান-এর সঙ্গে কাজ করার সময় সে অনবরতই বলবে, আর একটা টেক্ নেয়া যাক। আমি সাধারণত জিগ্গেস করি, কেন? কেন বলতে হবে। ও কখনোই নির্দিষ্ট করে বলে না কেন। ও নিজে নিশ্চিত নয়। আমি কিন্তু নিশ্চিত। কখন কলাকৌশলের কারবার জরুরি হয়ে ওঠা দরকার তা কেবল পরিচালকের পক্ষেই জানা সম্ভব। আবার কিছু শটে হয়তো এমন হলো, যে টেকনিক বড়ো কথা নয় অন্য কোনো কিছুর সেখানে আসল প্রাধান্য। কাজেই এমন কি, যদি প্যানিং একটু এদিক ওদিক সরেও যায় তাতে যায় আসে না। তাছাড়া অত্যন্ত সীমিত পরিমাণ কাঁচামাল নিয়ে যেখানে কাজ করা সেখানে রিটেক্-এর প্রশ্নও একটা সমস্যা। প্রধানত এই কারণেই আমি নিজে ক্যামেরা ধরা শুরু করেছি।' —সত্যজিৎ রায়

জেমস ব্লু-র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ এই যে কথা বলেছিলেন তা থেকে পরিচালক-ক্যামেরাম্যান সম্পর্কের দ্বন্দ্বমধুর দিকটির বেশ স্পষ্ট একটা আভাস পাওয়া যায়। অবশ্য যে-

সময়ের কথা সত্যজিৎ এখানে বলছেন বিশ্ববিখ্যাত ক্যামেরাম্যান সুব্রত মিত্র তখন আর তাঁর সঙ্গে কাজ করছেন না। নয়তো সুব্রত মিত্র সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের মন্তব্য এমনিতে সদর্থকই— 'ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি রাউল ক্যুতার-এর চেয়ে সুব্রত মিত্রের ক্যামেরার কাজ ভালো। তবে গিয়ান্নি দ্য ভেনান্জোকে দারুণ শ্রদ্ধা করি। "এইট অ্যাণ্ড হাফ" এক অসাধারণ সৃষ্টি। ওতে ভেনান্জো যেসব দুঃসাহসিক কীর্তিকলাপ দেখিয়েছেন তা সাংঘাতিক। যদিও কৃতিত্ব অবশ্য পরিচালকেরও পাওনা। কিন্তু ওইসব over exposed শটগুলো, যা কিছু ছবিতে এসেছে সব মাথা খাটিয়ে বার করা, ও নেহাৎ ক্যামেরাম্যানের কর্ম নয়। মাঝে মাঝে ক্যামেরাম্যানেরা এসব করেন কোনো কারণ ছাড়াই। ওইটা আমার রুচিবিরুদ্ধ। অর্থাৎ স্রেফ ভেল্কির খাতিরে ভেল্কিবাজি।'

গোবিন্দ নিহালনি সুব্রত মিত্রের সিনেমাটোগ্রাফি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর আলোকসম্পাতের সংবেদনশীলতার কথা বলেছেন। সুব্রত মিত্র আলোকসম্পাতের যে বিশেষ প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছিলেন তা দিয়ে স্টুডিয়োর মধ্যেই দিনের আলো আশ্চর্য নকল করা সম্ভব। প্রত্যেকের, এমন কি সেরা পেশাদারদেরও ধাঁধা লেগে যেত। সেটা কিন্তু এক ধরনের আলোকপাতই। যদি দিনের দৃশ্য হয় তবে যেটুকু আলো পাওয়া দরকার ওই অনুকরণ করা হয়। সোজাসুজি রোদ্দুর ফেলা হয় না। তার বদলে প্রতিফলিত আলোর (bounce light) সাহায্য নেওয়া হয়। বিশেষ করে 'চারুলতা' ছবিতে। 'অপুর সংসার' এ অপুর ছোট্ট ঘরে যে লোকেশন শুটিং-এর পরিমণ্ডল রচনা— যাকে একেবারে বাস্তব বলে মনে হয়— তার মূলেও ওই আলোকসম্পাত প্রণালী। স্টুডিয়ো সেটে তোলা অথচ একেবারে আসলের মতো। জানলা দিয়ে বা ক্যামেরার পাশ থেকে যে-আলো ফেলা হয় তা ওই প্রতিফলিত আলো— দিনের ভিন্ন ভিন্ন সময় বোঝাবার জন্য খুব সাবধানে পরিমাপ করে নেওয়া। হয়তো এখানে ওখানে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় শাদা কাগজ ব্ল্যাকবোর্ডের মতো টাঙিয়ে দেওয়া। আবার নানা ধরনের কাগজ, কোনোটা মেঘলা দিনের জন্য, কোনোটা রোদ্দুরের জন্য, কোনোটা দুপুরের কোনোটা খুব ভোরের। সেও এক ধরনের আলোকসম্পাত। 'অপুর সংসার'-এ আলোর সামঞ্জস্য হয়েছিল অসাধারণ। অবশ্য সত্যজিতের মতে, সামঞ্জস্য শুধু আলো ফেলার দরুনই হয় না, সাউণ্ড ট্র্যাকও বার বার ঠিক ঠিক মেলাতে হয়, কেননা একটা শট থেকে আরেক শটে শব্দের ধারাসঙ্গতি বজায় রাখতে হয়।

অপু কাশীর যে বাড়ির বাসিন্দা, সেটাও ছিল একটা স্টুডিয়ো সেট। ওপর থেকে এসে পড়া আলোর জন্য মাথার ওপর একটা কাপড় মেলে দেওয়া হয়েছিল টানটান করে। আর তার জন্যই জায়গাটা অন্ধকার অফিস-কোর্টরের মতো মনে হয়। এই ভাবেই একটা বাস্তবধর্মী মেজাজ আগাগোড়া থেকে যায়। টিনের রাঙতা আর রুপোলি কাগজের রিফ্লেক্টর গুলো অবশ্য লাগতই, তবে লোকেশনে গিয়ে সুব্রত মিত্র আর তাঁর সহকারী যা করতেন তা হল সমস্ত ক্লোজ শটের জন্যে ওসবের বদলে শাদা কাপড়ের বিরাট থান টাঙিয়ে দেওয়া, যাতে নরম আলোর প্রতিফলন ঠিকরে আসে। রঙিন চিত্র 'কাঞ্চনজংঘা'-য় হোটেলের ভেতরের দৃশ্যাবলী তুলতে হয়েছিল। কিন্তু রঙের জন্য কোনো আলো ক্যামেরা ইউনিটের ছিল না। তখন সুব্রত মিত্র দু-তিনটে প্রকাণ্ড সাইজের আয়না, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে চারফুট করে প্রায়, তাই কাজে লাগালেন। সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত করে এনে ফেললেন ঘরের মধ্যে, সোজা সেই টাঙিয়ে রাখা কাপড়ের ওপর। ফল হয়েছিল চমৎকার। তবে এরকম করতে গেলে অবশ্য সূর্যের আলো থাকা চাই। মেঘলা দিন হলে কিছু হবে না। কিন্তু যদি রোদ থাকে আর আয়না থাকে তবে সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে ফেললে ফল যা পাওয়া যাবে তা অসাধারণ। ধারে-কাছে আদৌ যে আলো আছে তা টের

পাওয়াই যাবে না। খুচরো হাবিজাবি চক্‌চকে আসবাব উপকরণে আলো পড়ে চিক্‌চিক্ করবে না।

সত্যজিৎ রায়ের ভাষায়, 'আমেরিকান সিনেমাটোগ্রাফার'-এ একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম। স্বেন নিকভিস্ট-এর লেখা। উনি বার্গম্যানের ক্যামেরাম্যান। 'থ্রু এ গ্লাস ডার্কলি' ছবিটির শুটিং তখন সবেমাত্র শেষ করেছেন ওঁরা। প্রতিফলিত আলো ব্যবহারের যে আশ্চর্য পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন তারই সবিস্তার বর্ণনা দিয়েছেন। আমরা গত বারো বছর ধরে যা ব্যবহার করে আসছি।

সুব্রত মিত্রের মতো নিকভিস্ট ও টোলাণ্ডের চিত্রকর্মেরও লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক নির্দেশ করা যায়। সুব্রত মিত্রের চিত্রকর্মের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক যদি হয় সংবেদনশীল আলোকসম্পাত, তাহলে নিকভিস্টের ক্ষেত্রে তা হবে, বার্গম্যানের ভাষায়, পেন্টিং ইমোশন উইথ লাইট। এই বাগর্থের মধ্য থেকে নিকভিস্টের চিত্রকর্মের মূল বৈশিষ্ট্য বেরিয়ে আসে। সুবিখ্যাত সুইডিশ ক্যামেরাম্যান জুলিয়াস জেইন্‌জন, গোরান স্ট্রিন্‌ড্‌বার্গ ও গুণার ফিশারের উত্তরসূরি হলেন স্বেন নিকভিস্ট। সুইডিশ ফোটোগ্রাফির ঐতিহ্য স্থাপিত কঠোর, বলিষ্ঠ, মনস্তাত্ত্বিকভাবে অভিঘাতী এক ফোটোগ্রাফি-শৈলীতে। এই শৈলী বস্তুত সুপ্রাচীন নরডিক ঐতিহ্যের প্রভাবজাত। বিভিন্ন দেশজ মোটিফ আর জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত প্রসঙ্গের ব্যবহার, প্রকৃতির বন্দনা আর প্রকৃতির সাথে মানবপ্রকৃতির দ্বন্দ্ব-মিলন, প্যাশন ও ইমোশনের ভূমিকা, অনবদ্য দৃশ্যরস এবং মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা হল নরডিক ঐতিহ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই ঐতিহ্যের প্রভাবে সুইডিশ ফোটোগ্রাফি-শৈলীতে জোর পড়ে পরিমিত ও বলিষ্ঠ কম্পোজিশনের, ল্যান্ডস্কেপের সঙ্গে আবেগানুভূতির একাত্মতা সৃষ্টির এবং দৃশ্যরসের সঙ্গে অনুভবকে সমন্বিত করার ওপর। আলফ্ স্জোবার্গ-এর 'বারাব্বাস' ছবিতে নিকভিস্টের চিত্রকর্ম এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সুব্রত মিত্রের মতো নিকভিস্টেরও আছে আলোর প্রতি তীব্র সংরাগ। চলচ্চিত্র মাধ্যমের সঙ্গে আলোর মাধ্যমে স্থাপিত এই সম্পর্কের জন্যই, স্টুডিওতে যে-সমস্ত ক্যামেরাম্যানকে প্রায়ই আলোক বিশেষজ্ঞ বা লাইটিং ক্যামেরাম্যান বলে উল্লেখ করা হয়, সিনেমার ইতিহাসে নিকভিস্টের স্থান তাঁদের মধ্যে একেবারে প্রথম সারিতে। নিকভিস্ট ও বার্গম্যান দুজনেই মনে করেন যে, আলোর অতি সূক্ষ্ম পরিবর্তনও শুধু চরিত্রের আবেগানুভূতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে নয়, চরিত্রের ক্রিয়াকলাপের ভাবার্থ ও ব্যঞ্জনাতেও, পরিবর্তন আনতে পারে। নিকভিস্ট সরাসরি লোকেশনে গিয়ে শুটিং করাই পছন্দ করেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি স্বাভাবিক আলো ব্যবহারেরই পক্ষপাতী। শুটিংয়ের সময় আলোকে সরাসরি নিয়ন্ত্রিত করাতেই তিনি বিশ্বাসী, ফিল্টার ও লেন্সের কৃত্রিম ব্যবহার বা ল্যাবরেটোরিতে কলাকৌশলগত কারসাজির চেয়ে। এক নরম বা কোমল প্রতিফলিত আলোই (soft bounce lighting) তাঁর পছন্দ, যা নির্দিষ্ট পরিবেশ বা মুড যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম।

কলাকৌশলগত চাকচিক্য ও ক্যামেরার প্রদর্শনপ্রিয় সেট আপের তুলনায় নিকভিস্ট প্রকাশময় সারল্যের পক্ষপাতী। তাই বলে কলাকৌশলের প্রতি নজর তাঁর একটুও কম নয়। পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তাঁর সিনেমাটোগ্রাফির পরিকল্পনা ছকে নেন তিনি। শুটিং শুরু হওয়ার আগে গোটা ছবির সমস্ত দৃশ্যের জন্য ক্যামেরা টেস্ট করেন দিন ও রাতের বিভিন্ন সময়ে। আলোকসম্পাত, কম্পোজিশন ও ক্যামেরা মুভমেণ্টকে মনস্তাত্ত্বিকতার সঙ্গে সার্থকভাবে সমন্বিত করে কীরকম অভিঘাতী এক ক্যামেরাশৈলীর তিনি রূপকার তার প্রমাণ মেলে বার্গম্যানের ছবির পর ছবিতে। সুইডিশ শিল্পকর্মে যে বিশিষ্ট স্বাদ ও মেজাজ এবং দৃশ্যশিল্পের যে বিশ্বস্ত ও অভিঘাতী জগৎ, বার্গম্যানের ছবিতে তাকে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছেন নিকভিস্ট।

কলাকৌশলগত দক্ষতাও তাঁর প্রশ্নাতীত। 'সীন্‌স্ ফ্রম এ ম্যারেজ' ছবিতে লম্বা-লম্বা সব শট রয়েছে, যার কোনো-কোনোটি দশ মিনিটেরও বেশি দীর্ঘ, আন্‌কাট যে-শটে এমনকি কখনো-কখনো কুড়িবারের মতো জুম করাও হয়েছে।

বহু বছর ধরে শাদাকালোই ছিল নিকভিস্টের মাধ্যম। তিনি মনে করতেন, সিনেমায় রঙ এক কৃত্রিম সৌন্দর্যের কারণ ও উৎস। অবশেষে 'অল দীজ্ উইমেন' ছবিতে যখন তিনি রঙ নিয়ে প্রথম কাজ করলেন, গোটা টেকনিকাল ইউনিটের সমস্ত সদস্যের বর্ণ-সংবেদনশীলতার পরীক্ষা নিলেন তিনি, কেউ বর্ণান্ধ আছে কিনা। ছবির শুটিং শুরু হওয়ার আগেই ১৮,০০০ ফুট কালার ফিল্‌ম্ এক্সপোজ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়ে গেছে তাঁর। তবু নির্মিত চূড়ান্ত চিত্রটি তাঁর মনমতো হয়নি, ছবিতে পরিবেশের অভাব ও আলোর প্রাচুর্য লক্ষ্য করেন তিনি। বার্গম্যান-নিকভিস্ট জুটির দ্বিতীয় রঙিন চিত্র 'দ্য প্যাশন অব আনা' অবশ্য সুবিখ্যাত কালার ফিল্‌ম্। ন্যূনতম বর্ণসংপৃক্তি ও পরিমিত বর্ণবিন্যাসের জন্য এ-ছবি বহু-আলোচিত। ধীরে-ধীরে এটাই হয়ে ওঠে নিকভিস্টের নিজস্ব কালার স্টাইল। 'ক্রাইজ অ্যাণ্ড হুইস্পার্‌স্', 'ফ্যানি অ্যাণ্ড আলেকজাণ্ডার' বা 'সিদ্ধার্থ'-এর মতো ছবি এর প্রমাণ। রঙকে ইম্‌প্রেশনিস্টিক, এক্স্‌প্রেশনিস্টিক, ন্যাচারালিস্টিক যেভাবেই ব্যবহার করুন না কেন, নিকভিস্ট একটা নিজস্ব বর্ণভাষা তৈরি করে নিয়েছেন, তৈরি করে নিতে পেরেছেন।

বার্গম্যান, পোলানস্কি, তারকোভস্কি—নানান পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন নিকভিস্ট। বিভিন্ন পরিচালকের ছবিতে তাঁর কাজের ধরন বিভিন্ন যদিও ক্যামেরাশৈলী মূলগতভাবে এক। অথবা ঘুরিয়ে বলা যায়, বিভিন্ন পরিচালকের ছবিতে তাঁর ক্যামেরাশৈলী মূলগতভাবে এক হলেও, শৈলীর অসাধারণ শৈল্পিক নমনীয়তার দরুন ছবি থেকে ছবিতে ক্যামেরাভাষা নানান বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য অর্জন করেছে।

তারকোভস্কির 'স্যাক্রিফাইস' ছবির সিনেমাটোগ্রাফার তিনি। এই ছবির আবেগের তীব্রতা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা অনেকটাই এর সিনেমাটোগ্রাফি থেকে উঠে আসে। ছবির চিত্রশৈলী শৈল্পিক সারল্য, রহস্য ও প্রজ্ঞার এক অসাধারণ সম্মিলন। ধীর লয়ে কিন্তু ঘনসম্বদ্ধ বিন্যাসে তৈরি এই ছবি। শুরুর দৃশ্যটি সাত মিনিটের এক লম্বা শট, শেষ দৃশ্যটি দশ মিনিট লম্বা, মধ্যের শটগুলি গড়ে মিনিট খানেক করে—অনবদ্য ক্রিস্‌ক্রস্। এছাড়াও রঙ ও শাদাকালোর ইন্টারকাট।

নিকভিস্ট তাঁর ক্যামেরার কাজকে একবার বর্ণনা করেছিলেন এইভাবে : ছবিতে গল্প বলার শিল্প, চিত্রপ্রতিমার সাহায্যে আবেগের চিত্রণ। বেশ বোঝা যাচ্ছে বার্গম্যান কেন নিকভিস্টের চিত্রকর্মকে বলেছিলেন—পেন্টিং ইমোশন উইথ লাইট।

আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে তারকোভস্কির 'স্টকার' ও বার্গম্যানের 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীজ' ছবিতে নিকভিস্ট ক্যামেরা চালালে কেমন ও কী হত। দুটি ছবিতেই যে ঘনাঢ্য পলকাটা শিল্পের দ্যুতি সেই আবেগী সাংগঠনিকতা ও সাংগঠনিক আবেগময়তা কোনো অন্য ও ভিন্ন দ্যুতি পেত কি?

নিকভিস্টের কাছে চিত্রগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান মাপকাঠি হল যে বিষয়ের ছবি তোলা হবে তার চিত্রবাস্তবতা। চিত্রগ্রহণের বিষয় বা বস্তুটিকে দৃশ্যগত ভাবে সবচেয়ে উন্নত ও যতদূর সম্ভব চিত্রবাস্তবসম্মত করার পরই তিনি কীভাবে তার ছবি তোলা হবে তা স্থির করেন। তিনি বিশেষভাবে জোর দেন দৃশ্যগ্রহণ পদ্ধতির মধ্য থেকেই শটের অর্থ বের করে আনা, আলোকসম্পাত ও কম্পোজিশন থেকেই দৃশ্যের তাৎপর্য নির্দেশ ও ক্যামেরা মুভমেন্টের মধ্য দিয়ে অ্যাকশনের পরিমিতি সৃষ্টির ওপর। তিনি মনে করেন, সিনেমাটোগ্রাফিক ইমেজারি সৃষ্টি হয় ইমেজের

বিষয়বস্তুর দরুন নয়, ক্যামেরাভাষার দরুন।

এই ক্যামেরাভাষার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেগ টোলাণ্ডের চিত্রকর্মের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক কী? ক্যামেরাম্যান ক্যামেরা নামক যে বিশাল যন্ত্রটির ভারপ্রাপ্ত তার একমাত্র উদ্দেশ্য আলোকরশ্মিকে নিয়ন্ত্রণ করা। সুতরাং আলোই হচ্ছে সেই মাধ্যম যার দ্বারা ক্যামেরাম্যান ইমেজগুলি সৃষ্টি করেন, আলোই তার বর্ণাধারের একমাত্র রঙ। সেটের বিভিন্ন অংশ আলো এবং ছায়া দিয়ে ব্যঞ্জনাময় করেই তিনি তাঁর উদ্দীষ্ট ইফেক্ট সৃষ্টি করেন, রচনা করেন দিনরাত্রির স্থূল এবং আলোছায়ার সূক্ষ্ম ছন্দ যা আভাসিত করে পরিবেশ ও মুড।

গ্রেগ টোলাণ্ডের কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে চলচ্চিত্র-বিশেষজ্ঞ ডগলাস স্লকোম্বে বলেছিলেন, ক্যামেরাম্যানের কাজের চিত্রগত গুণগুলিকে বিচার করবার মাপকাঠি কী? যেসব চিত্রগ্রাহক একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ও স্তরে (key) কাজ করতে সর্বাপেক্ষা ভালো পারেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রতিটি ছবিতে একই ধরনের ট্রিটমেন্ট প্রয়োগ করেন, কারণ তাঁরা জানেন যে এর ফলেই ইমেজগুলি 'সুন্দর' দেখাবে। অধিকাংশ আমেরিকান প্রথানুগত ছবিই এরকম অনুদ্বুদ্ধ উপায়ে তৈরি হয়। এই শ্রেণীর ক্যামেরাম্যানেরা 'রয়াল অ্যাকাডেমী'র সেইসব গম্ভীর চিত্রকরের সঙ্গে তুলনীয় যাঁরা প্রায় একই কম্পোজিশনে, একই বর্ণবুনটে, একই রঙে একই প্রতিকৃতি চিরকাল এঁকে যান, কেবল ব্যক্তি বা বিষয়টা মাঝে-মাঝে ভিন্ন হয়। এর পরিণতি সফল, প্রয়োগকলাও দক্ষ, কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সৃষ্টিশীল মননের উত্তেজনা থেকে তা বেদনাদায়কভাবে বঞ্চিত। কিন্তু কয়েকজন চিত্রগ্রাহক আছেন যাঁরা এঁদের থেকে স্বতন্ত্র, যাঁরা ছবিতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করে কিংবা বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য ট্রিটমেন্ট বদল করে যা আছে তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু সৃজনপারগ।

উৎকর্ষের এই মাপকাঠিতেই টোলাণ্ডের কাজ বিচার্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রায় প্রত্যেকটি ছবিতেই তাঁর ট্রিটমেন্ট ভিন্ন প্রকারের। উইলিয়াম ওয়াইলার, জন ফোর্ড ও অরসন ওয়েলস্-এর ছবিতেই টোলাণ্ড সর্বাপেক্ষা সৃষ্টিশীল কাজ করার সুযোগ পান ও মৌলিকভাবে সৃষ্টিশীল কাজ করতে সক্ষম হন। কেননা এইসব ছবিতেই পরিচালক ও চিত্রগ্রাহকের পারস্পরিক ঐক্য ও সমমর্মিতার সম্পূর্ণতা দেখা গেছিল। বিষয়বস্তুর মূল তাৎপর্য, মৌল সুর, নির্দিষ্ট পরিবেশ ও মুড ধরার প্রয়াস ও ধরায় সাফল্য সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায় এইসব ছবিতেই। তবে টোলাণ্ডের প্রধান অবদান বোধহয় চিত্রগত টেকনিকের ক্ষেত্রেই। বিশেষত ডীপ ফোকাস ফোটোগ্রাফিতে। চিত্রগ্রহণের ফাঁকে-ফাঁকে তিনি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স ও সুপারস্পীড লেন্স নিয়ে গোল্ডউইনের সংশ্লিষ্ট বিভাগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। দুই থেকে দুশো ফুট দূরে অবস্থিত বস্তু বা ব্যক্তি থেকে স্পষ্ট ফোকাস উৎপাদনক্ষম যে চূড়ান্ত পদ্ধতি টোলাণ্ড ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স দ্বারা সম্ভব করেছিলেন তার বিস্ময়কর ফল এখন বহু আলোচিত। ডীপ ফোকাস সম্পর্কে আশ্চর্যের কথা এই যে তার কার্যকর ব্যবহার পূর্বে প্রায় হয়ইনি। যদিও মোটের ওপর, সব বহির্দৃশ্যই এমন একটা যতিতে (stop) তোলা হত যা মোটের ওপর ক্ষুদ্র যতি। 'সিটিজেন কেন' ছবিতেই টোলাণ্ড সর্বপ্রথম ফোকাসের প্রকৃত গভীরতাকে শিল্পসম্মত ভাবে ব্যবহার করে উঠলেন। 'সিটিজেন কেন' ছবির বিভিন্ন দৃশ্যে নির্দিষ্ট ইফেক্ট পাওয়ার জন্য ব্যবহৃত স্টপগুলি হলিউড বা ব্রিটিশ স্টুডিওতে প্রচলিত স্টপ থেকে চার কিংবা পাঁচ মাত্রা নিচে। যথার্থ ক্ষমতাময় কম্পোজিশন এবং নাটকীয় লাইটিং ইফেক্ট এ-ছবিতে লভ্য।

এই ছবির ত্রুটিগুলি অর্থাৎ গ্রেডিংয়ের অসঙ্গতি, সর্বাত্মক সমান তল ও নিয়ন্ত্রিত বৈপরীত্যের অভাব এবং অতি পরিমাণ আলো ব্যবহারের অসুবিধা এগুলি শুধরে নিয়ে টোলাণ্ড তাঁর

স্টাইলটিকে আরও নিখুঁত ও প্রসারিত করেছিলেন 'দ্য লিট্‌ল্ ফক্স' ছবিতে। মৃদু স্তরের (low key) চিত্রগ্রহণে উগ্র স্তরের (high key) চিত্রগ্রহণ অপেক্ষা অনেক বেশি দক্ষতার প্রয়োজন হয়, এটাই সাধারণ ধারণা। স্লকোম্বের মতে, কিন্তু আমার মনে হয় অধিকাংশ ক্যামেরাম্যানই স্বীকার করবেন যে উগ্র স্তরের ফোটোগ্রাফিতে উচ্চমানের শিল্পগুণ বজায় রাখতে গেলে মৃদু স্তর অপেক্ষা অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দরকার। আয়ত্তাধীন কোনো বিশেষ স্তরে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখে টোলাণ্ড কখনোই খুশি হতেন না, তাই তিনি উগ্র স্তরের উপযুক্ত বিষয়বস্তুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন যাতে নিজস্ব ডীপ-ফোকাস পদ্ধতি সেখানে ব্যবহার করতে পারেন। ওয়াইলারের কাছ থেকে 'দ্য বেস্ট ইয়ার্স অব আওয়ার লাইভ্‌স্' ছবির মধ্য দিয়ে সে সুযোগ তাঁর কাছে এল।

বস্তুত চিত্রবাস্তবানুগ ট্রিটমেন্ট প্রয়োগ করতে টোলাণ্ড ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর ট্রিটমেন্ট ছিল ঋজু ট্রিটমেন্ট, তিনি সবসময় চাইতেন ফোটোগ্রাফিকে, তাঁর নিজের কথায়, 'সৎ' রাখতে। কোনো অস্বাভাবিক ক্যামেরাকোণ, আরোপিত পারস্পেক্‌টিভ্ বা অসাধারণ আলোকক্ষেপণ ব্যবহার করতে চাইতেন না টোলাণ্ড। প্রায়ই আগাগোড়া ডীপ-ফোকাস রাখতেন, কিন্তু তার ব্যবহার এত স্বাভাবিক হত যে দর্শক সে-সম্পর্কে অচেতনই থাকেন। যখন কারুকে ক্যামেরার সামনে রেখে একই সময়ে পশ্চাতে ঘটনার উপস্থাপন করা হয়েছে, তখন উভয় তলকে ফোকাসে দেখতে পাওয়াটা এত বাস্তব যে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

ফোকাসের এই উল্লেখযোগ্য গভীরতা তথা ডীপ-ফোকাস ফোটোগ্রাফিকেই টোলাণ্ডের চিত্রকর্মের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক হিশেবে ধরতে হবে। হলিউড ও ইউরোপের অসংখ্য ক্যামেরাম্যান ডীপ-ফোকাস চিত্রগ্রহণে টোলাণ্ডের পথ-প্রদর্শনের কাছে সশ্রদ্ধ ঋণ স্বীকার করেছেন।

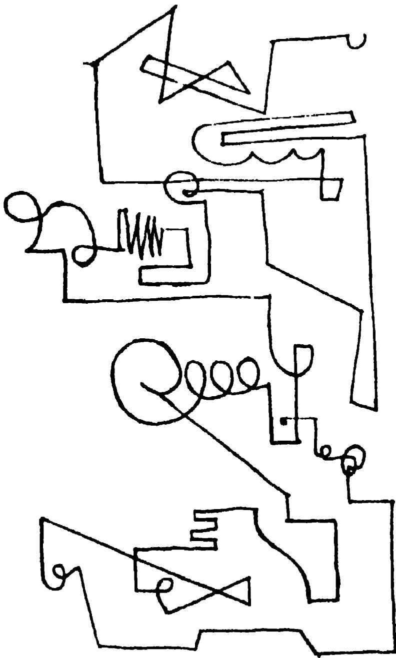
চলচ্চিত্রগ্রাহকের প্রাথমিক কর্তব্য হল বিশ্বাসযোগ্য পদ্ধতিতে সুন্দর করে গল্প বলা। এই দায়িত্ব টোলাণ্ড সরল ও সৎ ভাবে পালন করেছেন ছবির পর ছবিতে। প্রত্যেকটি ছবির আলাদা মুডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য স্টাইল ও ট্রিটমেন্টের আমূল পরিবর্তন টোলাণ্ড প্রায়ই করেছেন বটে, কিন্তু কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সব ছবিতেই উপস্থিত। অনিবার্য নিপুণ পদ্ধতি ও ইমেজের গুণ ছাড়াও টোলাণ্ডের চিত্রগ্রহণ দৃঢ়সম্বদ্ধ —একরকম আবদ্ধ— দৃশ্যরচনার স্টাইল এবং সম্মুখবর্তী মাথা, প্রত্যঙ্গ কিংবা অন্যান্য খুঁটিনাটির ওপর অধিক গুরুত্বদানের জন্য বিশিষ্ট। তাঁর আলোকসম্পাতও মূলগত ভাবেই সাধারণ ও অনাড়ম্বর : আলোর কয়েকটি মোটা ধারা ও বড় স্পষ্ট ছায়ার সমন্বয়। সম্মুখ ও পশ্চাদ্‌ভাগের ছন্দগত বিভাগ দর্শনীয় করে তুলতেন টোলাণ্ড, যাতে বিভিন্ন তল নিখুঁত বৈপরীত্য পায়। এই বিভাজনের কাজটি ক্যামেরাম্যানের পক্ষে সর্বদাই চিন্তার কারণ কেন না শাদাকালো মাধ্যমের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে অন্ধকার সেটিংয়ে কালো রঙের কোনো কল্পমূর্তি ফুটিয়ে তোলা খুবই অসুবিধাজনক। এসব ক্ষেত্রে রঙিন ফোটোগ্রাফির বরং সুবিধা আছে কারণ বিভিন্ন তলের পারস্পরিক সম্পর্ক তাদের স্বাভাবিক বর্ণ-বৈপরীত্যের দ্বারাই চিহ্নিত হয়ে যায়, ফলে চিত্রগ্রাহককে আর টোনাল বিভাজনের ওপর নির্ভর করতে হয় না। টোলাণ্ড কিন্তু শাদাকালো ফোটোগ্রাফিতেই বিভিন্ন তলের পারস্পরিক সম্পর্ক নিখুঁত ফুটিয়েছেন। বস্তুত টোলাণ্ডের চিত্রকর্ম সমস্ত সৃজনপারগ ফিল্‌ম্ ক্যামেরাম্যানের কাছে নতুন দৃষ্টিতে সিনেমাটোগ্রাফি বিচারের এক অপরিহার্য পাঠক্রম।

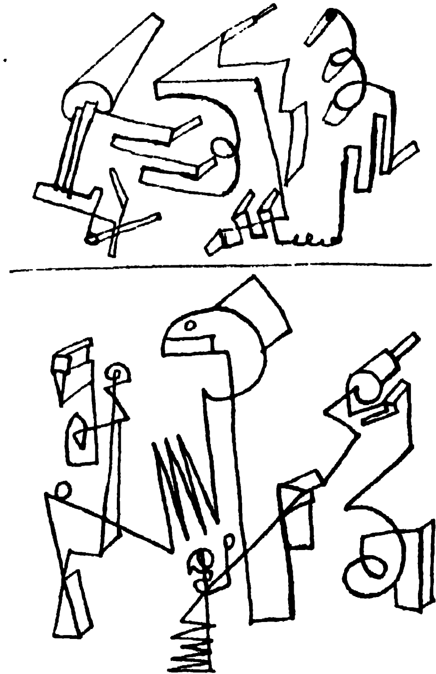
'ক্যামেরার সামনে যা আছে তার নিছক চিত্রগ্রহণ ছাড়াও পর্দায় একটা ইফেক্ট কল্পনা এবং

সৃষ্টি করারও প্রয়োজন হয় ক্যামেরাম্যানের—এমন একটা ইফেক্ট যার ভিত্তি চারটি : চিত্রনাট্যের দাবি, পরিচালকের ধ্যানধারণা, শিল্পনির্দেশক-কৃত মূল পটভূমি এবং চিত্রগ্রাহকের নিজস্ব কল্পনা। যে-বিষয়টি আমরা প্রায়ই ভুলে যাই তা হল এই যে, প্রথম তিনটির প্রভাব যা-ই হোক না কেন—এবং সর্বপ্রধান দ্বিতীয়টিকে আমরা তুচ্ছ করছি না বা বিস্মৃত হচ্ছি না—চূড়ান্ত সমীক্ষায় কিন্তু দেখা যায় ক্যামেরাম্যান এই তিনটির প্রভাবে নিজস্ব যে ব্যাখ্যা রাখেন পর্দায় তা-ই ফুটে ওঠে। সেইজন্যই যথার্থ কারণে ফরাসিরা পরিচয়লিপিতে ক্যামেরার জায়গায় লিখে থাকেন : চিত্রকল্প।'

—ডগলাস স্লকোম্বে

ছবিতে ক্যামেরাম্যানের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই যে-কথা বলা হয়েছে সেই অনুসারে বলতে পারি, গ্রেগ টোলাণ্ড, স্বেন নিকভিস্ট বা সুব্রত মিত্র এরকম চিত্রকল্প-সৃষ্টিকারী ফিল্ম্ ব্যক্তিত্ব। এমন আরও-কিছু চিত্রকল্প-সৃষ্টিকারীর কথা এ-বইয়ের অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। এঁদের ক্যামেরাভাষা, শিল্পগুণের জন্য, ক্যামেরাশৈলী হয়ে উঠেছিল (ভাষা যেমন শৈলী হয়ে উঠতে পারে) এবং সেই ক্যামেরাশৈলী সমগ্র ফিল্মের সার্বিক শৈলী তথা চিত্রশৈলীর এক অখণ্ড অংশ বা উপাদান। ইউনিটের একজন অন্যতম প্রধান সাংগঠনিক সদস্য রূপে ক্যামেরাম্যান চিত্রভাষা সৃষ্টির কাজে অংশগ্রহণ করেন ও সে কাজে তাঁর সাংগঠনিক অবদান রাখেন। পুদভকিনের ভাষায়, চিত্রনির্মাণের সময় প্রত্যেক কর্মী যদি শুধুই নিজের কাজটুকুতে সংকীর্ণভাবে আবদ্ধ থাকেন তবে সৃজনকর্ম সম্ভব নয়। মূল কর্মের সঙ্গে সকলে সাংগঠনিক ভাবে যুক্ত থাকলে তবেই ক্ষুদ্রতম কাজটিও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। চিত্রকর্মের একটা সবিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে যত বেশি সংখ্যক ব্যক্তি এই কাজে সক্রিয় ও সাংগঠনিক ভাবে অংশগ্রহণ করবে চূড়ান্ত চিত্রটি ততই গোছালো ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।





একনজরে আমাদের কিছু বই

ভ্রমণকাহিনী প্রবন্ধ ছড়া কবিতা গল্প উপন্যাস

- ভ্রমণকাহিনী সমগ্র (১ম সচিত্র সংস্করণ, ১৯৯৮) — অন্নদাশঙ্কর রায়
- পথে প্রবাসে (২য় সচিত্র বাণীশিল্প শোভন সংস্করণ, ১৯৯৯) — অন্নদাশঙ্কর রায়
- পশ্চাৎপট (আত্মজীবনী/১ম বাণীশিল্প সংস্করণ, ১৯৯৯) — বনফুল
- রবীন্দ্র-স্মৃতি (১ম বাণীশিল্প সংস্করণ, ১৯৯৯) — বনফুল
- শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ (পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, ১৯৯৪) — অন্নদাশঙ্কর রায়
- বিনুর বই (আত্মজীবন ও আত্মশিল্প মূলক ১৯৯৩) — অন্নদাশঙ্কর রায়
- সংস্কৃতির বিবর্তন (৩য় সংস্করণ, ১৯৯৯) — অন্নদাশঙ্কর রায়
- সংহতির সঙ্কট (১ম বাণীশিল্প সংস্করণ, ১৯৯৯) — অন্নদাশঙ্কর রায়
- বাংলার রেনেসাঁস (১ম বাণীশিল্প সংস্করণ, ১৯৯৯) — অন্নদাশঙ্কর রায়
- রবীন্দ্রনাথ (১ম বাণীশিল্প সংস্করণ, ১৯৯৯) — অন্নদাশঙ্কর রায়
- টলস্টয় (১ম বাণীশিল্প সংস্করণ, ১৯৯৯) — অন্নদাশঙ্কর রায়
- An Outline Of Indian Culture (2000) — Annada Sankar Ray
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভিধান (দুই খণ্ডে) — বীতশোক ভট্টাচার্য
- জীবনানন্দ (১ম সংস্করণ, ২০০১) — বীতশোক ভট্টাচার্য
- পোস্টমডার্ন ও উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা পরিচয় (১ম সংস্করণ, ২০০১) — ড. নিতাই জানা
- ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য (১ম বাণীশিল্প সংস্করণ, ২০০০) — বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত
- সুবিমলের বিরুদ্ধে সুবিমল এবং উস্কানিমূলক অনেককিছু, আপাতভাবে (১৯৮৮) — সুবিমল মিশ্র
- চিরহরিৎ বৃক্ষ : অন্নদাশঙ্কর (১ম সংস্করণ, ২০০২) — ধীমান দাশগুপ্ত
- বিজ্ঞানী চরিতাভিধান (দুই খণ্ডে ১৯৮৬/১৯৯৭) — ধীমান দাশগুপ্ত
- ছড়া-সমগ্র (৩য় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৯৮) — অন্নদাশঙ্কর রায়
- সাত ভাই চম্পা (ছড়া/১ম সচিত্র সংস্করণ, ১৯৯৪) — অন্নদাশঙ্কর রায়
- দোল দোল দুলুনি (ছড়া/১ম সচিত্র সংস্করণ, ১৯৯৮) — অন্নদাশঙ্কর রায়
- রাঙা ঘোড়ার সওয়ার (ছড়া/১ম সংস্করণ, ২০০২) — অন্নদাশঙ্কর রায়
- শ্রেষ্ঠ কবিতা (২য় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৯৭) — অন্নদাশঙ্কর রায়
- শ্রেষ্ঠ কবিতা (২য় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৯৪) — জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র
- গল্পসমগ্র (১ম সংস্করণ, ১৯৯৯) — অন্নদাশঙ্কর রায়
- গল্পসমগ্র (দুই খণ্ডে/১ম সংস্করণ ২০০০) — রমানাথ রায়
- বনফুলের নূতন গল্প (৫ম সচিত্র সংস্করণ, ১৯৯৯) — বনফুল
- বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প (১ম বাণীশিল্প সংস্করণ, ১৯৯৯) — বনফুল
- শ্রেষ্ঠ গল্প (২য় সংস্করণ, ১৯৯৪) — অন্নদাশঙ্কর রায়
- রমানাথ রায়ের নূতন গল্প (১ম সংস্করণ, ২০০০) — রমানাথ রায়
- শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৮৮) — সুবিমল মিশ্র
- রত্ন ও শ্রীমতী (উপন্যাস/১ম অখণ্ড সংস্করণ, ১৯৯৪) — অন্নদাশঙ্কর রায়
- রাত্রি (উপন্যাস/১ম বাণীশিল্প সংস্করণ, ২০০২) — বনফুল

সিনেমা ফোটোগ্রাফি শিল্পকলা নাটক

- চলচ্চিত্রের অভিধান (২য় সংস্করণ, ১৯৯৪/৩য় মুদ্রণ, ২০০০) — সম্পাদনা : ধীমান দাশগুপ্ত
- সিনেমার কথা (২য় সচিত্র সংস্করণ, ১৯৯৫ ॥ ভূমিকা : সত্যজিৎ রায়) — গাস্তঁ রোবের্জ
- নতুন সিনেমার সন্ধানে (১ম সংস্করণ, ১৯৮৪) — গাস্তঁ রোবের্জ
- চলচ্চিত্র সম্পাদনা (১ম সংস্করণ, ২০০২) — সম্পাদনা : ধীমান দাশগুপ্ত
- স্বপ্ন, সময় ও সিনেমা (১৯৯৩) — বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
- ভারতীয় চলচ্চিত্রের রূপরেখা (১৯৯৭) — সম্পাদনা : পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়
- আফ্রিকার চলচ্চিত্র (১৯৯৬) — ধ্রুব গুপ্ত
- চলচ্চিত্রের টেকনিক ও টেকনোলজি (২য় সংস্করণ, ১৯৯৬) — সম্পাদনা : ধীমান দাশগুপ্ত
- কম্পোজিশন (২য় সচিত্র সংস্করণ, ১৯৯৮) — ধীমান দাশগুপ্ত
- সিনেমার আঙ্গিক (১৯৯৩) — ধীমান দাশগুপ্ত
- চিত্রনাট্য রচনা ও চিত্রনাট্য বিশ্লেষণ (৩য় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৯৮) — ধীমান দাশগুপ্ত
- নিজের কথা (পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, ১৯৯৬) — সম্পাদনা : অতনু পাল
- মৃণাল সেন (১৯৮৭) — সম্পাদনা : প্রলয় শূর
- ফোটোগ্রাফি-অভিধান (৩য় সংস্করণ, ১৯৯৭) — রবি দত্ত
- রঙ (২য় সংস্করণ, ১৯৯৪) — ধীমান দাশগুপ্ত
- শ্রীমধুসূদন (নাটক/৬ষ্ঠ বাণীশিল্প সংস্করণ, ১৯৯৪) — বনফুল
- বিদ্যাসাগর (নাটক/৪র্থ বাণীশিল্প সংস্করণ, ১৯৯৯) — বনফুল

অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী (১৯৮৭-১৯৯৯) ১৩ খণ্ডে